জিয়া ভরলি

সুবোধ ঘোষ

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত

দাম : ছয় টাকা

জিয়া ভৰলি

আকাশ খুব পরিষ্কার। ভোরের দিকে অবশ্য সামান্য একটু কুয়াশার ঘোর ছিল। কিন্তু সকালবেলার রোদের সাড়া ঝলমল করে জেগে উঠতেই সে-কুয়াশা শুকিয়ে গিয়েছে। আকাশ পাড়ি দেবার জন্য একশো এগার নম্বর ফ্লাইটের ডাকোটা ঠিক সময়েই গুমরে উঠেছে।

কলকাতা থেকে গৌহাটি, তারপর গৌহাটি থেকে তেজপুর; এই ডাকোটার একদফা আকাশযাত্রা তেজপুরে গিয়ে শেষ হবে। অনেক যাত্রীর মত শুক্তি বসুও তেজপুরে নেমে যাবে।

প্লেনে ওঠবার সিঁড়িটার কাছে পৌঁছেই একবার থমকে দাঁড়ায় শুক্তি; মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে, হ্যাঁ, ওরা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ছোট্ট স্বকুর ছোট্ট হাতটা ছটফট করে রুমাল দোলাচ্ছে। আর মনে হলো, বড় পিসি যেন তাঁর চশমাটাকে শাড়ির আঁচলে তাড়াতাড়ি করে একবার মুছে নিয়েই আবার চোখে পরলেন।

বোধহয় বেশ আনমনা হয়ে গিয়েছিল শুক্তি; তাই বুঝতে পারেনি, প্লেনটা কখন আকাশে উঠে পড়েছে। পাল্টে গিয়েছে ডাকোটার গুঞ্জনের সুর। নীচের এয়ারপোর্টের কিছুই আর দেখতে পাওয়া গেল না। শুধু দেখতে পাওয়া গেল, ধানক্ষেতের উপর দিয়ে টানা টেলিগ্রাফের তারে সাদা বকের সারি চুপ করে বসে আছে।

প্লেন ছাড়বার আধঘণ্টা আগে দমদম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে বড় পিসিমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল শুক্তি, পিসিমা যেন শুক্তির কোন কথা শুনতে পাচ্ছেন না। আনমনার মত উসখুস করছেন, আর, আকাশের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করছেন।

হেসে ফেলেছিল শুক্তি।—ওরকম করে কি দেখছো, বড় পিসি?

বড় পিসি চমকে ওঠেন।—কি বললে?

শুক্তি আবার হাসে।—একটুও ভেব না। ভাবনা করবার কিছু নেই। ওটা আমার চেনা আকাশ।

কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলেনি শুক্তি। হ্যাঁ, চেনা আকাশ। বছরে অন্তত পাঁচবার যে-মেয়েকে বিমানযাত্রিনী হয়ে কলকাতা থেকে তেজপুরে যাওয়া-আসা করতে হয়, তার কাছে ওই আকাশের সব কিছুই চেনা। মেঘের চেহারা দেখেই বলে দিতে পারবে শুক্তি, ওটা গারো পাহাড়ের মেঘ; কুয়াশা দেখেই বুঝে নিতে পা[illegible] শুক্তি, প্লেন এইবার ব্রহ্মপুত্র পার হবে। জানে শুক্তি, ঠিক কখন প্লেনের জানালার কাচের কাছে চোখ দুটো এগিয়ে নিলে দেখতে পাওয়া যাবে, ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘের ঘূর্ণি উড়ছে আকাশে। সীটবেল্ট কোমরে জড়াবার জন্যে রঙীন নির্দেশের লেখা এখনি দপ করে জ্বলে উঠবে। ঝড়ো হাওয়ার দাপট এড়াবার জন্য ছটফট করে গা-ঝাড়া দিয়ে উপরে উঠবে প্লেন। কিন্তু নীচের [illegible] কি তিস্তার বেনো জলের স্রোত? তবে তো আর দেরি নেই; শেষ এয়ার-পকেট পার হতে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। এলোপাথাড়ি বাম্প্ করবে প্লেন।

ঠিকই, যেন চেনা আকাশ দেখতে পেয়ে ভয়কাতুরে পাখির ডানা হঠাৎ খুশির সাহসে ছটফটিয়ে উঠেছে। সঙ্গে কাউকে যেতে হয় না; একাই এভাবে একহাতে শুধু ছোট্ট একটা ব্যাগ, আর, অন্য হাতে এয়ার-প্যাসেজের টিকেট বইটাকে দোলাতে দোলাতে চলে যায় শুক্তি। কলকাতা থেকে তেজপুর; তেজপুর থেকে কলকাতা একা যায় আর ফিরে আসে। বড় পিসি তাই একটু আশ্চর্য না হয়ে পারবেন কেন, এই মেয়েই যে কলকাতায় থাকতে ঘরের বাইরে একা বের হতে চায় না। কোনদিন একা বের হবার দরকার হলে শুক্তির অমন কালো চোখ দুটোও যেন আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

আজ এখন মনে পড়তেই শুক্তির সাহসখুশি প্রাণটা বেশ লজ্জা পায়। ছি, মিছিমিছি অবুঝ হয়ে বড় পিসিকে কত না বিরক্ত ক[illegible]

হয়েছে। বড় পিসির গাড়ির ড্রাইভার কেষ্টবাবু সাতদিনের ছুটি নিয়েছিলেন। সেই সাতদিন কলেজ কামাই করে ঘরেই রইলো শুক্তি। বড় পিসি কত করে বোঝালেন, ট্রামে-বাসে একা যেতে ভয় কিসের? কত মেয়েই তো একা-একা ট্রামে-বাসে যাওয়া-আসা করে কলেজ করছে। না, শুক্তির আপত্তি টলাতে পারেননি বড় পিসি। অথচ ওইটুকু মেয়ে, ওই কৃষ্ণাটা সেদিন যেন আরও খুশি হয়ে একাই বের হয়ে গেল; ট্রামে চড়ে স্কুলে গেল আর ফিরে এল।

এক-আধ বছর নয়; এই চার বছর ধরে চেনা আকাশের পথে যাওয়া-আসা করতে গিয়ে, আর বার বার দেখে দেখে শুক্তির চোখে অনেক মুখও চেনামুখ হয়ে গিয়েছে। শুক্তি তাদের চেনে, তারাও শুক্তিকে চেনে। এই ডাকোটার পাইলট, যিনি আজ শুক্তিকে দেখতে পেয়েই মৃদু হাসির সঙ্গে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু হেলিয়ে দিলেন, তাঁকে চিনতে একটুও দেরি হয় না শুক্তির। গত গরমের ছুটির শেষে তেজপুর থেকে কলকাতায় ফেরবার ডাকোটাতে ইনিই ছিলেন পাইলট। শুক্তির হাতব্যাগটা হঠাৎ খুলে গিয়ে একগাদা ফটো প্লেনের মেজের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন এই পাইলট ভদ্রলোক সেইসব ফটো কুড়িয়ে তুলে দিয়েছিলেন।

ওই তো, আরও একটি চেনামুখ। ওই এয়ার-হোসটেস্ মেয়েটির নাম শান্তি কাপুর। প্রায় এক বছর আগে একবার দেখা হয়েছিল। শুক্তির হাতের কাছে গরম কফির পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে প্রায় দশ মিনিট ধরে গল্প করেছিল শান্তি কাপুর। খুব মাথা ধরেছিল শুক্তির, এই শান্তিই সেদিন ব্যস্ত হয়ে মাথাধরা ওষুধের একটা মিষ্টি ট্যাবলেট নিয়ে এসে শুক্তির কফির পেয়ালাতে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বড় পিসি আর ওরা, সবাই কি এখনও এই উড়ন্ত ডাকোটার দিকে তাকিয়ে রানওয়ের শিকল-বেড়াটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে? কৃষ্ণা কি এখনও রুমাল দোলাচ্ছে? বেণী কামড়াচ্ছে কৃষ্ণাটা? কি

আশ্চর্য, কৃষ্ণাকে কতবার ধমক দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, এটা একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস। তবু যখন-তখন আনমনা হয়ে যায় কৃষ্ণা, আর, বেণীটাকে মুখের কাছে টেনে নিয়ে কামড়ায়।

বুঝতে পারে শুক্তি, মনটা কেন হঠাৎ খা[illegible] হয়ে গেল। কী [illegible]র ছিল কৃষ্ণাকে এত ধমক-ধামক দেবার? একটু আদর করে, গলা [illegible]য়ে ধরে আর গাল ছুটো টিপে দিয়ে, একটু মিষ্টি করে বলে দিলে[illegible] হতো, বেণী কামড়াতে নেই কৃষ্ণা, ওতে অসুখ হতে পারে।

শুক্তিরই বড় পিসির [illegible] কৃষ্ণা। ঠিক শুক্তিদির মত শক্ত করে বাঁধা একটা বেণী না দোলালে ওর [illegible]খের ইচ্ছেটা [illegible] হতে পারে না। তের বছর বয়স; কিন্তু এখনও তিন বছর বয়সের বাচ্চার মত ফোলা-ফোলা গাল। না, শুক্তির হাত নিসপিস করলেও কৃষ্ণাকে গাল টিপে আদর করবার এখন আর কোন উপায় নেই। হাতব্যাগের ভিতর থেকে একটা ফটো বের করে দেখতে থাকে [illegible] গ্রুপ ফটো। শুক্তির দশ বছর বয়সের পিস[illegible] ছোট্ট সুকুর জন্মদিনে এই তিন মাস আগে এই [illegible] হয়েছিল।

পিসেমশাই আর বড় পিসি পাশাপাশি ছুটো [illegible] আছেন। তাঁদের সামনে বসে আছে কৃষ্ণা আর সুকু। [illegible]; জন্মদিনের উপহার সেই চকোলেটের তাজমহল। [illegible]তে দু'হাতে ধরে কোলের উপর বসিয়ে, কেমন সুন্দর শা[illegible]য় চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সুকু। আর, [illegible] কৃষ্ণাটা বেণী কামড়াচ্ছে।

ঝিকঝিক করে হাসতে থাকে শুক্তির চোখ ছুটো। এ[illegible] কলকাতার জীবনে ওই সুকু আর কৃষ্ণা যে শুক্তির ছুটি ভ[illegible]দিয়ে[illegible] বোন। জানে না শুক্তি, বুঝতেও পারে না, আপন ভ[illegible] থাকলে ওরা সুকু আর কৃষ্ণার মত না হয়ে অন্য রকমে দি[illegible] হতো কিনা।

আর বড়দা? বড় পিসির বড় ছেলে দিবাকরই তো শুক্তির বড়দা। আজ প্রায় দেড় বছর হলো সাত দিনের জন্যেও ছুটি নিতে পারেননি। তাই দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় আসতে পারেননি। করুণা বউদিও দেড় বছর হলো দিল্লীর বন্দিনী হয়ে পড়ে আছেন।

ভুলতে পারেনি শুক্তি, আজ এখন বরং আরও বেশি করে মনে পড়ছে, দিল্লী রওনা হবার আগের দিন শেক্সপীয়রের কমেডির ভল্যুমটা হাতে তুলে নিয়ে আর চোখ পাকিয়ে শুক্তিকে শাসিয়েছিলেন বড়দা—ফাইনালের ফল যদি ভাল না হয়, তবে জেনো, এই বই দিয়ে পিটিয়ে তোমার ওই তিলফুল নাসিকা আমি থেঁতো করে দেব।

ফাইনাল তো এগিয়ে আসছে। কিন্তু বড়দা বোধ হয় এখনও জানেন না যে, এবছর ফাইনাল না দেবার জন্যেই তৈরী হয়েছে শুক্তি। বড় পিসিও বলেছেন, থাক এবার, এখনও ক্যালকুলাসের একটা লিমিট বুঝতে হিমসিম খায় যে-মেয়ে, সে-মেয়ের পক্ষে টেস্ট পার হওয়াই অসম্ভব। ফাইনাল তো স্বপ্ন।

ভাবতে ভয় ভয় করে। বড় পিসি কি পরশু দিনের সেই চিঠিতে বড়দাকে সত্যিই ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছেন?

করুণা বউদির চিঠিটা কিন্তু একটা সান্ত্বনা। মাসখানেক আগে ইন্দ্রপ্রস্থে বেড়াতে গিয়ে পা মচকে গিয়েছিল করুণা বউদির। পা-মচকানির ব্যথা এখন সেরে গিয়েছে। শুক্তির জন্যে খুব সুন্দর দেখতে একটা রেশমী ওড়না কিনেছেন করুণা বউদি, কুমায়ুনী গাঁয়ের মেয়েরা বিয়ের দিনে যে-ওড়না গায়ে জড়ায়। সব কথার শেষে লিখেছেন—পরীক্ষার জন্যে ভাবনা করে মুখ শুকনো করার কোন দরকার নেই। কোন ভয় নেই শুক্তি, একটুও ভেব না। তোমার আসল ফাইনালের সময় আমি তোমার কাছেই থাকবো।

কিন্তু এ কেমন সান্ত্বনা? ভাষাটাও কেমন যেন! ভুল ধারণা করে একটা ভুল নির্ভয়ের বাণী শুনিয়েছেন করুণা বউদি। বউদি জানেন না যে, ফাইনাল না দেবার জন্যেই তৈরী হয়ে শুক্তি আজকাল

বেশ ভাবনাহীন মনের খুশিতে তুবেলা এসরাজ হাতে তুলে ।নয়ে কৃষ্ণাকে জোর করে গান শেখায়—কত গান তো হলো গাওয়া··· ।

দেখতে পায়নি শুক্তি, শান্তি কাপুর কখন এসে কাছে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে। শান্তি বলে—চিনতে পারছেন ?

শুক্তি—নিশ্চয়।

শান্তি—হাসছিলেন কেন ?

চমকে ওঠে শুক্তি।—আঁ্যা ? হাসছিলাম ? হবে।

শান্তি কাপুর এইবার মুখ টিপে হাসে।—বোধ হয় কোন খুব-ভাল-কথা ভাবছিলেন।

শুক্তি—হ্যাঁ, আমার বোন কৃষ্ণার কথা ভাবছিলাম। আবার যেদিন কলকাতায় ফিরবো, সেদিন কৃষ্ণাকে একটা গল্প বলে আশ্চর্য করে দেব।

শান্তি কাপুর—কিসের গল্প ?

শুক্তি হাসে।—গল্পটা এই যে, হঠাৎ মনে হলো, আপনার এই ডাকোটার গম্ভীর শব্দটা যেন চুরি করে একটা গান গাইছে।

তুই চোখ বড় করে শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শান্তি কাপুর। কোন কথা বলে না।

শুক্তি বলে—আপনারও নিশ্চয় অনেকবার এরকম মনে হয়েছে। কোন গানের লাইন মনে পড়ে গেলেই মনে হবে যে, বাইরের শব্দগুলি যেন···। তাই নয় ? কি বলেন আপনি ?

শান্তি কাপুর আবার মুখ টিপে হাসে।—বুঝলাম, গান গাইছে আপনার হৃদয়টি। ইওর হার্ট ইজ সিংগিং।

ব্যস্তভাবে চলে যায় শান্তি কাপুর। কিন্তু শুক্তির মুখের উপর কেউ যেন একটা লাজুক কুহকের আবীর ছিটিয়ে দিয়েছে। সারা মুখ লালচে হয়ে গিয়েছে। মাথাটাও একটু হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। মুখ তুলে আর তাকিয়ে দেখতে সাহস হয় না, শান্তি কাপুর এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আর কি করছে।

কৃষ্ণাটার মনে বুদ্ধি-স্থদ্ধি নামে কোন পদার্থ নেই। তা না হলে

সেদিন অনায়াসে আস্তে একটা কথা বলে অন্তত ইশারায় জানিয়ে দিতে পারতো কৃষ্ণা, শুক্তিদি সাবধান, শ্যামলদা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তোমার গান শুনছেন আর হাসছেন।

শুক্তি দেখতে পায়নি, কিন্তু কৃষ্ণা তো দেখতে পেয়েছিল। কৃষ্ণা যে সোজা দরজার দিকে মুখ করে ঘরের ভিতরে চেয়ারটার উপরে বসেছিল। শুক্তি বসেছিল ঘরের কোণের ছোট কোচের উপরে, মখমলে মোড়া একটা পালকের বালিশকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গান গাইছিল। ওই গান, কত গান তো হলো গাওয়া···। শুক্তি কেমন করে দেখবে যে, দরজার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না আছে?

ঘরের ভিতরে ঢুকলো শ্যামল। শুক্তির দিকে একবার তাকালো। শুক্তির বুকের ভিতর থেকে যেন এক ঝলক লাজুক রক্তের ভয় উথলে উঠে সারা মুখে রঙীন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পালকের বালিশটাকে তুলে নিয়ে মুখ ঢাকা দেয় শুক্তি।

কৃষ্ণার হাতে মস্ত বড় একটা মাটির কমলালেবু তুলে দিয়ে চলে গেল শ্যামল।—এর চেয়ে ভাল কমলালেবু বাজারে পাওয়া যায় না কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—লিচু?

শ্যামল বারান্দায় দাঁড়িয়ে জবাব দেয়—এটা লিচুর সীজন নয়।

কৃষ্ণা—বাঃ, মাটির লিচুর আবার সীজন কি? চালাকি পেয়েছেন?

—তবে দেখবো চেষ্টা করে, পাই কিনা।···কাকিমা কোথায়? বলতে বলতে চলে গেল শ্যামল, বোধহয় দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির দিকে, কিংবা নীচের তলার ওই ঘরটার দিকে, যেখানে স্বকুর টিউটর গণেশবাবু এখন চুপ করে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন।

মনে পড়বে না কেন? খুব মনে পড়ছে, শ্যামলবাবুও আজ এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। শুক্তি যখন বড় পিসিকে প্রণাম করে বিদায় নিল, তখন স্বকুর পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্যামলবাবু। বেশ বিপদে ফেলেছিলেন বড় পিসি। একবার নয়, বার বার তিনবার

শুক্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে একটি কথা বললেন, শ্যামলকে দু-একটা কথা বলে যাও, শুক্তি।

পিসিমাকে একবার স্পষ্ট করে বলে দিতে ইচ্ছে করেছিল, আমাকে দিয়ে বলাবার চেষ্টা কেন? তোমাদের যা ইচ্ছে হয়, যা ভাল মনে কর, তাই করে ফেললেই তো হয়। তোমাদের এই অদ্ভুত সন্দেহ কেন যে, আমি একটা বেহায়া বিদ্রোহিনীর মত তোমাদের ইচ্ছের কথায় একেবারে 'না' করে বসবো।

তবে হ্যাঁ, যা আমি পারি না, তা আমি পারি না। শ্যামলবাবুকে কিছু বলতে-টলতে পারবো না। তোমাদেরও জেদ আর মরজির রকম বুঝতে পারি না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, শ্যামলবাবুর কাছে আমাকে দিয়ে কথা না বলিয়ে নিলে তোমরা যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছো না। কিন্তু করুণা বউদিকে আমি তো কবেই বলে দিয়েছি, শ্যামলবাবুর মত চমৎকার মানুষ হয় না। আর কত বলবো? কি-ই বা বলবার আছে?

না, আজ আর মুখ লুকোতে চেষ্টা করেনি, ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করেও ওঠেনি, শ্যামলের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে একটা কথা বলে দিতে পেরেছে শুক্তি—আসি তবে!

বড় পিসি নিশ্চয় খুব আশ্চর্য হয়েছেন। বোধহয় ভাবছেন, যে-মেয়ে আজ এত সহজে একেবারে শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পেরেছে, সে-মেয়ে এতদিন মুখ বন্ধ করে ছিল কেমন করে?

হাতঘড়ির দিকে তাকায় শুক্তি। হ্যাঁ, এতক্ষণে সবাই চলে গিয়েছে। বড় পিসির গাড়ি এতক্ষণে বোধহয় আলিপুরের ব্রিজ পার হলো। ওদিকে বড় পিসেমশাই এতক্ষণে নিশ্চয় তাঁর চেম্বারে যাবার জন্যে ছটফট করে গাড়ির খোঁজ করছেন। আজ শুক্তিকে বিদায় দিতে বড় পিসেমশাইও এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নিশ্চয় আসতেন। কিন্তু আসতে পারলেন না। শুধু বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে এসে শুক্তির পিঠে হাত বুলিয়ে আক্ষেপ করেছেন, যেতে পারলাম না শুক্তি। সকাল থেকে টেলিফোনে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছেন মক্কেল, আজ আপীলের

শুনানি। আমি আজ খুবই ব্যস্ত। লক্ষ্মী মেয়ে, তেজপুরে পৌছেই তার করে একটি খবর দিও।

শ্যামলবাবুও চলে গিয়েছেন। কে জানে কতক্ষণ ওখানে ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন! কে জানে কি মনে করে চলে গেলেন।

একটা হাত তুলে, চোখ বন্ধ করে, বাঁ চোখের ভুরুর উপর শক্ত করে একটা আঙ্গুল চেপে রাখলেও মনের ভিতরে এ ছাই চিন্তেগুলি একটুও চাপা থাকতে চায় না। ভাবতে কষ্ট হয় বইকি। শ্যামলবাবু হয়তো আজ সন্ধ্যে হতেই ভুল করে, সেই ভবানীপুর থেকে আলিপুরে বড় পিসির বাড়িতে হঠাৎ একবার এসে পড়বেন। শুক্তির এসরাজটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকবেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়বেন আর চলে যাবেন—না, আজ আমি আর চা খাব না কাকিমা। চলি কৃষ্ণা, যাচ্ছি রে স্নুকু।

আবার চমকে উঠতে হলো। চোখ মেলে তাকায় শুক্তি। শান্তি কাপুর বলছে—মাথা ধরেছে বোধহয়।

শুক্তি হাসে।—না।

[দুই]

কৃষ্ণার চেয়ে বয়সে ন' বছরের বড়, তার মানে, বাইশ বছর বয়স হয়েছে এই মেয়ের, যার নাম শুক্তি। এখনও ভাবছে, এবার ফাইনাল না দিয়ে একটা বছর পিছিয়ে থাকলে কেমন হয়? কে জানে কবে বি-এ, এম-এ পাস করবে এই মেয়ে। কোনদিন পাস করতে পারবে কিনাও সন্দেহ। তার উপর যদি ফাইনালের ভয়ে এভাবে এক-একটা বছর নষ্ট করতে থাকে, তবে তো···।

জয়ন্ত সরকার বলেন—তুমিও ভুল করেছো। তোমার পরামর্শে মেয়েটা অঙ্ক নিতে বাধ্য হলো। তুমি নিজে অঙ্কের গ্র্যাজুয়েট বলে মনে করেছো, সবাই···।

সুমিত্রা বলেন—স্বীকার করি, ভুল হয়েছে। কিন্তু তুমিও ভুল

পরামর্শ দিয়েছিলে। হিস্ট্রি নিলে শুক্তির একটুও সুবিধে হতো না। তোমার মত শুক্তিরও কিচ্ছু মনে থাকে না।

সত্যি কথা, শুক্তির বড় পিসেমশাই জয়ন্ত সরকার আর বড় পিসি সুমিত্রা, দু'জনেই শুক্তির জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে যতটা চিন্তা করেন, তাঁদের নিজের মেয়ে কৃষ্ণার জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার সিকিভাগ চিন্তাও করেন না। শুক্তির বাবা গগন বসু যেন প্রতিজ্ঞা করে মেয়েটার জীবনটাকে নিয়তির ইচ্ছার কাছে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিয়েছেন। লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছে হলে শিখবে, ইচ্ছে না হলে শিখবে না। যদি বিয়ে করতে চায় তো বিয়ে করবে, না চায় তো চিরকুমারী হয়ে থাকবে। ব্যস্, গগন বসু এর বেশি আর কিছু বলতে ভাবতে কিংবা কোন চেষ্টা করতে পারবেন না।

শুক্তির বাবা, কদমবাড়ি চা-বাগানের বড় মালিক গগন বসুর এই একরোখা ঔদাসীন্য কি মেয়ের প্রতি বাপের বিরূপ মনের একটা কঠিন ভর্ৎসনা? মোটেই নয়। জানেন সুমিত্রা, তাঁর দাদা ওই গগন বসু আজকাল দিনরাত শুধু শুক্তির কথাই ভাবেন। শুক্তির মা কিরণলেখাও মাঝে মাঝে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে কদমবাড়ি থেকে চিঠি লেখেন, কবে আসবে শুক্তি? কলেজের ছুটি শুরু হবে কবে? এদিকে মানুষটা যে-সব কাণ্ড শুরু করেছে, সে-সব আর লিখে কুলোতে পারবো না। বিছানার কাছে একটা ছোট টেবিলে শুক্তির একটা ফটো দাঁড় করিয়ে রেখেছে; ঘুম ভেঙ্গে তাকালেই মেয়ের মুখটি যাতে চোখে পড়ে।

গগনদার দুই মেয়ে, অঞ্জনা ও অর্চনার বিয়ে কবেই হয়ে গিয়েছে। ছেলে নেই গগনদার। তাই এই তৃতীয়া কন্যাটি, বাইশ বছর বয়সের এই শুক্তিকে যেন কোলের মেয়েটি বলে মনে করেন গগনদা। তা করুন না কেন, কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু বুঝতে পারেন না সুমিত্রা, শুক্তির বিয়ের কথা তুলে কোন মতামত জানতে চাইলেই গগনদার জবাবের চিঠিটা কেন অদ্ভুত এক আতঙ্কের ভাষায় মুখরিত হয়ে ছুটে আসে; না, ওসবের মধ্যে আমি আর নেই।

মাঝে মাঝে গগনদার এমন চিঠিও আসে, যার মধ্যে কি-যেন

বুঝিয়ে বলবার একটা করুণ চেষ্টার আর্তস্বর শোনা যায়। চিঠিটাকে বার বার দু-তিনবার পড়ে বুঝতে চেষ্টা করেন সুমিত্রা, কী বোঝাতে চাইছেন গগনদা। 'তোমরা যারা শুক্তির জীবনের ভাল চাও, তারা যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি কোন দায়িত্ব নিতে পারবো না। কিন্তু শুক্তি কি নিজেই কিছু বলেছে? বলে থাকলে ভালই।' গগনদার চিঠির এমন জিজ্ঞাসার সামনে বসে ভাবতে গেলে দায়িত্ব নেবার আনন্দটাও একটু করুণ হয়ে যায় বইকি। তাই ভাল, শুক্তি নিজেই বলুক।

কিন্তু কী অদ্ভুত ভীরু স্বভাবের মেয়ে এই শুক্তি। শ্যামলের সঙ্গে আজও ভদ্রভাবে একটু মেলামেশা করতে পারলো না। ইচ্ছের কথাটা মুখ খুলে বলতেও পারছে না। অথচ, নিজের কানে শুনেছেন সুমিত্রা, কলেজ থেকে ফিরে এসেই কৃষ্ণাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করেছে শুক্তি, শ্যামলবাবু এসেছিলেন নাকি, কৃষ্ণা?

সুমিত্রার বড় জা সুধাদির বড় ছেলে এই শ্যামল। শুধু কি দেখতে সুন্দর? গুণে জ্ঞানে ও রোজগারেও কিছু কম সুন্দর নয় শ্যামল। তিন বছর হলো ভিয়েনা থেকে ফিরেছে, সার্জারীতে শ্যামল সরকারের হাতযশ এখন কলকাতার হাসপাতাল ও ডাক্তার মহলের বৈঠকে নিত্যদিনের গল্প হয়ে উঠেছে। এই তো, গত মাসে রাজস্থানের এক কুমারসাহেব এসে শ্যামলের নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলেন। পেটের একটা ভয়ানক ম্যালিগনেন্ট টিউমার অপারেশন করিয়ে, আর এক হাজার এক টাকা দক্ষিণা দিয়ে, বেশ খুশি হয়ে রাজস্থানে ফিরে গিয়েছেন সুস্থ কুমারসাহেব।

শ্যামল সরকারের ভবানীপুর বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যা হতেই বেশ সুন্দর একটি উৎসবের আনন্দ জেগে উঠেছিল। শ্যামলের জন্মদিনে চেনা-শোনা বন্ধু ও স্বজনের হাসিখুশি মেলামেশা আর খাওয়া-দাওয়ার উৎসব। বড় জা সুধাদি চিঠি দিয়ে সুমিত্রাকে জানিয়েছিলেন, তোমরা সবাই আসবে।

সবাই গিয়েছিল। অ্যাডভোকেট জয়ন্ত সরকারের মনটা সেদিন

জজের একটা রূঢ় কথার আঘাতে খুবই বিষণ্ণ ছিল। তবু, তিনিও শ্যামলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। যায়নি শুধু শুক্তি। করুণা বউদি শুক্তিকে কত সাধাসাধি করে কত কি বোঝালেন। কিন্তু শুক্তি যেতে রাজি হয়নি।

অথচ, কি আশ্চর্য, কৃষ্ণাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে [illegible]র হাতে ফুলের একটা তোড়া ধরিয়ে দিয়েছিল শুক্তি।—[illegible]বাবুকে দেবে, ভুলে যেও না কিন্তু।

না, এরপর আর শুক্তির ঘরকুনো স্বভাবটার উপরে রাগ করতে পারেননি বড় পিসি সুমিত্রা। করুণা বউদি তো খুশি হয়ে হেসেই ফেলেছিলেন।

একদিন চন্দননগর থেকে বাড়ি ফিরে আরও একটু আশ্চর্য হয়ে আরও একটু বেশি খুশি হয়েছিলেন সুমিত্রা। বাড়িতে আর কেউ ছিল না, শুধু ছিল শুক্তি। ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন সুমিত্রা, একটা বই হাতে নিয়ে মিররের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শুক্তি।

সুমিত্রা বলেন—এ কি? সন্ধ্যে হয়ে এল, এখনও সেই দুপুর-বেলার শাড়িটা পরে রয়েছো?

শুক্তি বলে—শ্যামলবাবু এসেছিলেন।

চমকে ওঠেন সুমিত্রা—তাই নাকি। তারপর?

শুক্তি বলে—বেশিক্ষণ ছিলেন না।

সুমিত্রা—তা তো বুঝলাম, কিন্তু…।

শুক্তি—হ্যাঁ, চা খেয়েছেন শ্যামলবাবু।

সুমিত্রা—কে চা করলে? তুমি?

শুক্তি—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—কি বললে শ্যামল?

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিররের দিকে তাকিয়ে থাকে শুক্তি। দেখতে পেয়েছিলেন সুমিত্রা, মেয়েটার মুখটা সত্যিই যেন একটা লজ্জার রক্তগোলাপ। চোখের তারা দুটো সন্ধ্যাতারার ভীরু হাসির মত কাঁপছে। না, আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করে মেয়েটার এই মূক লাজুক

প্রাণটাকে ত্যক্ত করার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া, ভাবতে গিয়ে নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়েন সুমিত্রা। সত্যিই তো, শ্যামল যে-কথা শুক্তিকে বলেছে, সে-কথা শুক্তির বড় পিসির না শুনলেও চলবে। শুক্তি বলবেই বা কেন?

কিন্তু একটু পরেই বাগানের কদম গাছের মাথায় সন্ধ্যার অন্ধকার যখন বেশ কালো হয়ে উঠেছে, ঠিক তখন কৃষ্ণার মুখ থেকে একটা উদ্বেগের প্রশ্ন শুনতে পান সুমিত্রা।—শুক্তিদির বোধহয় জ্বর হয়েছে, মা।

—কে বললে?

—শুক্তিদি চুপ করে, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বসে আছে।

ছুটে এলেন সুমিত্রা।—কি হলো শুক্তি, লক্ষ্মী মা? মাথা ধরেছে বোধ হয়?

চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে হেসে ফেলে শুক্তি।—কিছু হয়নি। মিছিমিছি মাথা ধরবে কেন, ছি!

সুমিত্রা—তবে ওঠো। হাতমুখ ধুয়ে সাজ বদলে নাও। সেই কাশ্মীরী মসলিনের শাড়িটা পর, করুণার মা যেটা তোমাকে উপহার দিয়েছেন। শাড়িটা সত্যিই খুব সুন্দর, কি বলিস কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—সত্যি, চমৎকার। হংসমিথুন আঁকা, ঝলমল ছলছল...।

কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে ধমক দেন সুমিত্রা।—এতক্ষণে কথা ফুটেছে বোকাটার মুখে। কেন, একবার তো শুক্তিদির হাত ধরে বলতে পারতিস, ওঠো শুক্তিদি, গান গাইবে চল।

কৃষ্ণার স্কুলের পাঠ্য একটা বইয়ে একটা গল্প আছে। কৃষ্ণার ধারণা, ওটাই সব চেয়ে মজার গল্প। একদা এক কাঠুরিয়া কুঠার হাতে লইয়া পলাশবনে প্রবেশ করিয়াছিল।...

কিন্তু কাঠ কাটতে পারেনি কাঠুরিয়া। কোন পলাশের গায়ে কুঠারের কোপ বসাতে পারেনি। ফাল্গুন মাসের টাটকা ফোটা পলাশফুলের রঙের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই কাঠুরিয়ার

চোখ। কাঠুরিয়ার মন বলিল, আহা, এমন শোভা ধরিতে পারে যে তরুর ফুল, তাহার গায়ে কুঠার হানিতে নাই।

শ্যামল ছেলেটি যেন পলাশবনের কাঠুরিয়ার চেয়েও নরম মনের মানুষ। বড় পিসি একদিন জানতে পেরেছিলেন, আর করুণা বউদি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিলেন, শ্যামলের একটা মায়াময় অনুরোধের কথা শুনে কী অদ্ভুত একটা রূঢ় অভদ্রতার কাণ্ড করে ফেলেছিল শুক্তি।

—চল না, আমাদের ওখানে একবার ঘুরে আসবে। আমার সঙ্গেই চল। এই তো সামান্য একটা কথা। বারান্দার টবের গোলাপটার কাছে, যেখানে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লেস বুনছিল শুক্তি, সেখানে এগিয়ে যেয়ে শুক্তিকে শুধু এই কয়েকটি কথা বলেছিল শ্যামল।

বারান্দার একটা চেয়ারের উপর হাতের লেস আর কাঁটা তখনি ঝুপ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরে গেল শুক্তি। সোজা সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে আর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বসে রইলো।

কিন্তু শ্যামলের চোখ দেখে বোঝা যায়, একটুও রাগ করেনি শ্যামল। দুঃখিত ব্যথিত বিষণ্ণ, কিছুই হয়নি শ্যামল। শ্যামলের চোখে মুখে কোন রূঢ় বিস্ময়ের ছায়াও দেখতে পাওয়া যায়নি। শুক্তির নামে ঠাট্টা করেও সামান্য একটু শক্ত ভাষায় কথা বলতে পারেনি শ্যামল। বরং শ্যামলের মুখের শান্ত হাসিটা যেন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল, শুক্তির এই অদ্ভুত অভদ্র লজ্জার কাণ্ডটাই একটা মায়ার শোভা হয়ে শ্যামলকে আশ্চর্য করে দিয়েছে।

করুণা বউদিকে দেখতে পেয়ে শ্যামল শুধু বলেছিল—শুক্তি আমাকে ভুল বুঝলো না তো, বউদি ?

শ্যামল চলে যাবার পর, করুণা বউদিও সোজা দোতলার ঘরে গিয়ে শুক্তির দিকে বেশ রুক্ষ দুটো চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন।—একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, শুক্তি।

শুক্তি—কি হলো ?

—শ্যামলের কথার একটা জবাবও না দিয়ে আর ওরকম করে ছুটে পালিয়ে এলে কেন ?

শুক্তি—কেন ? তাতে কি কোন দোষ হয়েছে ?

—হয়েছে। শ্যামল তোমাকে কি মনে করেছে, সেটা ধারণা করতে পার ?

—পারি। শ্যামলবাবু কিছুই মনে করেননি। হাসতে থাকে শুক্তি। করুণা বউদি হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হয়ে প্রশ্ন করেন—এর মানে কি ?

শুক্তি—তুমিই বুঝতে ভুল করেছো।

শুক্তির মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন করুণা বউদি। তারপর সরে যান। বুঝতে একটু ভুলই হয়েছে বোধ হয়।

এটা তো দেড় বছর আগের ঘটনা। করুণা বউদির আর দেখবার সুযোগ হয়নি, কিন্তু সুমিত্রা নিজের চোখে দেখেছেন আর নিজের কানে শুনেছেন, সুকুর পড়ার ঘরের ভিতরে বসে কৃষ্ণাকে বার বার শ্যামলের কথা জিজ্ঞাসা করছে শুক্তি।—শ্যামলবাবু কি কখনও তোমার কাছে আমার নামে কোন কথা বলেছেন ?

কৃষ্ণা—হ্যাঁ, কতবার বলেছেন।

—কি বলেছেন ?

—তোমাদের শুক্তিদি আমাকে কেন এত ভয় করে বুঝি না।

—তুমি কি বললে ?

—বললাম, শুক্তিদি ভয়ানক ভীরু।

—একথা কেন বলতে গেলে ?

—তবে কি বলবো ?

—বলতে পারলে না কেন, যে যাকে ভয় করে সে কি তাকে নিজের হাতে চা তৈরি করে খাওয়াতে পারে ?

—তুমি আবার কবে শ্যামলদাকে চা খাওয়ালে ?

—খাইয়েছি, তুমি জান না।

—যা জানি না, তা বলবো কি করে?

—তর্ক করো না। যা বলছি, মন দিয়ে শোন।

—বল।

—শ্যামলবাবু যদি আবার কোনদিন আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলে দিও, শুক্তিদি আপনার ওপর কোনদিনও একটুও রাগ করে নি।

শুক্তির কথাগুলিকে বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছিলেন বলেই সেই ঘরের দরজার একপাশে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সুমিত্রা। ঘরের ভিতরে আর ঢোকেননি। কৃষ্ণার টনসিলের পেন্টমাখা তুলিটা হাতে ধরে নিয়ে নেপথ্যের এক অবাক্ কৌতূহলের ছবির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও সুমিত্রার মুখের হাসিটা আর চুপ করে থাকতে পারছিল না। তাই সরে গেলেন সুমিত্রা, আর বারান্দা পার হয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে বলেই ফেললেন—কৃষ্ণাকে দিয়ে বলানো কেন? নিজের মুখে বলে দিলেই তো পার।

রান্নাঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন রাঁধুনি ঠাকুরুণ নিশির মা।—কি মা? কি বলতে হবে বলুন।

সুমিত্রা হাসতে থাকেন।—আপনাকে কিছু বলছি না, বলছি শুক্তিকে। মন যা চাইছে, তা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারবে না মেয়েটা।

নিশির মা মাথা নাড়েন।—হ্যাঁ মা, একেই বলে ভীরু মেয়ে। ওটা বয়সের রীতি মা; কী আর করবেন, বলুন?

সেদিন বার বার অনেকবার ভেবেছিলেন সুমিত্রা। ঠিকই, শুক্তির প্রাণটা যেন নিজেকেই ভয় করে করে চলছে। শ্যামলের কাছে দুটো-একটা কথা বলতে হলে ভুল করে আর লজ্জার মাথা খেয়ে মস্ত একটা ভালবাসার কথা বলে ফেলতে হবে, যেন এইরকম একটা মিথ্যে ভয়ের ছায়া মেয়েটার মন জুড়ে ছমছম করছে। কিন্তু বয়সের রীতি বললে চলবে কেন? স্কুল মাস্টার ওই যে গণেশবাবুর মেয়ে স্নিগ্ধা, তার

বয়সও তো কুড়ি-একুশের কম নয়। সে মেয়ে কত স্পষ্ট করে গণেশবাবুকে বলে দিতে পেরেছে, টেলিফোনের শশাঙ্ককে আমি কথা দিয়ে দিয়েছি, বাবা। তুমি আপত্তি করতে পারবে না।

গণেশবাবু নিজেই সুমিত্রার কাছে মেয়ের ইচ্ছার এই কীর্তির কথা বলেছেন। বলতে গিয়ে গণেশবাবুর গলার স্বরও মাঝে মাঝে বেশ গম্ভীর ও বেশ তিক্ত হয়ে কেঁপে উঠেছে। কিন্তু আপত্তি করেননি গণেশবাবু। গত বৈশাখে শশাঙ্কের সঙ্গে স্নিগ্ধার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

জয়ন্তবাবু কিন্তু সুমিত্রার ধারণাটাকে বাজে চিন্তার এরিথমেটিক বলে ঠাট্টা করেন।—না না, আপ্তভীরু-টীরু নয়; ওটা নিতান্ত বাজে কথা। এটা হলো একটা লজ্জার বাধা। তুমি আর করুণা গল্প করে চারদিকে রটিয়ে দিয়েছো যে, শ্যামলের সঙ্গে শুক্তির বিয়ে হলে ভাল হয়। কাজেই, শ্যামলের কাছে ঘেঁষতে চায় না শুক্তি। ঠিকই তো, যা অবধারিত, তার জন্যে ছটফট করে লাভ কি?

সুমিত্রা—বুঝলাম না।

জয়ন্তবাবু—ভালবাসাবাসি তো হবেই একদিন। বিয়ে হলেই ওসব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। কাজেই ড্রামার মত স্টেজিংএর আগে ভালবাসার রিহার্সাল, ওটা কোন কাজের কথা নয়।

দিবাকর একবার বলেছিল—না না, ভয়-টয় নয়। শুক্তি বোধ হয় একটু দেরী করতে চায়। অন্তত বি-এ'টা পাস না করে বিয়ে করতে চাইবে না শুক্তি। শুক্তির লজ্জাটা হলো মুখ্খু হয়ে থাকবার লজ্জা। তোমরাই বল, শ্যামলের মত ছেলেকে কোন সাহসে এখনই বিয়ে করতে রাজি হবে শুক্তির মত মেয়ে, যে-মেয়ে জীবনে অঙ্কেতে একত্রিশের বেশি নম্বর পেল না?

করুণা বলেছিল—আমার মনে হয়, শুক্তির মনটা ওর বাবার ওপরেই রাগ করে···না, একটা অভিমান করে রয়েছে বলেই আজও মুখ খুলে কিছু বলতে পারছে না।

চমকে উঠেছিলেন সুমিত্রা।—কেন? কেন? শুক্তির কবে এমন মাথাখারাপ হলো যে, গগনদার মত মানুষের ওপর···

করুণা—আপনার কাছে শুক্তির বাবার যে চিঠিটা পরশুদিন এসেছে, সে চিঠি পড়েছে শুক্তি।

ঠিকই দেখতে পেয়েছিলেন করুণা বউদি, গগনবাবুর চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে পড়ছে শুক্তি। পড়ছে আর হাসছে। চিকচিক করে হাসছে চোখ দুটোও। আর মুখের হাসিটা যেন ছোট্ট একটা ব্যথার টোকা খেয়ে কাঁপছে। ঠোঁট দুটোও ফুলে উঠেছে বলে মনে হয়।

—আমার ইচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করো না, সুমি। আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলবো না। যা বলবার হয় মেয়েই বলবে। গগনবাবুর লেখা চিঠির মধ্যে এই তো মাত্র তিন লাইনের কয়েকটি কথা। এর জন্যে তাঁর মেয়ের মনটার ব্যথিত ও অভিমানিত হবার কোন কারণ আছে কি?

সন্দেহ হয় সুমিত্রার, আছে বোধহয়। তা না হলে শুক্তি কেন আজও ওর ইচ্ছেটাকে এমন করে বোবা করে দিয়ে মনের ভিতরে লুকিয়ে রাখবে? কিন্তু এরকম একটা অভিমানের সমস্যা থাকলে মেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে? বাপ কিছু বলবেন না, মেয়েও কিছু বলবে না, বাঃ।

আজ এখন এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকে সবার আগে যে-ঘরের ভিতরে গিয়ে আর চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সুমিত্রা, সেটা শুক্তির শোবার ঘর। মেয়েটার অভ্যাসটা তো একটুও এলোমেলো নয়। যেমন নিজেকে, তেমনই ওর এই ঘরের চেহারাকেও বেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখতে ভালবাসে শুক্তি। আজ কিন্তু দেখা যায়, বেশ কয়েকটা ভুল করেছে শুক্তি। বিছানার উপর শুক্তির একটা ছাড়া শাড়ি, কস্কাপাড় একটা টাঙ্গাইল, এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আয়নার টেবিলের পাউডারের ডিবেটাও খোলা।

শুক্তি নেই; বাড়িটাকে আজ বেশ খালি-খালি মনে হয়। সুমিত্রার মনটা তবু আজ কেন-যেন খুশি হয়ে রয়েছে। শুক্তির ভুলো মনের এই কাণ্ডটাকে দেখতে ভাল লাগছে। হোক না বড়

পিসির বাড়ি, শুক্তি যেন এখানেই ওর মনটাকে রেখে দিয়ে দুদিনের জন্য বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়েছে। একটুও মিথ্যে তো নয়; বছরের যে ক'টা মাস এখানে থাকে, তার মধ্যে কোন একটি দিনেও তেজপুরে কিংবা চা-বাগানে যাবার জন্যে মেয়েটার মনে কোন ইচ্ছার তাড়না ছটফটিয়ে ওঠে কিনা সন্দেহ। অন্তত ওর কথার মধ্যে এরকম কোন তাড়নার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খুব ভাল হতো, শুক্তি যদি গত মাসের তোলা ওর ফটোটাকে এই টেবিলের উপরে নিজেই রেখে দিয়ে চলে যেত। তা হলে আর বুঝতে কিছু বাকি থাকতো না, কার চোখের খুশির জন্য ফটোটাকে রেখে গিয়েছে শুক্তি।

যাই হোক, আজ যেটুকু বুঝতে পেরেছেন সুমিত্রা, তাতেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এতদিন ধরে এবাড়ির মনে কতই না মিথ্যে উদ্বেগের জল্পনা-কল্পনা আর গবেষণা চলছিল। সব ভুল। আজ যদি দেখতে পেত করুণা, প্লেন ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে বিদায় নেবার সময় শ্যামলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শুক্তির মুখটা কী সুন্দর হয়ে উঠেছিল, তবে করুণাও আজ চেঁচিয়ে হেসে উঠতো, না, আর ভাবনা করবার কিছু নেই।

—আসি তবে। এই সামান্য ছোট্ট একটা কথা বলতে গিয়েই শুক্তির প্রাণটা যেন একবুক লজ্জার জলে ডুবে গিয়ে রাঙা হয়ে গেল। তবু তো বলতে পেরেছে। ভয় ভেঙেছে। শ্যামলের সঙ্গে এই প্রথম কথা বললো মেয়েটা। দু'মাস পরে, না হয় আর এক-বছর পরে মেয়েটা ওর ভয়-ভাঙ্গা প্রাণের সাহসে শ্যামলের কাছে সে-কথাটা বলে দিতে পারবে, যে-কথা ওর মুখে আজ সব চেয়ে ভাল শোনায়, সবচেয়ে ভাল মানায়। তখন আর গগনদাকে চিঠি লিখে নিশ্চিন্ত করতে কোন অসুবিধে থাকবে না, তুমি শুনে সুখী হবে, দাদা; শুক্তি নিজেই বলেছে।

বারান্দার মেঝের উপর গড়িয়ে বসে আর প্লাস্টিকের একটা এরোপ্লেন নিয়ে ওটা আবার কী খেলা খেলছে সুকু?

নীল খড়ি ঘষে মেজের উপর একটা আকাশ এঁকেছে সুকু। তার উপর সাদা খড়ির দাগ টেনে দিয়ে একটা লাইনও এঁকেছে। লাইনের আরম্ভে মাঝখানে ও শেষে পর পর তিনটে লাল খড়ির গোলদাগ, দমদম—গৌহাটি—তেজপুর।

সুকু জিজ্ঞেস করে—শুক্তিদি এখন কত দূরে, মা? প্লেন কি গৌহাটি পার হয়েছে?

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই হাসতে থাকেন সুমিত্রা।—হ্যাঁ।

প্লাস্টিকের খেলনা এরোপ্লেনটাকে এক ঠেলায় গৌহাটি পার করে দেয় সুকু।

[তিন]

মণিমালা; তেজপুরের মণিমাসি বললেন—আমি যে তোর বড় পিসির চিঠির একটি কথারও মানে বুঝতে পারি না।

শুক্তি—কেন?

মণিমাসি—তুই নাকি ঘর ছেড়ে বের হতে [illegible]াস না? একা কলেজে যাবার দরকার হলে ভয়ে আধমরা হয়ে য[illegible] কথা-টথা বলতেও নাকি তোর ভয়ানক অনিচ্ছে? বিশেষ করে [illegible]রের কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে তোর যেন মাথায় বা[illegible]ড়ে, শুধু বোবার মত···আঁা? তোর বড় পিসি মিথ্যে তোর না[illegible] এত নিন্দে করেন কেন?

শুক্তি হেসে ফেলে।—নিন্দে কেন হবে? খুব সত্যি কথা।

সত্যি কথা? বিশ্বাস করলে যে একটা অদ্ভুত অসম্ভব বিস্ময়কে বিশ্বাস করতে হয়। কিরণদির মেয়ে এই শুক্তি আজ সকাল সাড়ে দশটার পাঁচ মিনিট আগে তেজপুরে পৌঁছেছে। ঘরে ঢুকেই মণিমাসির গা ঘেঁসে মাত্র একটি মিনিট শান্ত হয়ে বসেছে। তারপরেই ছটফট করে উঠে গিয়েছে। পনর মিনিটের মধ্যে স্নান

করে আর তড়বড় করে শুধু ভাত ডাল আর আধখানা ভাজা দিয়ে আধপেটা একটা খাওয়া সেরে নিয়ে বাইরে বের হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।—রাজবাহাদুরকে একবার বলে দাও মণিমাসি, গাড়িটাকে যেন এখনি গ্যারেজে না নিয়ে যায়।

মণিমাসি—কোথায় যাবি?

শুক্তি—যাই একবার মালতীর সঙ্গে দেখা করে আসি। তারপর···শীতলকাকার বাড়ি তো যেতেই হবে। হ্যাঁ, তারপর হয়তো অঞ্জলিদির বাড়িতেও একবার যেতে হতে পারে।

রাজবাহাদুরকে ডাক দিয়ে কিছু বলবার দরকার হয় না মণিমাসির। ফটকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আর গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই বের হয়ে যায় শুক্তি। যেতে যেতে বলতে থাকে—মালতীর সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসবো। তারপর যদি ইচ্ছে হয়···হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কলকাতার বড় পিসিকে একটা তার করে দিতে হবে যে, আমি তেজপুরে পৌঁছে গেছি।

মণিমাসি হাসতে থাকেন।—সব হবে, সব হবে। কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

মণিমাসি বেশ একটু মোটাসোটা ভারি চেহারার মানুষ। নড়াচড়া করতে ভালবাসেন না, পারেনও না। তাই বলে শুক্তির এই ছুটোছুটির অভ্যাসটাকে যে একটুও অপছন্দ করেন, তা নয়। বরং একটু ভালই বাসেন। টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে আর কলম হাতে তুলে নিয়ে শুক্তির বড় পিসির কাছে তখুনি একটা চিঠি লিখতে শুরু করে দেন।—শুক্তি এখন আমার এখানে আছে। ভালই আছে। কিন্তু একটা কথা ভেবে একটু আশ্চর্য হচ্ছি সুমিত্রা; তোমাদের ওখানে কেন এত ভীতু হয়ে আর ঘরকুনো হয়ে পড়ে থাকে শুক্তি। আমার এখানে তো বেশ মনের আনন্দে থাকে; ঘরের বাইরে বেড়িয়ে আসতে ভালবাসে, আর···।

না, শুক্তির নামে এখনই আরও কিছু লিখে ফেলা কি

উচিত হবে? লেখা বন্ধ করে আর কলমটাকে টেবিলের উপর শুইয়ে রেখে কি-যেন ভাবতে থাকেন মণিমাসি।

বেশ তো, মালতীদের বাড়ি না-হয় একবার ঘুরেই এল। মালতীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে শুক্তির এই তর-সয়-না ব্যস্ততার তবু একটা মানে হয়। কিন্তু অঞ্জলিদের বাড়িতে কেন?

শুক্তির বাবা গগন বসুর ছাত্রজীবনের বন্ধু পরমেশ হাজরিকার মেয়ে মালতীও একদিন শুক্তির ছাত্রী-জীবনের বান্ধবী ছিল। সে আজ দশ বছরেরও আগের কথা, শিলংয়ের এক কনভেণ্ট স্কুলের হোস্টেলের একটি ঘরে বসে একদিন দুই মেয়েই কান্নাকাটি করে প্রায় একরকমের ভাষায় চিঠি লিখে বাড়ির মানুষকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।—শিগগির নিয়ে যাও, এখানে থাকলে মরে যাব।

আজও জিজ্ঞেস করলে ওদের দুজনের একজনও বলতে পারে না, মালতী কিংবা শুক্তি, মরে যাবার মত দশা কেন হয়েছিল? আজ বরং ওরা বেশ হাসাহাসি করে গল্প করতে পারে, হোস্টেলের ঘরের জানালার কাছে গোলাপ গাছের গায়ে সব সময় একটা টিকটিকি বসে থাকতো, তাই বোধহয়…।

মালতীর বাবা পরমেশ হাজরিকা আজ আর বেঁচে নেই। মুনসেফ হয়ে কাজের জীবন শুরু করেছিলেন; সাবজজ হয়ে অবসর নিয়েছিলেন। তেজপুরের কোলিবাড়ি পাড়াতে শান্ত নিরালায়, একসারি কচি নারকেলের আড়ালে একটি বাসাধাঁচের পাকাবাড়ি ছাড়া এমন কিছুই তিনি রেখে যেতে পারেননি, যাকে বিষয়-সম্পদ বলে মনে করা যেতে পারে। পারবেনই বা কেমন করে? সৌখিন মেজাজের মানুষ; প্রতি বছর দু-তিন হাজার টাকা খরচ করে গাঁয়ের বাড়িতে বিহু পরবের আনন্দ মাতিয়ে তুলে খুশি হতেন। তার উপর ছিল, থিয়েটারের শখ। যখন যেখানে থাকতেন, তখন সেখানে একটা নাট্যকে সমিতি গড়ে তুলতেন। স্টেজ তৈরীর খরচ থেকে শুরু করে অভিনেতাদের চা-বিস্কুটের খরচ পর্যন্ত, টাকা খরচের সব দায় নিজেই নিয়েছেন।

মৃত্যুর এক বছর আগে আরও একটা কাণ্ড করেছিলেন পরমেশবাবু। বড় ছেলে শিশির তখন কলেজের ছাত্র, তবু শিশিরের বিয়ে দিলেন। তার মানে প্রমীলাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে এলেন। প্রমীলা হলো নওগাঁ আদালতের সেই টাইপিস্ট কেরাণী মহেন্দ্র ফুকনের মেয়ে, যিনি হঠাৎ একদিন আদালতের অফিসঘরে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন আর মরেও গেলেন। পরমেশবাবুর আত্মীয় আর কুটুম্বদের অনেকে অখুশি হয়েছিলেন, এত গরীবের ঘরের মেয়েকে ঘরে আনা কেন? এটাও কি পরমেশবাবুর একটা শখের খেয়াল? হতে পারে। কিংবা, হয়তো একটা মমতার খেয়াল।

মারা যাবার একমাস আগে, বড়পেটা থেকে তেজপুরে ফিরে আসবার সময় হাতীর দাঁতের দুটি চিরুনি কিনে নিয়ে এসেছিলেন পরমেশবাবু; একটি মালতীর জন্য, আর একটি শুক্তির জন্য।

সেই পরমেশবাবুর মেয়ে মালতী এখন বাড়িতেই পড়ে। মাইনে দিয়ে কলেজে পড়তে অসুবিধা আছে। প্রাইভেট বি-এ দিতে পারবে বলে আশা করছে। আর, মালতীর দাদা শিশির, যে-ছেলেকে তিন বছর আগে দেখা গিয়েছিল, টেনিস ব্যাট হাতে নিয়ে আর স্কুটারে চড়ে ছুটছে; সে-ছেলে আজ একটি প্রাইমারী স্কুলের হেড মাস্টার। পরমেশবাবুর হঠাৎ-মৃত্যুর খবর পেয়ে শিলং থেকে সেই যে চলে এল শিশির, আর তার ফিরে যাওয়া হলো না। বি-এ পরীক্ষাও দেওয়া হলো না। অথচ, শিলং কলেজের প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, বোটানিতে ফার্স্ট ক্লাস পাবেই শিশির হাজরিকা।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর আবার চিঠি লিখতে শুরু করেন মণিমাসি।—আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ। স্বকু আর কৃষ্ণাকে আমার আদর জানাবে। করুণার কি এখনও কোন নতুন খবর নেই? হ্যাঁ, সাহস করে কলকাতার মানুষকে আবার অনুরোধ করছি; একবার তেজপুরে বেড়িয়ে যাও। শীতের সময়ে এস।

ফিরে এসেছে গাড়িটা। শুক্তিও এসেছে। কিন্তু ঘরে ঢুকে মণি-মাসির গা ঘেঁসে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—তবে যাই মণিমাসি, ঘুরেই আসি।

—কোথায় ?

—শীতলকাকার বাড়ি।

—যাও, তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

—কিন্তু···।

—কি ?

—মালতীকে দেখে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। চাকরি করতে চায় মালতী, তা না হলে আর চলে না। বাড়িতে এতগুলি মানুষ ; মা আছে, দুটো ছোট ভাই আছে। প্রমীলাও আছে। কি করে চলে ? মালতীর দাদা শিশিরবাবুর ওই তো মাইনে, মাত্র একাশি টাকা। আর, প্রাইভেট টিউশন করে আরও পঞ্চাশ টাকা। দেখলাম, জ্বর হয়েছে তবু একগাদা কাপড় নিয়ে কাচতে বসেছে প্রমীলা। শিশিরবাবুও খুব গম্ভীর ; মাথায় হাত দিয়ে ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে আছেন, কি-যেন ভাবছেন।

—কার কথা বলছিস, শুক্তি ? কোলিবাড়ির শিশির হাজরিকার কথা ? বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে বের হয়ে আসেন মহিমবাবু।

শুক্তি বলে—হ্যাঁ, মেসোমশাই।

মহিমবাবু বলেন—হ্যাঁ, মাথায় হাত দিয়ে একটু ভাবতেই হবে। রাগের মাথায় একটা ভুল করে বসলে, শেষে ওরকম ভাবতেই হয়।

মণিমাসি—ছেলেটা কষ্টে পড়েছে, অভাবে আছে। তাই দুশ্চিন্তা করতে হচ্ছে। ভুল আবার কোথায় হলো ?

মহিমবাবু হাসেন।—না, তোমরা জান না, তাই বুঝতে পারছো না। আমি বুঝেছি। স্কুলের ছেলেদের নিয়ে ভালুকপং বেড়াতে যাবে, জঙ্গলের একটা ঝর্ণার কাছে বসে আর পিকনিক করে ফিরে আসবে ; সেই জন্যে নেফা অফিসে গিয়ে ইনার লাইন পার হবার পারমিট চেয়েছিল শিশির।

শুক্তি—সেটা আবার কি ?

মহিমবাবু—নেফাতে ঢুকতে হলে সরকারের অনুমতি চাই।

শুক্তি—পাসপোর্ট ?

মহিমবাবু—না না, পাসপোর্ট নয়, পারমিট।

মহিমবাবু—যাই হোক্, অফিসার ভদ্রলোক বললেন, হবে না। শিশিরেরও জেদ ; কেন পারমিট দেওয়া হবে না ? এইরকম কেন কেন করে তর্কাতর্কি হতে হতে শেষে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম।

শিশির বলে—নেফা কি আপনার জমিদারী ?

অফিসার বলেন—হ্যাঁ, যতদিন আমি সার্ভিসে আছি, ততদিন আমারই জমিদারী।

শিশির—বাজে কথা বলবার এত সাহস পেলেন কোথায় ?

অফিসার—এখানে গোলমাল করবার এত সাহস পেলেন কোথায় ? এম-পি কুটুম আছে বোধহয় ?

শিশির—না, নেই। আপনার বোধহয় মিনিস্টার কুটুম আছে।

অফিসার—চুপ, আর একটি কথাও বলবেন না, চলে যান। নইলে···।

—পুলিশ ডাকবেন ?

—ডাকতে বাধ্য হব।

—ডাকুন তাহলে ?

মহিমবাবু এইবার জানালার দিকে তাকিয়ে, বোধহয় দূরের নেফা-পাহাড়ের মাথায় সাদা মেঘটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—আমি তখন সেখানে ছিলাম। আমিই দুজনের মাঝখানে পড়ে আর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঝগড়াটা থামিয়ে দিয়েছিলাম।

শুক্তি বলে—অফিসার ভদ্রলোকই বা কেমনতর মানুষ ? পারমিট দিলেন না কেন ?

মহিমবাবু—বোধহয় সরকারের নিয়ম।

হেসে ফেলে শুক্তি।—সরকারই বা কেমনতর ?

শুক্তিকে নিয়ে গাড়িটা ফটক পার হয়ে চলে যাবার পরেও

জানালাটার কাছে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন মহিমবাবু; মহিম দস্তিদার, পনর বছর আগে যিনি দিনাজপুরের স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। এই ছিপছিপে সুগৌর বুড়ো মানুষটির কপালে কোন রেখা ফুটে ওঠে না। চোখ-মুখ সব সময়েই হাসছে; চমৎকার একটি আশাসুখী চেহারা। জীবনে যা আশা করেছিলেন, তার সবই পেয়ে গিয়েছেন। আরও যা আশা করেন, তাও পেয়ে যাবেন। তিন ছেলে আছে; তিন ছেলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। রমেন, রথীন, রজত, তিনজনেই দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে কাজ করে। কেউই কনিষ্ঠ কেরানী নয়; তিনজনেই জ্যেষ্ঠ অফিসার।

গণ্ডগোল তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাটি পছন্দ করেন না মহিমবাবু। তিনি চান, ভাগ্য যা দিয়েছে তাই নিয়ে শান্ত হয়ে থাক আর আশা কর। ভেবে একটু দুঃখও বোধ করেন মহিমবাবু; মানুষের মন এত সহজে ধৈর্য হারায় কেন? একটু সহ্য করতে অসুবিধে কোথায়?

রবার বাগানের এক প্রান্তের এই বাড়ি, যে বাড়িকে 'ভারতী' নাম দিয়ে খুশি হয়েছেন মহিম দস্তিদার; সে বাড়ি তৈয়ারীর সব টাকা দিয়েছে রমেন। গাড়িটা কিনে দিয়েছে রথীন। আর, সেগুন কাঠের সুন্দর আসবাব দিয়ে বাড়িটাকে ভরে দিয়েছে যে, সে হলো রজত। মুগার চাদরটি গায়ে জড়িয়ে, ভারতীর চওড়া বারান্দার উপরে যখন পায়চারী করেন মহিমবাবু, তখন অনেক স্বদেশী গান তাঁর মনের ভিতরে গুনগুন করে বাজে। এক-একদিন পাশের বাড়ির লাহিড়ী-বাবুর ছেলে, দশ বছর বয়সের হীরক যখন চেঁচিয়ে গান গেয়ে ওঠে—ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে—তখন মহিমবাবুও চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে বলেন—আরও জোরে গাও, হীরক।

মহিমবাবুর বোধহয় এই সেদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গিয়েছে; তাই জানালা দিয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে ওরকম করে তাকিয়েছেন। এই তো সেদিন, মাস তিন আগে, বিদেশী এক বোটানিস্ট সাহেব এসে সার্কিট হাউসে উঠলেন। নেফার উদ্ভিদের খবর যোগাড় করতে চান এই বোটানিস্ট সাহেব। বললেন,

জঙ্গলে ভরা ওই নেফাকে তিনি দ্বিতীয় এক ইডেন বলে মনে করেন।

দিল্লী আর শিলং থেকে সরকারী মহলের কত মানী মহোচ্চ ও পদস্থের কত শুভেচ্ছার চিঠি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সেই বোটানিস্ট সাহেব, ডক্টর সি. টি. এলগিন। চারজন ভি-আই-পি, যাঁরা সে-সময়ে সার্কিট হাউসে ছিলেন, তাঁরাও বোটানিস্ট সাহেবকে চা খাওয়াবার জন্য যখন-তখন ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। নেফা অফিসের জীপও যখন-তখন ছুটে এসে বোটানিস্ট সাহেবের দরকারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতো। সাহেবের জন্য হেলিকপ্টর যোগাড়ের কত চেষ্টা করলেন নেফা-অফিসের সেই মিস্টার মনোহর লাল, শিশির যাকে সেদিন মিছিমিছি অত্যন্ত বিরক্ত করেছে।

ইনার লাইনের পারমিট পেতে বোধহয় এক ঘণ্টাও দেরি হয়নি; স্বাগত অতিথির মত খুশির হাসি হেসে, সরকারী জীপের আরোহী হয়ে, আর সরকারী শ্রদ্ধার গুরুজন হয়ে নেফা চলে গেলেন বোটানিস্ট এলগিন। তেজপুর থেকে ফুটহিল; ফুটহিল থেকে চাকু; তারপর কে জানে কোন্ দিকে। এর চেয়ে বেশি কোন খবর আর পাননি মহিমবাবু। সেদিন বোটানিস্ট এলগিনকে বিদায় দেবার সময় সার্কিট হাউসের বারান্দায় দশজন ভি-আই-পি আর অফিসারের ভিড়ের এক পাশে মহিমবাবুও দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—শুক্তি কোথায় গেল? জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মহিমবাবুর চোখ-মুখ হাসতে থাকে।

মণিমালা—কেন?

মহিমবাবু—জিজ্ঞেস করতাম, এবছর গগনবাবুর বাগানের কিরকম প্রফিট হলো?

মণিমালা—নতুন পাড়ার শীতলের বাড়িতে বেড়াতে গেল শুক্তি।

মণিমালা কিন্তু বেশ একটু আশা-অসুখী মানুষ ; যদিও হাসি-খুশি মানুষ। তাঁর তিন ছেলে যেন তিন ভিন্ন জগতে থাকে, যেখানে সবার উপরে ছেলের-বউয়ের ইচ্ছা আর অভিরুচিই সত্য, তাহার উপরে নাই। ছেলেরা তিন বছরের পাওনা ছুটি জমিয়ে নিয়ে সস্ত্রী দেশ বেড়াতে যায়। তারা তেজপুরে আসে না ; আসতে পা না। এই পাঁচ বছরে তিন ছেলের একজনও তেজপুরে আসেনি। ঝতে পেরেছেন মণিমালা, পুত্রবধূর সম্মতি না পেলে কোন পুত্রের আর তেজপুরে আসবার দুঃসাহস হবে না। তবে হ্যাঁ, তারা নিয়মিতভাবে টাকা পাঠায়, আর, মাঝে মাঝে চিঠিও লেখে।

মহিমবাবুর মনে কিন্তু কোন অভিযোগ নেই। তিনি হাসেন আর বলেন—মন্দ কি ? ছেলেদের কর্তব্যবোধ তো ঠিক আছে।

মণিমালা বলেন—শুধু টাকা পাঠিয়েই কর্তব্য ! ভাল কথা। সুখে থাকুক।

সবই আছে, তবু কিছু নেই ; মণিমালা যেন এইরকমের একটা চমৎকার শূন্যতার মধ্যে থাকেন। আর, সেই জন্যেই বোধহয় দিদির মেয়ে এই শুক্তিকে এত আপন করে নিয়ে কাছে ধরে রাখতে চান। এ যেন উপোষী মায়ের-প্রাণের একটা তেষ্টা মেটাবার চেষ্টা ! জানেন কিরণলেখা, শুক্তিকে কেন এত বেশি ভালবাসে মণিমালা।

জানেন মণিমালা, শীতলের বাড়িতে একবার না যেতে পারবে না শুক্তি। গিয়েছে, ভালই করেছে। শীতলের বউ মীরা শুক্তিকে দেখতে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবে। সব কাজ ফেলে রেখে শুক্তির শক্ত বেণীটাকে খুলে দিয়ে খোঁপা বেঁধে দিতে চেষ্টা করবে। মীরার ওই এক অভ্যেস ; শুক্তির মাথাটার দিকে চোখ পড়লেই মীরার হাত যেন নিসপিস করে।

শুক্তিরই বাবা গগন বসুর অনেক দূরসম্পর্কের এক কুটুমের ছেলে নতুন পাড়ার শীতল বিশ্বাস, তেজপুর বাজারে যাঁর সামান্য

ধরনের একটা বস্ত্রালয় আছে। মহাজনের দেনা ঠিক সময়ে শোধ করতে না পেরে মাঝে-মাঝে মহিমবাবুর কাছে টাকা ধার চাইতে আসেন শীতল।

শীতল বিশ্বাসের ভাই রতন, নেফা মেডিক্যালের পিয়ন; বছরে দু-একবার কাজের ছুটি নিয়ে তেজপুরে আসে, নতুন পাড়ার বাড়িতে একটা দিন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে পার করে দেয়। কিন্তু পরের দিনই ছটফট করতে থাকে, ঘুম-টুম হয় না। তার পরের দিন নেফা চলে যায় রতন; শীতল আর মীরার আপত্তির কোন কথা গ্রাহ্য করে না। মীরাও রাগ করে তার এই বিচিত্র স্বভাবের দেবরটিকে কথা শোনাতে ছাড়ে না—পাঁচ বছর নেফাতে চাকরি করে তুমিও আস্ত একটি দফলা হয়ে গিয়েছো।

রতন কিন্তু রাগ করে না। হেসে হেসে দফলা ভাষাতে জবাব দিয়ে মীরার রাগটাকে ঠাট্টা করে। সে-ভাষার একটা কথাও বুঝতে না পেরে মীরা আরও রেগে যায়।

এবার কিন্তু রতন বেশ জব্দ হয়েছে। প্রায় এক মাস হতে চললো, তেজপুরে এসেছে রতন। কিন্তু যাই-যাই করেও যেতে পারছে না।

সেটা একটা কাণ্ডই বটে; রতনের কাণ্ড! সেদিন নেফা থেকে এসে, আর, নতুন পাড়ার বাড়িতে ঢুকেও মেজের মাদুরের উপরে ঘুমিয়ে পড়ে থাকবার আনন্দটাকে ভুলে গেল। তখুনি বের হয়ে গেল, আর দু'ঘণ্টা পরে ফিরে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—দেখে যাও বউদি, নেফা থেকে কী বস্তু নিয়ে এসেছি।

নেফার বস্তু? সে কী? রাক্ষুসে ানপা-মুখোশ? বুনো কুমড়ো? ভুর্জ কাঠের ডিবে? ইয়াক দুধের মাখন? চকচকে একটা দফলা দা? কিছুই ধারণা করতে না পেরে, আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে ঘরের বাইরে এসেই চমকে উঠেছিল মীরা। রতনের পাশে দাঁড়িয়ে একটা দফলা মেয়ে হাসছে।

তেজপুর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ওই দফলা মেয়ে, যার নাম রেনকি। মাসখানেক আগে নেফা মেডিক্যালের চিঠি নিয়ে আর

রেনকিকে নিয়ে পিয়ন রতনই তেজপুরে এসেছিল। হাসপাতালে রেনকিকে ভর্তি করে দিয়েই ফিরে গিয়েছিল রতন, ওর চাকরির সেই জায়গাটিতে, খানোয়া বেস থেকে একদিনের হাঁটাপথ সেই এরিয়াতে, যার নাম বিলং।

শীতলবাবুর বাড়িতে গিয়ে মণিমাসিও একদিন দফলা-মেয়ে রেনকিকে দেখে এসেছিলেন। বয়স কত হবে মেয়েটার? উনিশ কুড়ি কিংবা একুশ? ফুলো ফুলো দুটো ভুরুর ছায়ার নীচে দুটো ছোট্ট মিট-মিটে খুশি চোখের তারা চিকচিক করে হাসছে। মেয়েটার দুই গালে কেউ আলতা বুলিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু ওটা ওর রক্তেরই রঙের আভা। আর কব্জিটা! বলতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল মীরা।—রেনকিকে একদিন শাড়ি-ব্লাউজ পরিয়ে সিনেমার ছবি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, মণিদি। আমার তো হাতঘড়ি নেই, তাই ভদ্রলোকের হাতঘড়িটাকে রেনকির হাতে পরাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু রেনকির কব্জিতে পুরুষ ঘড়ির ব্যাণ্ডও টাইট হয়ে ছিঁড়ে গেল। শেষে সিল্কের ফিতে দিয়ে···।

হাসি থামিয়ে নিয়ে মীরা আবার বলে—অমন কব্জি হবে না কেন? মেয়েটা নিজের হাতে ক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙে আর কাঠ কাটে।

এবার কিন্তু একমাসের ছুটি নিয়েছে রতন। আর নেফা মেডিক্যালও অনুমতি দিয়েছে, হ্যাঁ, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ট্রাইবালের মেয়ে রেনকিকে কোন ইণ্ডিয়ান পরিবারের বাড়িতে কয়েকটা দিনের জন্য থাকতে দিতে পারা যায়; যদি অবশ্য সে-বাড়িতে কোন রেসপনসিবল্ বয়স্কা মহিলা থাকেন।

গাঁওবুড়ার মেয়ে রেনকি। খুঁড়িয়ে হাঁটতো রেনকি। হাঁটুর কাছে একটা মাংসপেশী কুঁচকে গিয়ে শক্ত ঢেলার মত হয়ে গিয়েছিল। হাঁটতে গেলেই ব্যথা পেয়ে কটকট করতো হাঁটুটা। সোজা টান হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। অপারেশনের পর সেই হাঁটু ভাল হয়ে গিয়েছে। এখন দৌড়তেও পারে। তাই রেনকিকে নিয়ে যেতে চায় রতন। কিন্তু রেনকি বলে আরও কিছুদিন থাকি।

রতন বোধহয় এখনও চলে যেতে পারেনি। না গিয়ে থাকলে ভালই হবে। শুক্তি তাহলে মেয়েটাকে দেখতে পাবে। খুব খুশি হবে, খুব আশ্চর্য হবে শুক্তি। ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলেন মণিমাসি। দফলা-মেয়েটাকে নিয়ে মীরা কত কাণ্ডই না করেছে। যখন-তখন মেয়েটাকে খেলার পুতুলের মত সাজিয়েছে। দু'বেলা দু'রকম করে খোঁপা বেঁধে দিয়েছে। একদিন মেয়েটাকে দিয়ে লুচি ভাজিয়েছিল মীরা। কালোর মা'র কাছে সে-গল্প বলতে গিয়ে হেসে-হেসে লুটোপুটি করেছে মীরা, যার বয়স এখন প্রায় চল্লিশের কাছে এসে ঠেকেছে। তাহলে শুক্তির মত মেয়ে এখন রেনকিকে নিয়ে কী যে কাণ্ড করবে, ভগবান জানেন। শুক্তি এতক্ষণে বোধহয় দফলা-মেয়েটাকে গান শেখাতেই শুরু করে দিয়েছে, কত গান তো হলো গাওয়া···।

নিজেরই কল্পনার মধ্যে মন ডুবিয়ে দিয়ে হাসতে থাকেন মণিমাসি। তারপর আরও দুটো চিঠি লেখা সেরে ফেলেন। তারপর হঠাৎ শুক্তির গলার স্বর শুনে চমকে ওঠেন,—একটু অপেক্ষা কর রাজবাহাদুর, আমি এখনই আবার বের হব।

শুক্তি বলে—কী চমৎকার মেয়ে রেনকি। আমি ওর গলায় পাউডার মাখিয়ে দিয়েছি, ওর শাড়িতে সেন্ট ছড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু···।

মণিমাসি—কি?

শুক্তি—আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলেছে রেনকি।

—কেন?

—এখনই চলে যেতে হবে বলে।

—চলে যাচ্ছে নাকি?

—হ্যাঁ। কি আর করবে বল? রতনকাকা বলেছেন, আর একটি দিনও দেরি করতে পারবেন না। দেরি করলে রতনকাকার চাকরি চলে যাবে।

আনমনার মত একটু চুপ করে থেকে শুক্তি আবার কথা বলে—উঃ, কী ভয়ানক রেগে গেল রেনকি। রতনকাকার মুখের দিকে

কিছুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে রইলো ; তার পরেই ঘরের ভিতরে ছুটে গেল। গায়ের শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ, সব সাজ খিমচে টেনে সরিয়ে দিয়ে ওর নিজের সাজ পরে বের হয়ে এল। কী খসখসে ধোকড় ক‍াপড়ের একটা লম্বা কোর্তা পরে, ঝুঁটি করে চুল বেঁধে, শক্ত করে কোমরে চাদর জড়িয়ে, আর, রতনকাকার কাছে এগিয়ে যেয়েই ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো রেনকি।—চল।

মণিমাসি কোন কথা বলেন না। মণিমাসি যেন আনমনা হয়ে গিয়েছেন। শুক্তি নিজেই বিড়বিড় করে—রওনা হবার আগেই আমি পালিয়ে এসেছি। আমার খুব ভয় করছিল মণিমাসি।

মণিমাসি হাঁপ ছাড়েন।—তুই কি এখনই আবার বের হবি ?

শুক্তি—ও…হ্যাঁ…একবার অঞ্জলিদির সঙ্গে দেখা করে আসি।

মণিমাসি—যাও, কিন্তু বেশি দেরি না করে এস।

শুক্তি—না, দেরি করবো না। কিন্তু রতনকাকার মুখের দিকে অমন কটমট করে তাকালো কেন রেনকি ? রতনকাকা কী দোষ করলেন ?

মণিমাসির চোখ চমকে ওঠে।—মীরা তোকে কিছু বলেনি বলেছে বুঝি ?

—না, কই, মীরা কাকিমা তো আমাকে কিছু বলেননি।

মণিমাসি আবার হাঁপ ছাড়েন।—না, রতনের দোষ কেন হবে ? ওটা হলো সরকারী নিয়ম, ট্রাইবালের মেয়েকে ট্রাইবালের ঘরেই থাকতে হবে।

—কী বিদ্‌ঘুটে নিয়ম ? হাসতে গিয়ে শুক্তির ঠোঁট দুটো কুঁচকে যায়।

চলে গেল শুক্তি।

মণিমাসির মনের এতক্ষণের ছায়া-ছায়া কিন্তুটা এইবার সুস্পষ্ট একটা প্রশ্নের কায়া হয়ে ফুটে ওঠে। এত ব্যস্ত হয়ে অঞ্জলির বাড়িতে কেন বেড়াতে গেল শুক্তি ? মালতী ওর অনেকদিনের চেনা-জানা বান্ধবী। শীতলবাবুর বাড়ি ওর কুটুমকাকার বাড়ি। কিন্তু অঞ্জলি

তো এমন কেউ নয় যে, নেমন্তন্ন করে না ডাকলেও তার বাড়িতে ছুটে যেতে হবে। অঞ্জলি যে শুক্তির ডবল বয়সের এক মহিলা। অঞ্জলি যে বিধবা মানুষ।

সোম সাহেবের মেয়ে অঞ্জলি আর ছেলে অনিমেব, দুজনেই আজ মণিমাসির কাছে একেবারে অজানা জগতের মানুষ নয়। সোম সাহেব ছিলেন রয়্যাল নেভির একজন অফিসার। মহিমবাবু বলেছেন, তাই জানতে পেরেছেন মণিমাসি, সে-সময়ে সোম সাহেব ছাড়া মাত্র আর তিনজন ইণ্ডিয়ান ভাগ্যবান রয়্যাল নেভির অফিসার হতে পেরেছিল। জার্মান সাবমেরিনের টর্পেডোতে ঘায়েল হয়ে ব্রিটিশের যে যুদ্ধ-জাহাজটা জিব্রল্টার থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে সমুদ্রজলে ডুবে গিয়েছিল, সে যুদ্ধ-জাহাজেই ছিলেন সোম সাহেব। মারা গেলেন সোম সাহেব।

সোম লজ; গণেশঘাটের কাছাকাছি যে লালরঙা বাংলোর বারান্দায় বসে ব্রহ্মপুত্রের আষাঢ়ে ঢলের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়, সে বাড়ি প্রায় পনর বছর ধরে খালি পড়েই ছিল। এক মালী ছাড়া আর কেউ সে-বাড়িতে ছিল না। অঞ্জলি, অঞ্জলির মা, অঞ্জলির ভাই অনিমেব, সবাই পাটনাতে সোম সাহেবের দাদার বাড়িতে, ব্যারিস্টার পি. কে. সোমের বাড়িতে থাকতো। রেলওয়ের ইঞ্জিনীয়ার হয়ে যেদিন শিলিগুড়িতে চলে এল অনিমেষ, তার দশদিন পরে অঞ্জলিকে সঙ্গে নিয়ে অঞ্জলির মা পাটনা থেকে এসে এক সন্ধ্যায় সোম লজে ঢুকলেন, ধূপচন্দন পোড়ালেন, আলো জ্বাললেন।

এমন কিছু পুরনো দিনের ঘটনা নয় যে এরই মধ্যে ভুলে যাবেন মণিমাসি। মাত্র দেড় বছর আগের একটা সকালবেলার ঘটনা। সেদিন শুক্তির সঙ্গে নতুন পাড়ার মীরার বাড়িতে মণিমাসিও গিয়েছিলেন। মণিমাসিরই ইচ্ছে হয়েছিল, গাড়িটা একটু এদিকে-ওদিকে ঘুরে, পদ্মপুকুরের সড়ক ধরে একটু বেড়িয়ে চলে যাক্। কিন্তু পদ্মপুকুরের কাছাকাছি এসেই গাড়িটার ইঞ্জিনের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। বেচারা রাজবাহাদুর আধঘণ্টা ধরে ইঞ্জিনের যত কলকব্জা

টানাটানি আর ঠোকাঠুকি করে শুধু ঘেমে উঠলো আর হয়রান হলো, কিছুই করতে পারলো না। স্টার্ট নিতেই চায় না গাড়িটা।

এক মহিলা, তাঁর সঙ্গে অল্প বয়সের এক ভদ্রলোক, যাঁরা দুজন চমৎকার দুটি হাসি-মুখ নিয়ে গল্প করতে করতে আর আস্তে আস্তে হেঁটে এদিকে আসছিলেন, তাঁরা এবার গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। শুক্তির কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে মণিমাসি বলেন—নিশ্চয় দিদি আর ভাই। দেখছিস না, একেবারে একধাঁচের মুখ ?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সেই অল্পবয়সের ভদ্রলোক, রাজবাহাদুরকে কি-যেন জিজ্ঞাসা করলেন। গাড়ির ইঞ্জিনের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে কি-যেন দেখলেন। নিজেই হাত চালিয়ে একটা প্লাগকে শক্ত করে চেপে বসিয়ে দিলেন। তারপর নিজের হাতেই স্টার্টিং হ্যাণ্ডেলটাকে শক্ত করে ধরে এক পাক ঘুরিয়ে দিলেন। গর্‌গর্‌ করে গর্জে উঠলো গাড়ির স্তব্ধ ইঞ্জিন।

মণিমাসির দিকে তাকিয়ে আর কালিমাখা হাত তুলে একটা নমস্কার জানিয়ে চলেই যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। সেই মহিলা, যিনি এতক্ষণ সড়কের একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিও চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু মণিমাসি বাধা দিলেন—কে আপনারা ? যেচে উপকার করলেন, অথচ একটুও পরিচয় না দিয়ে চলে যাচ্ছেন ?

—আমরা গণেশঘাটের সোম লজে থাকি।

মণিমাসি চমকে ওঠেন।—আপনারা কি সোম সাহেবের ছেলে আর মেয়ে ?

—হ্যাঁ, উনি আমার দিদি।

মণিমাসি—তা তো দেখেই বুঝেছি। কিন্তু এভাবে চলে গেলে তো চলবে না।

—আজ্ঞে ?

গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে, সেই মহিলার দিকে তাকিয়ে

মণিমাসি বলেন—আমি সোম সাহেবের মেয়েকেও বলছি, এভাবে চলে গেলে তো চলবে না।

এগিয়ে এসে মণিমাসিকে নমস্কার করে হাসতে থাকেন সোম সাহেবের মেয়ে।—বলুন, কি করলে চলবে?

মণিমাসি—হয়, আমার সঙ্গে এখনই এই গাড়িতে তোমরা দুজনে আমার বাড়ি যাবে আর চা খাবে। নয়, তোমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে চা খাওয়াবে।

সোম সাহেবের ছেলে আর মেয়ে দুজনেরই মুখের হাসি এইবার খুশির ফোয়ারার মত উথলে ওঠে।—চলুন, আমাদের বাড়ি চলুন।

অগত্যা, কিছুটা নিজেরই কথার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে জব্দ হয়ে, কিছুটা সোম সাহেবের ছেলে আর মেয়ের দুটি চমৎকার হাসিমুখ-অনুরোধের মায়ায় পড়ে সোম লজে না যেয়ে পারেননি মণিমাসি।

হঠাৎ-ঘটনার মত সোম লজের মা দিদি আর ভাই-এর পরিচয় পাওয়ার সেই প্রথম দিনেই দেখতে পেয়েছিলেন মণিমাসি, সোম সাহেবের মেয়ে অঞ্জলির মুখের দিকে তাকিয়ে শুক্তি যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। অঞ্জলি যেন একটা ভিন-জগতের বিস্ময়।

কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, একুশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছে, আজ চল্লিশ বছর বয়সের কাছে এসে পৌঁছেছে অঞ্জলি। তবু অঞ্জলির মুখের হাসি দেখলে মনে হবে, যেন ভোরের শিউলি হাসছে। সাদা সিল্কের শাড়ি, সাদা গরদের ব্লাউজ, সাদা ভেলভেটের চটি, হাতঘড়ির ব্যাণ্ডও সাদা। আর, মুখের রঙ যেন দুধে ঘষা লালচন্দনের রঙ। অঞ্জলির ঘরের টেবিলে বই-এর পাহাড়; পরলোকের যত কাহিনীর বই।

মণিমাসি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও শুনতে পেয়েছিলেন, অঞ্জলি বলছে—আমার মুখের দিকে ওরকম করে তাকিয়ে থাকতে নেই শুক্তি। বেশি কাছে আসতেও নেই। আমি হলাম সেই ওই ওদের মত, যাদের শরীর হয় কিন্তু ছায়া হয় না।

বোকার মত তাকিয়ে বিড়বিড় করে শুক্তি—তা কি কখনও হয়? হতে পারে না, অসম্ভব।

অঞ্জলি হাসে।—হতে পারে। হয়ে থাকে। ওরা শুধু চোখের একটি দৃষ্টি দিয়ে পুকুরের জল শুষে নিতে পারে। ফুলগাছের দিকে তাকালে সেই মুহূর্তে গাছ শুকিয়ে যায়। টুপটুপ করে সব ফুল ঝরে পড়ে যায়।

হেসে ফেলে শুক্তি।—বুঝলাম, আপনি আমাকে কৃষ্ণার মত একটা বোকা খুকী মনে করেছেন, আর তামাসা করে ভয় দেখাচ্ছেন। আমি কিন্তু ভীতু মেয়ে নই, অঞ্জলিদি।

মণিমাসিকে বাড়ি ফেরার তাড়া দেবার জন্য পাশের ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই শুনতে পেয়েছিল শুক্তি, অঞ্জলিদির মা কথা বলছেন—আমার ওই একুশ বছর বয়সের বিধবা মেয়েকে ডাইনি বলে গালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন মেয়ের শাশুড়ি, শিক্ষিতা এম-এ পাস করা শাশুড়ি। একেবারে শূন্য হয়ে এক-কাপড়ে আমার কাছেই ফিরে এল মেয়ে। মেয়েটা ওর স্বামীর একটা ফটোও সঙ্গে আনতে পারেনি, মেয়ের হাত থেকে ফটোটাকে কেড়ে নিয়েছিলেন ওর শাশুড়ি।

কিন্তু শুক্তির ওই মুগ্ধ চোখের করুণ আবেদন ব্যর্থ হয়নি। শুক্তির অনুরোধের জেদ রক্ষা করতে গিয়ে অঞ্জলি অনেকবার এই বাড়িতে, রবার বাগানের এই ভারতীতে এসেছে, বসেছে, হেসেছে। কিন্তু শুক্তির সঙ্গে দু-চারটে কথা বলাবলি করে, আর পাঁচ মিনিটও পার না হতেই চলে গিয়েছে।

অঞ্জলির সঙ্গে অঞ্জলির ভাই অনিমেষও এবাড়িতে এসেছে। ঘরের ভিতরে বসে শুক্তির সঙ্গে কথা বলতে অঞ্জলির যেটুকু সময় লাগতো, সেটুকু সময় বাইরের বারান্দার এদিকে-ওদিকে আস্তে আস্তে হাঁটাহাঁটি করেই পার করে দিত অনিমেষ। বার বার বলে অঞ্জলিকে ধরে রাখতে না পেরে শুক্তি এক-একদিন অনিমেষের দিকে তাকিয়ে, আর বেশ একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ফেলতো—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চললেন, এটা কিন্তু একটুও ভাল দেখাচ্ছে না।

অনিমেষ হাসে :—আমার তো ইচ্ছে, আরও কিছুক্ষণ থাকি। কিন্তু···।

হেসে হেসে এত মনখোলা ভাষায় একটা কথা বলে দিয়েও অনিমেষ যেন আরও একটা কথাকে মনচাপা দিয়ে রেখে দিল।

একদিন মণিমাসি আর অঞ্জলির সামনেই অনিমেষ ছেলেটা কত সহজে ওর মনচাপা কথাটাকে স্পষ্ট করে বলে দিয়ে হেসে উঠলো—আমি একা এলে নিশ্চয় আরও কিছুক্ষণ থাকতাম।

শুক্তিও হাসে।—তা···এলেই পারেন, কে বারণ করছে।

সেবার শুক্তির কলকাতা চলে যাবার আগে হঠাৎ একদিন একাই এসেছিল অনিমেষ। মণিমাসির সঙ্গে শুধু একটি কথা—কেমন আছেন? শুক্তির সঙ্গেও শুধু একটি কথা—কলেজ খুলছে কবে? এ ছাড়া আর কোন কথা বলেনি অনিমেষ। শুধু শুক্তির মেসো মহিমবাবুর সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে প্রায় আধঘন্টা ধরে অনেক কথা আলাপ করে চলে গেল অনিমেষ।

কিন্তু কলকাতা রওনা হবার আগের দিনে শুক্তি কি ওর বিস্ময়ের সেই অঞ্জলিদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে যায়নি? গিয়েছিল। সেখানে অঞ্জলি ছাড়া কি আর কারও সঙ্গে কথা বলেনি শুক্তি? বলেছিল। সোম লজের বারান্দাতে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে সে-সন্ধ্যায় শুধু কি ব্রহ্মপুত্রের জলের শব্দ শুনে চলে এসেছিল শুক্তি? আর কারও কথা শোনেনি? শুনেছিল।

মণিমাসিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ফিরতে এত দেরি কেন হলো রে শুক্তি?

শুক্তি—অনিমেষবাবুর জন্যে।

মণিমাসি—কেন? তার মানে?

শুক্তি হাসে।—অনিমেষবাবুর গল্প বলা আর ফুরোতে চায় না।

—কিসের গল্প?

—যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প।

—পরলোকের গল্প?

—না না। যত সব ইহলোকের গল্প।

—তার মানে?

—এই তেজপুরের যত পাহাড় বন নদী আর মন্দিরের গল্প। এটাই নাকি শোণিতপুর, বাণরাজার রাজধানী।

—অনিমেষ তো ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। ওর মনে আবার এসব গল্পের মায়া কেন?

—আমিও অনিমেষবাবুকে এই কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

—কি শুনিয়েছিস?

—বলেছি, আপনি ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে একজন বেদব্যাস হলেই পারতেন।

সেবার, সেদিনের শুক্তির মুখের কথা শুনে মণিমাসি হেসেছিলেন। কিন্তু তারপর আর ঠিক ওভাবে হাসতে পারেননি, বরং একটু গম্ভীর হয়ে ভেবেছিলেন।

কলেজের ছুটির পর আবার কলকাতা থেকে যেদিন তেজপুরে ফিরে এল শুক্তি, সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনিমেষকে এবাড়ির বারান্দার একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখে একটু চমকে উঠেছিলেন মণিমাসি। শুক্তি বাড়িতে নেই; তবু শুক্তির অপেক্ষায় বসে আছে অনিমেষ।

অনিমেষের হাসিমুখের একটা খুশিভরা কথা শুনে আরও একটু চিন্তিত হন মণিমাসি। অনিমেষ বলে—আমিও আজ শিলিগুড়ি থেকে ফিরেছি।

মণিমাসি—খুব ভাল; তোমাকে দেখে খুব সুখী হলাম। চা খাবে নিশ্চয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শুক্তি কোথায় যেন গিয়েছে, বোধহয় কোলিবাড়িতে ওর বান্ধবীর সঙ্গে একবার দেখা···।

—হ্যাঁ, আপনাদের বেয়ারা বলেছে, দিদি এখন বাড়িতে নেই।

শুক্তির বাড়ি ফিরতে আর কত দেরি হবে, কে জানে? চা খাওয়া হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ বসে রইলো অনিমেষ। তারপর চলে গেল।

দেখতে ভুল হয়নি মণিমাসির, অনিমেষ এসেছিল শুনেই কেমন

যেন আনমনার মত চোখ করে দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলো শুক্তি। রাত আটটার শব্দ বাজিয়ে দিয়ে ঘড়ির বড় কাঁটা নামতে শুরু করেছে—টিক্ টিক্! টিক্ টিক্! মেয়েটাও যেন ওর বুকের ভিতরের একটা শব্দকে শুনছে আর গুনছে।

শুক্তিকে নিয়ে যাবার জন্য চা-বাগানের গাড়ি এল যেদিন, সেদিনও আবার এসেছিল অনিমেষ। মণিমাসি শুনতে পেয়েছিলেন, বাইরের ঘরে অনিমেষের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে শুক্তি—আমি সেদিন বাড়িতে ছিলাম না বলে আপনি কিছু মনে করেননি তো?

—না না, মনে করবার কি আছে? আমি তো জানতামই যে, আপনি বাড়িতে নেই; তবু ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তা ছাড়া, তখন টিপটিপ করে বৃষ্টিও পড়ছিল।

—তাই বলুন। বলতে গিয়ে শুক্তির গলার স্বরটা যেন একটা হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

না, সেদিন আর নেই, যেদিন মণিমাসির ধারণা হয়েছিল যে, শুক্তি শুধু ওর বিস্ময়ের এক অঞ্জলিদিকে দেখবার জন্য গণেশঘাটের সোম লজে যায়। শুক্তির কলকাতার কলেজের যখন ছুটি শুরু হয়, ঠিক তখনই শিলিগুড়ি থেকে রেলের ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষও ছুটি নিয়ে তেজপুরে চলে আসে, এটাও কি ছুটো ছাড়া-ছাড়া হঠাৎ-ঘটনার মিল? নয় বোধহয়। মণিমাসি অনেকবার ভেবেছেন, এখনই চিঠি দিয়ে কিরণদিকে স্পষ্ট করে কিছু বলা উচিত হবে কিনা?

[পাঁচ]

—কান্ছা! ডাক দিলেন সোম লজের অঞ্জলি।

সোম লজের বাচ্চা নেপালী চাকর; কথাটা না শুনে শুধু ডাক শুনেই কাজ করতে ছুটে যাওয়া ওর অভ্যাস। ছুটতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাওয়া, আর মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়াও ওর অভ্যাস। দিগ্বিদিক বুঝবার কোন ধার ধারে না কান্ছা।

এ-হেন এক কান্‌ছা ছুটে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকে, আর জলভরা একটা কাঁচের গেলাসকে টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে অঞ্জলির ঘড়িটারই উপর ধপ করে বসিয়ে দেয়।

গেলাসটা ঝনঝন করে দশ টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। গুঁড়ো হয়ে যায় অঞ্জলির ঘড়ির কাঁচ।

চমকে ওঠে শুক্তি।—এ কি!

কিন্তু অঞ্জলি হাসেন।—আমি তো জল চাইনি, কান্‌ছা। চাইছিলাম···থাক্, তুমি যাও।

শুক্তি আশ্চর্য হয়; এমন একটা কাণ্ড দেখেও অঞ্জলিদি একটুও রাগ করতে পারলেন না। অঞ্জলিদির প্রাণটা কি রাগ করতেই ভুলে গিয়েছে?—সত্যি অঞ্জলিদি, আপনি কারও ওপর একটুও রাগ করতে পারেন না কেন, বলুন তো?

অঞ্জলি—পারি; শুধু একজনের ওপর। সে ছাড়া আর কারও ওপর আমার রাগ নেই।

শুক্তি—জিজ্ঞেস করলে বলবেন কি, কে সে?

অঞ্জলি—সে হলো সে, যার সঙ্গে উনিশ বছর আগে শেষ দেখা হয়েছিল।

শুনে খুশী হয় না শুক্তি। এটা আবার কী এমন নতুন কথা বলছেন অঞ্জলিদি। অঞ্জলিদির মা'র মুখ থেকে মণিমাসি তো কবেই শুনেছেন, উনিশ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন অঞ্জলিদি, তার এক বছর পরেই সায়েন্সের এক ডক্টরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। খুব ভালমানুষ ছিলেন সেই ডক্টর বিনয় সেন। অঞ্জলিদিকে ফরগেট-মি-নট বলে ডাকতেন।

অঞ্জলি বলেন—অমু আমার চেয়ে বারো বছরের ছোট। সেদিন আমার সেই ছোট্ট ভাই অমুও আমাকে কাঁদতে দেখে কেঁদে ফেলেছিল—আমার যে বিনয়দার ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছে, দিদি।

শুক্তির মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। শুনতে ভাল লাগে না এসব কথা। কিন্তু অঞ্জলিদির মুখের হাসিটা যেন লালচে

হয়ে কাঁপছে। বুঝতেও পারা যায় না, কোন্ দিকে তাকিয়ে কী দেখছেন।

আবার, কথাও বলছেন অঞ্জলিদি।—দেখা তো হবেই একদিন। তখন জিজ্ঞেস করবো, ফরগেট-মি-নট মানে কি ডাইনি?

একটা শনশনে হাওয়া জানালার পর্দা কাঁপিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকছে। অঞ্জলিদির সাবানঘষা মাথার চুল এলোমেলো হয়ে ফুরফুর করে উড়ছে।

অঞ্জলিদি!—ডাকতে গিয়ে শুক্তির গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

অঞ্জলি হাসেন।—হ্যাঁ শুক্তি; আমার গল্প শুনতে নেই। বরং···।

বরং, অনুর গল্প শুনে বাড়ি চলে যাও, এই তো বলতে চাইছেন অঞ্জলিদি। কিন্তু অনিমেষবাবুর গল্পের কাছেও যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারা যায় না। বেশ ভয় ভয় করে। তা ছাড়া, নতুন করে আর কি-ই বা বলবেন অনিমেষবাবু? সেই তো যত সব···এই তেজপুরের গল্প।

তেজপুরই বা কেমনতর একটা জায়গা? বাণ রাজার মেয়ে উষা এখানে স্নান করতেন, ওখানে ফুল তুলতেন, সেখানে বসে থাকতেন। আর, অনিরুদ্ধ এসে উষার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, ওখানে ছুটে যেতেন, সেখানে বসে ছটফট করতেন। না, ওসব গল্পের ঘাট পাহাড় আর কুঞ্জবন, পাথর মূর্তি আর ভাঙা মন্দির দেখবার জন্যে শুক্তির প্রাণে কোন সাধ নেই।

না, অবজারভেটরি হিলের মাথায় দাঁড়িয়ে নেফা-পাহাড়ের উত্তুরে স্নো-লাইনের ছবি দেখতেও ইচ্ছে করে না। ব্রহ্মপুত্রের চরের শরবন আর ধানক্ষেতের উপর বিকেলের রোদের খেলা দেখবারও ইচ্ছে নেই। অনিমেষবাবু নিজে একাই গিয়ে ওসব মায়াময় শোভা দু-চোখ ভরে দেখে আসুন না কেন?

সোম লজের বারান্দাটা সাঁচির রেলিং ডিজাইনের গ্রিল দিয়ে ঘেরা; তার উপর চকচকে সোনা-রঙের পেন্টের প্রলেপ। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, যেন একটা সোনার খাঁচা হাসছে। অঞ্জলিদির ঘর থেকে

বের হলেই এই বারান্দা চোখে পড়ে; একটু চমকে উঠতে হয়; একটু থমকে দাঁড়াতেও হয়। কতবার মনে হয়েছে, দম বন্ধ করে, আর, একটা দৌড় দিয়ে বারান্দাটা পার হয়ে গেলেই তো ভাল। কোথাও না থেমে, একেবারে সোজা হেঁটে গিয়ে আর গাড়ির ভিতরে ঢুকে বলে ফেললেই তো হয়—চল রাজবাহাদুর। শিগগির চল।

কিন্তু এ কী অদ্ভুত বিপদ! ইচ্ছে করলেও ওভাবে চলে যাওয়া যায় না। বারান্দার একটা চেয়ারের কাঁধে হাত আর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন অনিমেষবাবু। যেন শুক্তির পায়ের শব্দ শোনবার জন্য একটা অপেক্ষার ধ্যান দাঁড়িয়ে আছে। কোনদিনও কি একটুও ভুল হলো অনিমেষবাবুর? না, কোনদিনও না। বৃষ্টির ঝাপটায় বারান্দা ভিজে গেলেও যেমন, আর ফুটফুটে চাঁদের আলো বারান্দায় গড়িয়ে পড়লেও তেমন, ভদ্রলোক ঠিক ওখানে চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

এরকম করে যদি ইচ্ছে করে একটা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন অনিমেষবাবু, তবে দেখুন না কেন। কিন্তু তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য শুক্তিকে আটক করে থামিয়ে রাখার কি দরকার?

কে জানে, আজ আবার কিসের গল্প বলবার জন্য তৈরী হয়েছেন অনিমেষবাবু। না, আজ আর সময় নেই। গল্প শোনা সম্ভব হবে না। দু মিনিটের জন্য হলেও না। না, আর কিছু শোনবার দরকার নেই।

এগিয়ে যায় শুক্তি, বারান্দায় উঠেও থামে না। হেঁটে যেতে যেতে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে শুধু ছোট্ট একটি কথা বলে নেয়—চলি আজ।

অনিমেষ—যাচ্ছেন? আচ্ছা আসুন।

থমকে দাঁড়ায় শুক্তি। হেসে হেসে কথা বলছে অনিমেষ, কিন্তু গলার স্বরে যেন একটা করুণ আপত্তির মৃদু গুঞ্জন। কত শান্ত আর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুক্তিরই দিকে তাকিয়ে আছে অনিমেষ।

অনিমেষের দিকে না তাকিয়ে, শুধু দূরের সড়কের একটা গাড়ির হেড লাইটের ছুটন্ত আলোর ছটার দিকে তাকিয়ে কথা বলে

শুক্তি—মনে হচ্ছে, আপনি যেন কেমন একটু রাগ করে কথাটা বললেন।

অনিমেষ—হ্যাঁ।

শুক্তির চোখের পাতা শিউরে ওঠে। বুকের ভিতরে শব্দ হয়। রুমাল তুলে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে হাতটাও কাঁপে।

ভয় করছে? হ্যাঁ, অনেক বছর আগে ঠিক এইরকম একটা ভয় পেয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল শুক্তির। শিলংয়ের সেই ঝর্ণার শব্দের প্রতিধ্বনিটা পাইনবনের বাতাসে একবার করুণ হয়ে মিলিয়ে আর ফুরিয়ে যায়; আবার হঠাৎ গুমরে ওঠে। শুনতে ভয় করে বইকি।

কথা বলে না শুক্তি। কিন্তু অনিমেষ বলে—আপনি আমার একটাও অনুরোধের কথা শুনলেন না।

শুক্তি হাসতে চেষ্টা করে।—তাতে কি হয়েছে?

অনিমেষ—কিছু হয়েছে বইকি।

শুক্তি—কী যে বলেন! ভৈরবী পাহাড়ের গুলঞ্চ পিয়াল আর নাগকেশরের ছায়াতে বসে পাখির ডাক না শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?

উত্তর দেয় না অনিমেষ। কিন্তু অনিমেষের চোখ দুটো তেমনই খুশি হয়ে শুক্তির মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

হেসে ফেলে শুক্তি।—এই তো, এখানে আপনার কাছেই দাঁড়িয়ে গল্প করছি। বাইরে গিয়ে গল্প না করলেও চলে।

অনিমেষ—বাগানে যাচ্ছেন কবে? দিন ঠিক করেছেন?

শুক্তি—না। আচ্ছা, চলি এবার।

এইবার সত্যিই প্রায় একটা দৌড় দিয়ে ছুটে চলে যায় শুক্তি। রাজবাহাদুরও গাড়ি স্টার্ট করতে দেরি করে না। স্টেশন ক্লাবের পাশের সড়কের অন্ধকারের কাছে গাড়িটা পৌঁছে যেতেই হাঁপ ছাড়ে শুক্তি।

অদ্ভুত মানুষ এই অনিমেষবাবু। কি মনে করেন ভদ্রলোক, তেজপুর কি সত্যিই একটা রূপকথার জগৎ? মনে কিংবা মুখের

ভাষাতে কোন লজ্জা না রেখে ভদ্রলোক একদিন কত স্পষ্ট করে সত্যি বলেই দিলেন, হ্যাঁ তাই। একবার জিজ্ঞেস করলে হতো, শুক্তি বসু যদি তেজপুরে আর না আসে, তবুও কি আপনি এই তেজপুরকে একটা রূপকথার জগৎ বলে মনে করতে পারবেন?

একটুও ভাবলেন না, একটু বুঝেও দেখলেন না অনিমেষবাবু; আবার একদিন কত স্পষ্ট করে একটা ভয়ানক কথা বলেই ফেললেন— আপনি তো এখনও কিছু বলছেন না।

সেদিন চুপ না করে থেকে বলে দিলেই হতো—বিশ্বাস করুন, এখানে এই বারান্দার আলোর কাছে দাঁড়িয়ে আপনার গল্প শুনতে ইচ্ছে করে, ভালও লাগে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারবো না, বলতে পারি না। আপনি জিজ্ঞেসও করবেন না।

—নামুন দিদি, বাড়ি তো পৌঁছে গিয়েছি। রাজবাহাদুর ডাক দিল বলেই চমকে ওঠে শুক্তি, চোখ মেলে তাকায়। গাড়ি থেকে নেমে যায়।

মণিমাসি বলেন—বাড়ি ফিরতে এত দেরি করলি কেন?

শুক্তি—বাগানের গাড়ি কবে আসবে আমাকে নিতে?

মণিমাসি—আসছে সোমবারে আসবে।

শুক্তি—তার মানে আরও সাতদিন পরে।

—হ্যাঁ।

—না মণিমাসি। তোমার গাড়িতেই আমাকে বাগানে পাঠিয়ে দাও।

—দেব।

—কালই সকালে।

—না, কখ্খনো না। আমাকে রাগাবি না। সাবধান।

—রেগো না মণিমাসি, আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে কালই সকালে যেতে হবে।

—কেন?

—দরকার আছে, তুমি বিশ্বাস কর।

—বেশ।

—একটা কথা। সোম লজের কেউ যদি আসেন, অঞ্জলিদি কিংবা অনিমেষবাবু, তবে বলে দিও, আমাকে হঠাৎ দরকারে চলে যেতে হলো, যেন কিছু না মনে করেন।

—তাই বলবো। কথাটা বলেই গম্ভীর হয়ে যান মণিমাসি।

ভাবতে ভাল লাগে না মণিমাসির; বোধহয় একটা সন্দেহও করছেন যে, শুক্তি যেন নিজেরই ইচ্ছেটার হাত থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যেতে চাইছে। কিন্তু কি দরকার? অনিমেষ তো খুবই ভাল ছেলে।

দুঃখ করে একটা কথা বলেছিলেন কিরণদি, মেয়েটা যেন পাখির স্বভাব পেয়েছে। হঠাৎ শিকলি কেটে পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস। আজ কলকাতা, কাল তেজপুর, পরশু চা-বাগান; এই করে করে মেয়েটা এরকমের একটা উড়ো-উড়ো ছটফটানির মন পেয়েছে। কিন্তু মানুষের জীবনে তো পাখির স্বভাব খাটে না।

চেয়ারটার উপর একটা ক্লান্ত-শ্রান্ত চেহারা নিয়ে চুপ করে বসে আছে শুক্তি। ওর চোখ দেখে মনে হয়, দেয়াল-ঘড়ির টিক টিক শব্দের টোকাগুলিকে মনে মনে গুনছে।

না না, শিকলি-কাটা মন নয়। যা কল্পনা করছেন মণিমাসি, তাই বোধ হয় ভাবছে শুক্তি। একটু স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে আরও নিশ্চিন্ত হবেন মণিমাসি। তাই জিজ্ঞেস করেন—কিন্তু তুই কি ওদের কারও ওপরে রাগ করে···।

হেসে ফেলে শুক্তি।—কী যে আবোল-তাবোল সন্দেহ করছো মণিমাসি! কোন মানুষ কখনও অঞ্জলিদির মত মানুষের ওপর রাগ করতে পারে না।

মণিমাসি—আমি বলছি, হয়তো অনিমেষের ওপর রাগ করে···।

হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শুক্তি।—অনিমেষবাবুর মত মানুষের ওপর আমি রাগ করবো? কখ্খনো না।

মণিমাসি ব্যস্ত হয়ে হাঁক-ডাক করেন—ও কালোর মা, শুক্তিকে খেতে দিতে আর দেরি করো না।

[ছয়]

নেফার পাহাড়ের ওই মেঘ যেন ঘন-ঘোর এক খেয়ালের প্রহেলিকা। মতিগতির কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। গলে গিয়ে ক্ষ হতে হতে উপরে উঠতে থাকে; আবার কখনও বা নীচে যায়। হঠাৎ আবার বিনা ঝড়েই পাহাড়ের গা থেকে যেন আ হয়ে খসে পড়ে আর এদিকের আকাশে ভেসে আসে। সম র ধানক্ষেতের বুকের উপর কালোছায়া ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাবার সময় কদমবাড়ি চা-বাগানের উপর এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়। গগন বসু আজ এই কদমবাড়ি চা-বাগানের বারো আনা মালিক।

বয়সটা সত্তর না হোক, পঁয়ষট্টি বছরের কম হবে না। কিন্তু গায়ে চকোলেট রঙের সিল্কের গেঞ্জি, পরনে সাদা জিনের হ্রস্ব হাফ-প্যান্ট, পায়ে ছোট মোজা, এক হাতে ফেল্টের হ্যাট, আর-এক হাতে তামাকের পাইপ; গগন বসুকে তাই চিনে নিতে কারও অসুবিধে নেই যে, উনি একজন প্ল্যাণ্টার সাহেব।

গগন বসুর স্ত্রী, প্রায় ষাট বছর বয়সের কিরণলেখাকে দেখলে মনে হতে পারে, উনি একজন শাড়িপরা মেমসাহেব; এমনই ধবধবে ফরসা ওঁর গায়ের রঙ। আজকাল আর দেখা যায় না, আগে প্রায়ই দেখা যেত, মাসের মধ্যে অন্তত একবার, তেজপুরের সড়ক ধরে ছুটে চলে যাচ্ছে ঝকঝকে চেহারার একটি মোটরগাড়ি; গাড়িতে ান্টার সাহেব গগন বসুর গা-ঘেঁসে বসে একটা চণ্ড বলিষ্ঠ চেহারার বুলডগ মুখ বাড়িয়ে রয়েছে, আর পথের যত মানুষের ভিড়কে ধমক দিয়ে দিয়ে দুরন্ত এক রাগের ডাক ডেকে চলে যাচ্ছে। গগন বসুর স্ত্রীও সেই গাড়িতে বসে আছেন; নতুন প্যাকেট ছিঁড়ে বিস্কুট বের করে বুলডগের মুখের কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন।

পঁচিশ বছর আগে, মধ্যপ্রদেশের এক দেশী রাজার ট্রেজারির চাকরি ছেড়ে দিয়ে গগন বসু যেদিন এখানে এসে কদমবাড়ি চা-বাগানের এই সুন্দর সাহেবকুঠির লনের উপর একটি চেয়ার পেতে

আর শক্ত হয়ে বসেছিলেন, সেদিন তিনি ছিলেন এই চা-বাগানের চার-আনা মালিক। ওই চার-আনা স্বত্ব গগন বসুর বাবা কান্তি বসুর উইলের দান। একমাত্র ছেলেকে তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু দিয়ে যেতে পারেননি। শেষ বয়সে কান্তি বসু আর এদেশে ছিলেন না। তিনি লণ্ডনেই ছিলেন, আর, ত্রিশ বছর আগে সেখানেই মারা গিয়েছেন। গগন বসুর বিদেশিনী সৎ-মা রেবেকা বসুও আজ প্রায় বিশ বছর হলো লণ্ডনে মারা গিয়েছেন।

সেই কঠিন মামলাতে শেষ পর্যন্ত গগন বসু জয়ী হয়েছিলেন। রেবেকা বসুর ছয় আনা স্বত্ব গগন বসুরই স্বত্ব হয়ে গেল। রেবেকা বসুর দুই ভাইপো, দুই পিটার্স ভ্রাতা, আর্নল্ড আর আর্থারের দাবি সে মামলায় মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল। দুই-আনা স্বত্বের মরিসও দশ বছর আগে হঠাৎ একদিন লণ্ডন থেকে এসে, আর, গগন বসুর কাছে স্বত্ব বিক্রী করে দিয়ে চলে গেলেন।

বার-আনা মালিক গগন বসু আজও এখনও পুরনো অভ্যাসের নিয়মে কদমবাড়ি চা-বাগানের তার-কাঁটার বেড়ার ওদিকে, উঁচু টিলার উপর এই সাহেবকুঠির বারান্দায় এসে লাভের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করেন। আর, ম্যানেজার, ডাক্তার, এমন কি বাগানবাবুও গগন বসুর চোখের সামনের চেয়ারগুলিতে বসে থাকেন।

আজকের এই গগন বসু নিশ্চয় দশ বছর আগের সেই গগন বসু নন। তা না হলে, বাগানবাবু কোন্ ছার, ম্যানেজারও কি গগন বসুর চোখের সামনে চেয়ারের উপর বসতে পারতেন, বসবার সাহস পেতেন?

যে গগন বসু একদিন তেজপুর বাজারে গিয়ে অনেক খোঁজ করেও তাঁর কুকুরের জামার জন্য পছন্দসই ফ্লানেল না পেয়ে দোকানের লোকগুলিকে কুকুরের চেয়েও অধম জীব বলে মনে করেছিলেন, আজকের এই গগন বসু ঠিক সেই গগন বসু নন।

যে গগন বসু একদিন চা-বাগানের মেশিন ঘরের সামনে মজুর আর কামিনদের একটা হল্লার শব্দ শুনে গুলীভরা বন্দুক হাতে তুলে-

ছিলেন, সেই ভয়ানক কড়া মেজাজের গগন বসু আজ বেশ শান্ত হয়ে বসে শুনতে পারেন, শুনেও বেশ শান্ত হয়ে দেখতে পারেন, অফিস-ঘরের দরজা আটক করে আর হল্লা করে কেরানীবাবুকে শাসাচ্ছে আর ভয় দেখাচ্ছে মদে মাতাল একদল মজুর।

এই যে, দুলাল দত্ত নামে একজন মানুষ, গগন বসুরই এক কুটুম্বজন, যাঁর বয়স তাঁর চেয়ে চার বছরের ছোট, আজ এখন চেঁচিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে গদি-আঁটা চেয়ারের উপর পা তুলে দিয়ে বসলেন, তাঁর সঙ্গে দশ বছর আগে কি কখনও হেসে হেসে কথা বলেছেন গগন বসু? কখনও না। দুলাল দত্তকে চোখে পড়তেই কিরণলেখাকে ডাক দিয়ে, আর দুই চোখে দুটি কঠিন অপ্রসন্নতার ভ্রূকুটি নিয়ে আদেশ করতেন গগন বসু—তোমার ওই বিচিত্র মেজদাটিকে ওদিকেই থাকতে বল; আমার কাছে যেন আসে না।

আজ আর সেদিনের মত পাইপ দাঁতে চেপে, একটা শক্ত তৃপ্ত আর উদাত্ত আত্মশ্লাঘা হয়ে কিরণলেখার কাছে সে-কথা বলেন না, বলতে পারেনও না গগন বসু, যে-কথা আট বছর আগেও একবার বলেছিলেন।—এই দুলাল দত্ত লোকটার জীবনের সবই যেমন ষোল-আনা ব্যর্থতা, আমার জীবনের সবই তেমনই, অন্তত বারো-আনা তো সফলতা। বাগানের আর চার-আনা স্বত্ব ছেড়ে দিতে জনসনকে রাজি করাতে বড় জোর আর-একটা বছর লাগবে।

আজ বরং দুলাল দত্তের মুখের ওই হো-হো হাসির সামনে গগন বসুর মুখের হাসিটা বেশ একটু করুণ হয়ে চুপসে যায়। কারণ, জানা আছে গগন বসুর, সব কথার আগে যে কথাটা চেঁচিয়ে বলবেন এই লোকটি; বয়সে কিরণলেখার চেয়ে মাত্র সাড়ে সাত মাস বড়, কিরণলেখারই জেঠতুতো দাদা, মেজদা, এই দুলাল দত্ত।—অঞ্জনার খবর কি? অর্চনা কেমন আছে?

অঞ্জনা আর অর্চনা, গগন বসুর বড় মেয়ে আর মেজ মেয়ে, দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দশ বছর আগে অঞ্জনার, আট বছর আগে অর্চনার। অঞ্জনা আর অর্চনা, দুই মেয়ের একজনও আর বোধহয় এই

কদমবাড়িতে বাপ-মায়ের কাছে মুখ দেখাতে আসবে না; সাংঘাতিক অভিমানে আহত দুটি মুখ। ছয় বছর আগে দুই মেয়ের হাতের লেখা সেই চিঠি দুটো শেষ চিঠি হয়ে গগনবাবুর টেবিলের দেরাজের ভিতরে পড়ে আছে। কিন্তু দেরাজটা কাঠের তৈরী না হয়ে পাঁজরের তৈরী হলে এতদিনে বোধহয় গুঁড়ো হয়ে যেত। অঞ্জনার চিঠি আর অর্চনার চিঠি, দুই চিঠিরই ভাষা প্রায় একরকমের।—ভালই তো আছি। ভালই থাকবো। বলতে পারি না, কদমবাড়ি কবে যাব।

ঘর-বর সবই নিজে পছন্দ করেছিলেন গগন বসু। নিজে খোঁজ নিয়ে সব জেনে নিয়েছিলেন। নিজে গিয়ে সবই চোখে দেখেছিলেন। যেমন দিল্লীর সুকমল তেমনই নাগপুরের প্রভাত; দুই ছেলের রূপ-গুণের মধ্যে তিনি তাঁর আশার দুটি আইডিয়াল ছেলের জীবনের পরিচয় পেয়েছিলেন। যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, ভাল সার্ভিসে আছে, বিদ্যা আছে; আর কি চাই? কালচার ভাল, স্টেটাস ভাল, প্রেস্টিজ ভাল; এমন দুই ফ্যামিলির দুই ছেলে। খুশি হয়ে দুই মেয়ের বিয়ে দিলেন গগন বসু। দিল্লীর ডাক্তার সুকমলের সঙ্গে অঞ্জনার; নাগপুরের মিল ম্যানেজার প্রভাতের সঙ্গে অর্চনার।

কিন্তু অঞ্জনা এখন মীরাটের এক মেয়ে-স্কুলের টিচার, পঁচাশি টাকা মাইনে পায়। মেয়ে-স্কুলের হোস্টেলে থাকে অঞ্জনা। আর, অঞ্জনার স্বামী সুকমল থাকে দিল্লীতেই; একটি ফিরিঙ্গি নার্স মেয়ে এখন তার ঘরোয়া জীবনের বে-আইনী সঙ্গিনী।

অর্চনা তার স্বামীর ঘরেই আছে; মাতাল মিল-ম্যানেজার প্রভাতের হাতের চাবুকের একটা মারের দাগ কপালে নিয়েও অর্চনা বেঁচে আছে। ম্যানেজার ব্যানার্জীকে নাগপুরে একবার পাঠিয়েছিলেন গগন বসু। দেখে এসেছেন ব্যানার্জী, ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে একটা ছেঁড়া তোয়ালে সেলাই করছে অর্চনা। চোখের কোণে কালি, ঘুম হয় না মেয়েটার। হাত দুটো শুকনো রোগা কাঠ-কাঠ, রগ দেখা যায়। অর্চনা হেসেছে।—বাবাকে বলবেন, ভালই আছি।

একদিন মাঝরাতে হঠাৎ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে, আর মাথাটাকে ছ'হাত দিয়ে যেন শক্ত করে খিমচে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন গগন বসু—আমি কি তাহলে একটা অপয়া, একটা জঘন্য আহাম্মক? ছুলাল দত্তের চেয়ে দশগুণ আনফরচুনেট জীব? শুনছো কিরণ, কি বলছি আমি?

কিরণলেখা শুধু কেঁদেছিলেন; কোন জবাব দিতে পারেননি।

চোখ-মুখ আর মাথা ধুয়ে, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়ে, খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন গগন বসু; যেন নিদারুণ এক ক্লান্ত মানুষের নিঃশ্বাস।—শুক্তির বিয়ের জন্য আমাকে কিন্তু চেষ্টা করতে বলবে না কিরণ, কখনও না, সাবধান। আমি পারবো না। আমি মানুষ চিনতে জানি না।

—কবে এলেন। কখন এলেন ছুলাল মামা? হেসে চেঁচিয়ে আর লাফিয়ে লাফিয়ে হেঁটে আসে শুক্তি। ধড়াস করে একটা চেয়ারকে কাছে টেনে নিয়ে বসে পড়ে। তখুনি আবার চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে—আমার চা এখানে পাঠিয়ে দাও, মা। আমি এখন ছুলাল মামার গল্প শুনবো।

গগনবাবুও হাসেন।—বলুন স্যার মেজদা; এবার আপনার রাজ্যি থেকে কী রত্ন নিয়ে এলেন।

ছুলাল দত্ত তাঁর সাদা মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে হাসতে থাকেন।—এনেছি একটা ধনেশ।

—কই কই? চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি।

কিরণলেখা আসেন। চায়ের কাপ শুক্তির হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েই বলেন—লাফাসনি শুক্তি। একটু শান্ত হয়ে বস। গল্প শোন।

আজই এসেছেন ছুলাল মামা; কালই চলে যাবেন। এইরকমই তাঁর আসা-যাওয়ার রীতি। যখন আসেন, তখন তাঁর জীবন ও জীবিকার জংলী রঙ্গভূমি ওই নেফা রাজ্যের একটা-না-একটা প্রাণের নমুনা সঙ্গে নিয়ে আসেন। আজ নিয়ে এসেছেন, একটা ধনেশ পাখি।

এর আগে একবার এনেছিলেন একটা সাদা ময়ূরের বাচ্চা। একবার একটা রঙীন বনবিড়াল। আরও কত কি এনেছেন, তার হিসাব তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন।

কিন্তু এবাড়ির সকলেরই জানা আছে, কাল যখন আবার তাঁর নিজের রাজ্যে রওনা হবেন ত্বলাল দত্ত, তখন ধনেশ পাখিটাকে সঙ্গে নিয়েই চলে যাবেন। সাদা ময়ূরের বাচ্চা, রঙীন বনবিড়াল, আর পোকা-মাকড় যা-কিছু সঙ্গে এনেছিলেন, সবই আবার সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছেন। কিছুই রেখে যাননি। কিরণলেখা জানেন, তাঁর এই মেজদার মাথায় একটু ছিট আছে।

বিয়ে করেননি ত্বলাল দত্ত। তিনি একা মানুষ। সেই কবে, ত্রিশ বছর আগে, ত্বলাল দত্তের বয়স যখন ত্রিশ কিংবা একত্রিশ, তখন দেশের বাড়ি বেচে দিয়ে আর আশি হাজার টাকা নিয়ে কাঠের কারবার শুরু করেছিলেন। নেফার জঙ্গলের লীজ নিয়ে বছরের পর বছর কত ছুটোছুটি আর হাঁটাহাঁটি করলেন। কত বার দেঁতো শুয়োরের চোখের সামনে পড়লেন, রাগী হাতীর ডাক শুনলেন, ভালুকের পাশ কাটিয়ে দৌড় দিলেন। তবু কোন বিপদ হয়নি। কিন্তু তাঁর কারবার যেন মরীচিকার ছলনা হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল, শুধু রেখে গেল তাঁকে, ওই নেফারই জংলী মায়ার মধ্যে, সে মায়ার বন্ধন আজও তিনি ছাড়িয়ে উঠতে পারেননি। তিনি আজ চারত্বয়ারের কাঠের গোলাদার আগরওয়ালার জঙ্গল সরকার। তার মানে আগরওয়ালার লীজের জঙ্গলের যে কুপে যখন গাছ-কাটার কাজ হয়, তখন তিনি সেখানে যান; আর, কাটা গাছের ধড়গুলিকে গুনে নিয়ে চারত্বয়ারের গোলাতে একটা হিসেব পাঠিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের পাওনার হিসেব, গাছ প্রতি চার আনা।

তাঁর পাওনার টাকা নেবার জন্যে বছরে ত্ব'তিনবার চারত্বয়ারে আসেন ত্বলাল দত্ত, তাই কদমবাড়ি চা-বাগানে তাঁর খুড়তুতো বোন কিরণের বাড়িতে এসে, বোধহয় শুধু গল্প বলবার জন্যেই ত্বটো-একটা দিন থাকেন।

আরও একটা ছিট আছে দুলাল দত্তের মাথায়, কিংবা প্রাণে। ফিরে যাবার সময় একটা ঝুলি ভর্তি করে কেষ্টবিষ্টুর আর শিবের হরেক রকমের ছবি তেজপুর বাজার থেকে কিনে নিয়ে যান। টাকায় কুলোলে রবিবর্মার গঙ্গাবতরণ, হরধনুর্ভঙ্গ আর সীতার পাতালপ্রবেশও কিনে ফেলেন। কিরণলেখা জানেন, এসব ছবির বেশির ভাগই নেফার জঙ্গলের যত গাঁয়ের ঘরে ঘরে বিলিয়ে দেন মেজদা।

ছবিগুলিকে যত্ন করে বাঁধা-ছাদা করবার সময় কিরণলেখাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে হেসে ফেলেন দুলাল দত্ত।—তোমার তো নিশ্চয় মনে আছে কিরণ, আমাদের জনাই-এর বাড়ির বাইরের ঘরে এরকমের আরও কত ছবি ছিল।

কারবারের জগতে যাঁরা হাঁটাহাঁটি করেন, বিশেষ করে যাঁরা স্লিপার আর তক্তা ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁরা জানেন, সেই আশি হাজার টাকার দুলাল দত্ত আজকাল আশি টাকার মুখ একসঙ্গে দেখতে পান কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেজন্য দুলাল দত্তকে কখনও উদ্বিগ্ন হতে, একটু গম্ভীর হতে, কিংবা নেফার পাহাড়ের মেঘের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও দেখা যায় না।

শুক্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে গল্প করতে গিয়ে দুলাল মামা যে-সব কথা বলেন, তার সরল অর্থ এই যে, ভূলোকে কোথাও যদি স্বর্গ থাকে তবে ওই ওখানে, যেখানে তিনি থাকেন, আকাদের একটা গাঁয়ের কাছে আর জঙ্গলের পাশে তাঁর মাচানঘরটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে।—ওখানে থাকলে মেঘদূত তোর আর পড়বার দরকার হবে না শুক্তি, নিজেই একটা মেঘদূত লিখতে পারবি। একেবারে কবিনী কালিদাসী হয়ে যাবি।

কিরণলেখার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দুটি চুমুক দিয়ে দুলাল মামার গলার স্বরের উল্লাস আরও প্রবল হয়ে ওঠে।—তুমি বিশ্বাস কর কিরণ, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। জায়গাটা একেবারে কণ্বমুনির তপোবনের মত। শুক্তিকে ওখানে ঠিক একটা শকুন্তলা বলে মনে হবে।

শুক্তি—কিন্তু গাছের বাকল-টাকল পরে ঘুরে বেড়াতে পারবো না।

—বাজে কথা বলিস না। ওসব কিছুই পরতে হবে না। আকা মেয়েগুলোও বাকল-টাকল পরে না। কিন্তু···।

শুক্তি—কিন্তু কি ?

—একটা আকা মেয়ে যখন বনকুমের ঘন ছায়ার মধ্যে বসে, আর একটা কাঠবিড়ালীকে কোলে নিয়ে আদর করে, তখন সত্যিই মনে হয়, যেন একটা শকুন্তলা মৃগশিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছে।

শুক্তি—আমার কিন্তু মৃগশিশু চাই ; কাঠবিড়ালীকে আদর করতে পারবো না।

—মৃগশিশু কেন ? কপালে থাকলে হস্তিশিশু পেয়ে যাবি।

শুক্তি শিউরে ওঠে।—ওরে বাবা !

—ওরে বাবা করবার কিছু নেই। হাতির বাচ্চা দেখলেই গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করবার জন্যে হাত সুড়সুড় করবে।

শুক্তি—আপনি নিজে কি কোনদিন···।

—না। দূর থেকে দেখেছি, একটা হাতির বাচ্চা ওর ছোট্ট শুঁড় দিয়ে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে তুলছে। আবার, কচি বাঁশের কচি পাতা, তার মানে নবীন বেণু কিসলয় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন দুলাল মামা।—আরও কত কি দেখছি, বললে বিশ্বাস করবি না।

শুক্তি—আগে বলুন। শোনবার পর বুঝবো, বিশ্বাস করা যায় কিনা।

—সত্যি, কালিদাস যেমনটি লিখেছেন, ঠিক তেমনি কাণ্ড করে প্রেম করেন জঙ্গলের হাতী আর হাতিনী। উনি শুঁড়ে করে একটা ফুলেল লতা নিয়ে ওঁর গলার উপর ফেলে দিচ্ছেন। তিনি আবার একগাদা শুকনো ধুলো শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাঁর গলার মাখিয়ে দিচ্ছেন। নাই বা হলো পদ্মরেণু, ধুলোর পাউডারই বা কম কিসে ? তারপর শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি করে দুজনের সে কী পীরিতের খেলা।

গগন বসু অপ্রস্তুতের মত এদিক ওদিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই

সরে যান। কিরণলেখা তাঁর মুখের হাসিটাকে আঁচল দিয়ে চেপে ধরেন।—থামুন মেজদা।

দুলাল দত্ত—কেন? কি হলো?

কিরণলেখা—আপনার মুখ খুললে ভয় করে।

দুলাল মামা—আশ্চর্য, সত্যি কথাকে তোমরা এত ভয় কর কেন?

শুক্তি চেঁচিয়ে ওঠে।—আমার ভয় করে না, দুলাল মামা। আপনি বলুন।

কিরণলেখা—চুপ কর শুক্তি।

কদমবাড়িতে এসে যখনই শুক্তিকে দেখতে পেয়েছেন দুলাল মামা, তখনই চেঁচিয়ে উঠেছেন—চল শুক্তি, আমার ওখানে গিয়ে অন্তত পাঁচটে দিন কাটিয়ে আয়। আজও তেমনই উৎফুল্লভাবে সাদা মাথাটাকে হেলিয়ে দুলিয়ে আর চেঁচিয়ে হেসে কথা বলেন দুলাল মামা।—চল একবার; তাহলেই বুঝবি, আমি সত্যি কথা বলছি কিনা।

শুক্তি হাসে।—সব মিথ্যে কথা।

—কেন? কেন? আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন দুলাল মামা।

শুক্তি—তিন বছর ধরে এই একই কথা বলেছেন, কিন্তু নিয়ে তো গেলেন না।

দুলাল মামা একবার তাঁর সাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে আর বেশ শান্ত-নরম স্বরে কথা বলেন—টাট্টু চড়তে পারবি তো? রূপা থেকে দু'দিনের ফুটমার্চ, চড়াই-উতরাই রাস্তা। তারপর আমার আশ্রম। ভেবে দেখ, যদি সাহস থাকে তো বল, কবে যাবি?

শুক্তি—আজই চলুন।

দুলাল মামা—আমার ওখানে কিন্তু রোজ চা পাবি না।

শুক্তি—মাঝে মাঝে পাব তো? তাহলেই হবে।

দুলাল মামা—কিন্তু বিনা চিনির চা।

শুক্তি—বেশ তো। কোন অসুবিধে নেই।

—খাওয়ার মধ্যে শুধু ভাত আর কচুর ঝোল। নয়তো মকাইয়ের ছাতু।

—খুব ভাল।

—খুব ঠাণ্ডা আছে কিন্তু।

—ঠাণ্ডা আমি খুব পছন্দ করি।

—কিন্তু জংলী হাতির ডাকও কি পছন্দ করিস?

—শুনতে পেলে নিশ্চয় পছন্দ করবো।

—বেশ, তাহলে কথা রইলো, আসছে বছর পুজোর ছুটিতে…।

হেসে ফেলে শুক্তি। হেসে ফেলেন কিরণলেখা।

দুলাল দত্ত—তোমাদের এই জায়গাটি অবিশ্যি খুব খারাপ নয়, কিরণ। কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব সুবিধার নয়। ক্ষিদে হয় না, ঘুমও হয় না। নইলে দু-চারটে দিন থাকতাম।

কিরণলেখা—একবার সাতটা দিন থেকেই দেখুন না কেন।

দুলাল দত্ত—অসম্ভব।…এই এই এই শুক্তি, লক্ষ্মী সোনা…।

শুক্তিকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যেতে দেখে আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে উঠলেন দুলাল মামা। শুক্তি থমকে দাঁড়ায়।—কি হলো?

দুলাল মামা—আমার পাখিটাকে বিস্কুট-টিস্কুট খাওয়াসনি মা। এই নে, নিয়ে যা, আমার কাছে পাকা জংলী ডুমুর আছে।

ঝোলা থেকে পাকা জংলী ডুমুর বের করে শুক্তির হাতে দেন দুলাল মামা। শুক্তিও চলে যায়।

[সাত]

পর পর তিনটে দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরেছে। আজ বৃষ্টি নেই; কিন্তু এমন একটা আশ্বিনে দিন ঠিক একটা আষাঢ়ে দিনের মত সেঁতসেঁতে হয়ে রয়েছে।

সবুজ ধানক্ষেতের বুকের উপর দিয়ে যেন একটা পঙ্কিলতার দাগ গড়িয়ে চলে গিয়েছে, ওটা কি একটা সড়ক? থইথই করছে কাদা। এখানে-ওখানে এক-দেড় হাত গভীর এক-একটি গর্ত; যার মধ্যে থিতিয়ে আছে জল। মাঝে মাঝে একটু শুকনো আর শক্ত মাটির

পিঠও দেখতে পাওয়া যায়, যার কাছে জংলী আনারসের ঝোপ ঘন হয়ে ছড়িয়ে আছে। বকের ভয়ে ধানক্ষেতের জলের চ্যাং ছটফটিয়ে লাফ দিয়ে সড়কের গর্তের জলের ভিতর লুকিয়ে পড়তে চায়।

সাইন পোস্টে লেখা আছে—কদমবাড়ি রোড। তাই বিশ্বাস করতে হয়, ওটা একটা সড়কই বটে। মাঝে মাঝে সুরকির লালচে কাদা আর ইটের খোয়াও ছড়িয়ে পড়ে আছে, এই কদমবাড়ি রোড অনেক দূরে গিয়ে নর্থ ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে মিশেছে।

খুব ভাল করেছে শুক্তি; তেজপুরে একটা দিনও আর দেরি না করে, বেশ খট-খটে একটা শুকনো দিনে কদমবাড়ি চলে এসেছে। আর একটি দিন দেরি করলে, শুক্তির মণিমাসির ওই ছ' সিলিণ্ডার গাড়িকে আর কদমবাড়ি পৌঁছতে হতো না। গাড়ি তাহলে মাঝপথে সড়কের কাদার মধ্যে আটক হয়ে পড়ে থাকতো, একটা গণ্ডার বাচ্চা যেমন একদিন…।

গত বছরের আশ্বিন মাসের একটি ভোরবেলায়, যখন সারারাতের বৃষ্টির ঝরানি মাত্র এক ঘন্টা হলো থেমেছে, তখন কদমবাড়ি চা-বাগানের একদল মজুর লাঠিসোটা নিয়ে আর হই-হই করে ওই সড়কের দিকে ছুটে গিয়েছিল। আর, কাদামাখা একটা গণ্ডারের বাচ্চাকে ধরে নিয়ে এসেছিল; সড়কের কাদায় আটক হয়ে আর অচল হয়ে পড়েছিল গণ্ডারের বাচ্চাটা।

শুকনোর সময়েই সড়কটার যা অবস্থা, তা তো জানাই আছে। তার উপর পর-পর তিনদিনের বৃষ্টি, সড়কটা বোধ হয় পচেই গিয়েছে।

জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পান গগন বসু, ওই সড়ক ধরে পর-পর দশটা মিলিটারী ট্রাক চলে যাচ্ছে। তাঁবুর বোঝা আর বোধহয় আটা-ময়দার বস্তায় ভরাট হয়ে একটা কনভয় চলেছে। হোঁচট খেয়ে, হুমড়ি দিয়ে, কাত হয়ে, কখনও বা হেলে-দুলে, কখনও বা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক-একটা ট্রাকের চাকা কাদাজলের ছলক তুলে চলে যাচ্ছে। মনে হয়, ভালুকপং যাবার রাস্তা ধরতে চায় মিলিটারীর সম্ভারের এই কনভয়। কিংবা ওদিকে, আরও কাছে, নদী জিয়াভরলির

এপাশে সেগুন জঙ্গলের কিনারায়, যেখানে মিলিটারীর একটা নতুন ছাউনি হয়েছে, সেখানে পৌঁছবার চেষ্টা করছে কনভয়।

কথাটা মেয়ের মুখ থেকেই শুনতে পেয়েছেন গগন বসু। শুক্তি বলেছে, নদী জিয়াভরলির এপাশে আর ওদিকে আরও এক মাইল দূরে মাটি খুঁড়ে অনেক বাংকার তৈরী করা হয়েছে।—ওই যে, পরশু রাত্রি-বেলা গুম্ গুম্ শব্দ শুনে তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেল বাবা, ওটা বাজ পড়ার শব্দ নয়। লাইট মেশিনগান প্র্যাকটিস করছে ডোগরা রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী।

কে জানে কোথা থেকে এসব খবর শুনতে পেয়েছে শুক্তি। খুব সম্ভব ম্যানেজার ব্যানার্জীর কাছ থেকে শুনেছে। এই তো মাত্র সাত-দিন হলো কলকাতা থেকে কদমবাড়িতে এসেছে। এই সাতদিনের মধ্যে যে তিনটে দিন বেশ শুকনো ছিল, সারা বাগান জুড়ে সকাল-বিকেল রোদ ঝলমল করেছিল, সে তিনটে দিন রোজই সকালবেলা বাংলোর সামনের লনের উপর দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে হাঁকাহাঁকি করেছে শুক্তি—মহারাজা! মহারাজা!

ছুটে এসেছে মহারাজা; গগন বসুর আদরের বুলডগ। মহারাজার সঙ্গে ছুটোছুটি করে লনের নরম ঘাস তছনছ করেছে শুক্তি।

বিকেল হয়েছে যখন, তখন দেখা গিয়েছে, চা-বাগানের একটা শিরীষের ছায়াতে বেতের মোড়ার উপর বসে বই পড়ছে শুক্তি। কিন্তু সত্যিই পড়ছে কি? কিরণলেখা বলেন, বই পড়ে না ছাই পড়ে। হাতে ধরা বইটা একটা ছুতো; চোখ বন্ধ করে শুধু চুপ করে বসে থাকে শুক্তি। হঠাৎ চমকে ওঠে আর চোখ মেলে তাকায়, যেন একটা তন্দ্রার আবেশ হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছে। মাটির ঢেলা তুলে শিরীষ গাছের গায়ে-চড়া একটা কাকলাসের গায়ের উপর ছুঁড়তে থাকে। ঝুপ করে পড়ে যায় আতঙ্কিত কাকলাস।

কনভয়টাকে আর দেখা যায় না। কিন্তু দেখতে পেলেন গগন বসু, সাহেবকুঠির জীপ, নীলরঙা হুডের জীপ গাড়িটা ওই ভয়ানক সড়কের দিকে উল্লাসের হরিণের মত ছুটে চলেছে।

চমকে ওঠেন গগন বসু। কি আশ্চর্য, ড্রাইভার কৈলাস তো নেই; তবে কে এখন ওভাবে জীপটাকে ওই সড়কের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? গগন বসু একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকতে থাকেন—কিরণ, কিরণ, শুনছো?

কিরণলেখা আসেন।—বল।

—শুক্তি কোথায়?

—এই তো এতক্ষণ এখানেই ছিল; তাই তো, কোথায় গেল মেয়েটা? শুক্তি! শুক্তি!

বার বার ডাক দিয়েও শুক্তির কোন সাড়া শুনতে পান না কিরণলেখা। গগন বসু বলেন—ওই দেখ।

দেখতে পেলেন কিরণলেখা। আর সন্দেহ করবার কিছু নেই। শুক্তিই জীপ নিয়ে বের হয়েছে।

এখনই দৌড়ে গিয়ে শুক্তিকে থামতে বলা কি কারও পক্ষে সম্ভব? সম্ভব নয়। আর বোধহয় তিন মিনিটও সময় লাগবে না, জীপ গাড়িটা ওই সড়কের কাদাজলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে; তারপর চাকা স্লিপ করবে। হয়তো একটা গর্ত পার হতে গিয়ে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েই যাবে।

বারো বছর আগে, ওই মেয়ে যখন দশ বছর বয়সের একটা খুকু, তখনই একবার চুপি-চুপি চা-বাগানের কলঘরে ঢুকে একটা হাতল টেনে দিয়ে ভয়াবহ একটা কাণ্ড বাধিয়ে ছিল। কলঘরে আগুন ধরে গিয়েছিল, মেশিনের বেল্ট পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সেই মেয়ে আজ এত বড় হয়েও যেন ভুলে গিয়েছে যে, ওর বয়স বেড়েছে। কাউকে না জানিয়ে চুপি-চুপি গ্যারেজ থেকে জীপ বের করে নিয়ে দূরের সড়কের দিকে ছুটে চলেছে। নিজে না বুঝলে কে ওকে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে, এরকমের দুরন্তপনা ওকে এখন আর একটুও মানায় না? পঁয়ষট্টি বছর বয়সের বাপ, আর ষাট বছর বয়সের মা; দুটো মায়াদুর্বল শাসনের মন এখন একটু রাগ করেই কামনা করে, জীপটা যেন এখনই অচল হয়ে যায়।

সত্যিই অচল হয়ে গেল নাকি জীপটা? জীপটা যে সত্যিই থমকে দাঁড়িয়েছে। কিরণলেখা বিড়বিড় করেন—ভাল চাস তো ফিরে চলে আয়, আর এগুতে চেষ্টা করিসনি!

গগন বসুর শুকনো চোখ দুটো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে।—কে যেন হাত তুলে জীপটাকে থামিয়েছে।

—কে? কে? প্রশ্ন করতে গিয়ে কিরণলেখার গলার স্বরেও যেন একটা ভয় ছলছল করে।

গগন বসু—চিনতে পারছি না। যেই হোক্, লোকটা যেন ভদ্রলোকের মত দেখতে সেই রেপটাইলটা না হয়। যদি হয়, তবে আজ আমি আর রাইফেলে গুলী ভরতে একটুও···।

ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে কাঁপতে থাকেন গগন বসু।

কিরণলেখা বলেন—সুজিত বোধহয়।

সেই মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায় গগন বসুর উত্তেজিত মূর্তিটা।

সত্যিই যদি ওই লোকটা সুজিত হয়ে থাকে, তবে তার এত ক্ষুব্ধ হবার কারণ থাকে না; বরং ব্যাপারটা একটা দৈব বিস্ময় বলে মেনে নিতে হয়। একবার দু'বার নয়, কত কতবার, ওই সুজিত ছেলেটা শুক্তির অবুঝ দুরন্তপনাকে ভয়ানক ভুল থেকে বাঁচিয়েছে।

একবার সাহেবকুঠির মেহেদি বেড়ার ওদিকে কামিনদের ঝুমুর-নাচের হুল্লোড় দেখবার জন্যে পিলখানার পিছনে একটা পুরনো উইঢিবির উপরে উঠেছিল শুক্তি। সে উইঢিবির ভিতরে গোখরো সাপের বাসা। সেদিন সুজিত হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে বলেছিল, শিগগির নেমে আসুন। একবার খুব ব্যস্ত হয়ে আর বিস্কুট হাতে নিয়ে একটা অচেনা কুকুরের কাছে এগিয়ে চলেছিল শুক্তি। হঠাৎ পিছন থেকে ডাক দিয়ে সুজিতই বলেছিল, কাছে যাবেন না, ওটা ক্ষেপা কুকুর।

আরও একটা ভুল, যেটা শুধু একা শুক্তির ভুল নয়; সাহেবকুঠির বাপ মা ও মেয়ে, তিনজনেরই ভুল; সে ভুলের ফলে কী ভয়ানক

কুৎসিত হয়ে দেখা দিয়েছিল একটা বিপদ! সেদিনও সুজিত হঠাৎ ছুটে এসেছিল।

সুজিত ছেলেটা ভাল; কারও বিপদ হবার মত চরিত্র সে নয়। তাছাড়া সে-রকমও কিছু নয় যে, ওকে দেখে কদমবাড়ির সাহেবকুঠির কারও চোখ আশ্চর্য হতে পারে।

দু'বছর আগে, পুজোর ছুটিতে, ঠিক এরকমই একটা শুকনো আশ্বিনের দিনে, কলকাতা থেকে কদমবাড়ির বাগানে এসে যেদিন পৌঁছলো শুক্তি, ঠিক সেদিনই গগনবাবুর রাইফেলটাকে আলমারির ভিতর থেকে বের করে নিয়ে নারকেল গাছের দিকে তাক করেছিল। কচি ডাবের ছড়া ঝুলছে গাছের মাথার কাছে। গুলী করে ছড়ার বোঁটা ঘায়েল করে ডাব নামাতে চায় শুক্তি।

কে জানে কোথায় দাঁড়িয়ে শুক্তির এই দুরন্ত খেয়ালের কাণ্ডটাকে দেখতে পেয়েছিল সুজিত! তাই দৌড়ে গিয়ে আর হাত তুলে শুক্তির হাতের রাইফেলটাকে চেপে ধরেছিল।—গুলী চালাবেন না, গাছের উপরে লোক বসে আছে।

চমকে ওঠে শুক্তি, রাইফেল-ধরা হাতটা শিউরেও ওঠে। সেদিন শুক্তির স্তব্ধ চোখের ভীরু-ভীরু বিস্ময় চিকচিক করে দেখতেও পেয়েছিল, ঠিকই, গাছের মাথায় জড়সড় হয়ে ছোট্ট একটা মানুষের চেহারা বসে আছে।

সুজিত ডাক দেয়—নেমে আয় রাজু। ভয় নেই, কেউ তোকে বকবে না।

চা-বাগানের মজুরদের মেট বুধন সরদারের ছেলেটা কাঁদ-কাঁদ হয়ে নারকেলের মাথা থেকে নীচে নেমে এল।

শুক্তিকে খুব বকেছিলেন কিরণলেখা।—কী অবুঝ আক্কেলহারা মেয়ে! ভুল করে যে একটা নরহত্যার কাণ্ড করতে চলেছিলি। ছি ছি! দেশ-গাঁয়ে এমন মেয়েকেই তো গেছো মেয়ে বলে।

সেই পুজোর ছুটি শেষ হবার ঠিক দশদিন আগে এই শুক্তি, যাকে একটা নিদারুণ গেছো মেয়ে বলে নিন্দে করেছিলেন কিরণলেখা, সেই

মেয়ে এই বারান্দার উপরে একটা চেয়ারে বসে, আর, একটা পায়ের পাতা দু'হাতে চেপে ধরে, সেই সঙ্গে কেঁদে কঁকিয়ে ফুঁপিয়ে একটা দুঃসহ করুণ আতঙ্কের কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল। শুক্তির ডান পায়ের গোড়ালির কাছে ছোট্ট একটা লালচে স্ফীতি দপদপ টনটন করছে।

কুমুদ ডাক্তার এসে বললেন—এটা একটা ফোঁড়া, মুখ নেই। শুধু একটু ওপেন করে দিতে হবে।

কার সাধ্যি শুক্তির এই সামান্য ফোঁড়াকে ওপেন করে! ছুরি হাতে তুলে আর মনে মনে হরিনাম জপে নিয়ে যতবার তৈরী হন কুমুদ ডাক্তার, শুক্তিও ততবার আর্তস্বরের চিৎকার ছেড়ে পা সরিয়ে নেয়।—চলে যান ডাক্তারবাবু, এরকম বুচারি করবেন না। ছিঃ, কিরকমের মানুষ আপনি! শিগগির চলে যান।

গগন বসু আর কিরণলেখা মেয়েকে কত মিষ্টি কথায় কতই না বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝলো না শুক্তি। হার মেনে, অসহায়ের মত ঘরের বাইরে দরজার কাছে দুজনে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বোধহয় কুমুদ ডাক্তারও হার মেনে চলে যেতেন, কিন্তু যেতে পারলেন না। কারণ হঠাৎ ঘরের ভিতরে ঢুকলো সুজিত। শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আর হেসে-হেসে কথা বলে সুজিত—একটু শান্ত হয়ে বসুন।

শুক্তি—বাজে কথা বলবেন না।

সুজিতও আর কোন কথাই বলেনি। শুধু দু'হাত দিয়ে শুক্তির ডান পা'টাকে শক্ত করে চেপে ধরেছিল।

শুক্তির চিৎকার শুনে চমকে উঠে আবার ঘরের ভিতরে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন গগন বসু আর কিরণলেখা, শুক্তি রাগ করে আর চিৎকার করে সুজিতের কামিজের কলারটাকে খিমচে ধরে একটা টান দিয়ে ফরফর করে ছিঁড়ে দিল। কিন্তু সুজিত অবিচল। কোলের উপর একটা তোয়ালে পেতে নিয়ে তার উপর শুক্তির

পা'টাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে সুজিত। কুমুদ ডাক্তার আধ মিনিটের মধ্যেই ফোঁড়া কেটে নিয়ে, দু'মিনিটের মধ্যেই ওয়াশ ও ড্রেস করে দিলেন। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে শুক্তি শুধু কাঁপতে আর ফোঁপাতে থাকে। শুক্তির ব্যাণ্ডেজ করা পা'টাকে কোলের উপর থেকে আস্তে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সুজিত।

আজ এখন সাহেবকুঠির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন গগন বসু আর কিরণলেখা, জীপের ভিতর থেকে ঝুপ করে রাস্তার উপরে নেমেই নাচুনে পাখির মত লাফালাফি করে গাড়ির চা[illegible]ক ঘুরছে শুক্তি। শুক্তির বেণীটাও এই লাফালাফির ঠেলায় কাঁ[illegible] উপর দিয়ে সামনের দিকে গড়িয়ে পড়ে ঝুলছে আর দুলছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে জীপের একটা চাকার দিকে তাকিয়ে রইলো [illegible]। আর, সেই লোকটাও এগিয়ে এল ; শুক্তির পাশে দাঁড়িয়ে জী[illegible] চাকাটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

[আট]

রোগীর বুকে স্টেথিস্কোপ ছোঁয়াবার আগে পাঁচবার, আর রোগীর হাতে ওষুধ তুলে দেবার আগে মনে মনে দশ বার হরিনাম জপে নেন চা-বাগানের ডাক্তার, যাঁর নাম কুমুদ রায়।

অনেকদিন আগে গগন বসু একবার হেসে-হেসে [illegible] করেছিলেন—ফোঁড়া কাটবার ছুরি হাতে নেবার আগে কতবার হরিনাম জপতে হয়, কুমুদবাবু ?

কুমুদবাবুও হেসে জবাব দিয়েছিলেন—বিশ বার।

—তাই বলুন। আমার ধারণা হয়েছিল, এক'শো একবার।

এই ডাক্তার, এই কুমুদনাথ রায়ের ভাইপো সুজিত। কাকা আশা করেছিলেন, তাঁর ভাইপো একদিন লেখাপড়া শিখে অন্তত ডাক্তারীটা পাস করবে।

কিন্তু কাকার আশা সফল হয়নি, হবেও না কোনদিন। ডাক্তারী

পড়া দূরে থাকুক, স্কুলের পড়ার শেষ ক্লাসটাও পার হতে পারেনি সুজিত।

বেশ বুড়ো হয়েছেন কুমুদবাবু, তবু চা-বাগানের লোকেরা তাঁকে বলে, নতুন ডাক্তার। কারণ, মাত্র এই দু'বছর হলো তিনি এই চা-বাগানের ডাক্তার হয়েছেন। আগে ছিলেন ডুয়ার্সের এক চা-বাগানে; পুরো একটি বছর নিজেই পক্ষাঘাতের মত একটা রোগে আড়ষ্ট হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন বলে তাঁর চাকরি গিয়েছে; সেখানে এক ছোকরা বড় ডাক্তার এসেছেন।

ম্যানেজার ব্যানার্জী বলেছিলেন—সাহেব নিজে বুড়ো হয়েছেন বলেই বোধহয় বুড়ো জীবনের কষ্ট বুঝতে শিখেছেন। তা না হলে কুমুদবাবুর মত একটা অপদার্থ বুড়ো ডাক্তারকে চাকরি দেবেন কেন? শুধু কি তাই? কুমুদ ডাক্তারের অপদার্থ ভাইপো সুজিতকেও চাকরি দিতে রাজি আছেন সাহেব। সুজিতের একটা গতি করে দেবার জন্যে সাহেবের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছেন কুমুদ ডাক্তার। সাহেব বলেছেন—বেশ তো, গৌহাটিতে গিয়ে অন্তত কম্পাউণ্ডারীটা শিখে আর পাস করে, আর একটা সার্টিফিকেট নিয়ে চলে আসুক সুজিত। কম্পাউণ্ডার মথুরাপ্রসাদ যেদিন কাজ ছেড়ে দিয়ে কাশীবাস করতে চলে যাবে, সেদিন সুজিতকে কাজে নিয়ে নিতে অসুবিধে হবে না।

কম্পাউণ্ডার মথুরানাথ কাজ ছেড়ে দিয়ে কবেই চলে গিয়েছে। নতুন কম্পাউণ্ডার নন্দলালও কবেই এসে কাজ ধরে ফেলেছে। আর সুজিত আজও সেই সুজিত। কাজ নেই, কাজের চেষ্টা নেই; সেজন্যে কোন লজ্জা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ নেই। ডাক্তার কুমুদনাথ রায়ের ভাইপো সুজিতনাথ রায় যেন এই কদমবাড়ি চা-বাগানের আলো-ছায়ার মধ্যে এক পরম শান্তির যোগী হয়ে জীবনের দিনগুলিকে ক্ষয় করে দিচ্ছে।

সুজিতের বাবা আর মা, দু'জনের কেউই আজ নেই। পাবলিক ওয়ার্কসের সাব-ওভারশিয়ার মণিভূষণ রায় ডিনামাইট দিয়ে নেফার

পাহাড়ের পাথর ফাটাতে গিয়ে যেদিন জখম হলেন আর তেজপুর হাসপাতালে এসে মারা গেলেন, সেদিন তাঁর ছেলে সুজিতনাথের বয়স ছিল চার বছর। আর, সেই মণিভূষণ রায়ের বিধবা স্ত্রী তরুলতা যেদিন তেজপুর হাসপাতালেরই রোগীর বিছানায় একমাস পড়ে থাকবার পর মারা গেলেন, সেদিন তাঁর ছেলে সুজিতের বয়স ছিল সাত বছর।

কাজেই কাকা আর কাকিমার কাছে থেকে আর খেয়ে-পরে আজ পঁচিশ বছর বয়সের জোয়ান হয়ে উঠেছে যে ছেলে, সে আজ কাকা আর কাকিমারই মন-প্রাণের ছেলে। কুমুদ ডাক্তারের বাড়িতে আর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। তিনি নিঃসন্তান।

কাকার আক্ষেপ, সুজিত মানুষ হলো না। কিন্তু কাকিমা মানুষটার মনে কোন আক্ষেপ নেই। সুজিত যে চাকরি-বাকরি করতে চায় না, চেষ্টাও করে না, সেজন্যে কাকিমা প্রিয়বালার মনে কোন অভিযোগ নেই। পঁচিশ বছর বয়সের ভাসুরপো যেন এখনও চার বছর বয়সের একটা শিশু। যেন হারাই-হারাই সদা ভয় হয়, সারাক্ষণ ঢুকুপুকু করছে প্রিয়বালার মনটা। কোথায় গেল ছেলেটা? রান্নার কাজের ব্যস্ততার মধ্যেই বার-বার উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসেন, আর এদিকে-ওদিকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে থাকেন, কি করছে সুজিত? বাইরে অনেক দূরে কোথাও চলে গেল নাকি ছেলেটা?

এমনিতে কথা বলে কম, কিন্তু কী বিচ্ছিরি এক কথা একদিন বলে ফেলেছিল ছেলেটা।—সে জায়গাটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে কাকিমা।

কাকিমা—কোন্ জায়গাটা।

সুজিত—নেফা পাহাড়ের একটা জায়গা; কাকা বলেছেন, জায়গাটার নাম খেলং। ওখানে নাকি এখনও সড়কের ধারে সেই পাথরটা আছে; যেটা ফাটাতে গিয়ে বাবা মরে গেলেন।

চেঁচিয়ে ওঠেন কাকিমা—চুপ, চুপ, কখ্খনো এরকম অলক্ষুণে ইচ্ছের কথা বলবি না।

বলতে গেলে কিছুই হয়নি; কুঞ্জলতার গাছটা একদিন শুধু একটু হেলে পড়েছিল। তাই একটা বাঁশ বেঁধে দিয়ে লতার হেলান ঠিক করে দিচ্ছিল সুজিত। কিন্তু এতেই কাকিমার মনের অস্বস্তি ছটফট করে উঠেছে। চেঁচিয়ে ডাক দেন প্রিয়বালা—ও সুজিত, ওখানে ওরকম করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঘরে আয়। ওখানে বিচ্ছিরি পোকামাকড় আছে। শিগগির চলে আয়।

এমনও ব্যাপার হয়েছে, দুপুরের ভাত খাওয়া সেরে নিয়ে সুজি যখন বিছানার উপর গা গড়িয়েছে, ঠিক তখন পেতলের রেকাবীতে চারটে বড় বড় নারকেল-লাড়ু নিয়ে এসে সুজিতের প্রায় মুখের কাছেই তুলে ধরেন প্রিয়বালা।

—এ কি! এখুনি তো ভাত খেলাম। আপত্তি করে সু ত।

—তাতে কী হয়েছে। অনায়াসে এমন অদ্ভুত কথাটাও বলে ফেলেন প্রিয়বালা।

—এখন রেখে দাও, বিকেলে খাব।

—এখন অন্তত একটা খা।

ঠিক এই রকম এক-একটি ঘটনার সঙ্গে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কাকিমা প্রিয়বালা আরও একটা কথা, চেঁচিয়ে নয়, বেশ একটু চাপা-স্বরে বলেই ফেলেন—চাকরি-বাকরির কোন দরকার নেই। তোর কাকার কোন কথায় একটুও কান দিবি না।

কাকিমার ভীরু প্রাণের একটা কঠিন বিশ্বাস বোধহয় এই সার-সত্য বুঝে ফেলেছে যে, এই পৃথিবীকে বিশ্বাস নেই। তাঁর এই ঘরের বাইরে কোথাও দয়া মায়া মমতা বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। নিষ্ঠুর নিয়তির ডিনামাইট কখন যে কার প্রাণের উপর ফেটে পড়বে, কোন ঠিক নেই। আজও ভুলতে পারেননি প্রিয়বালা, তরুদি যে ঠিক সেদিনই বড়দাকে বলেছিলেন, আজ আর বাইরে বের হয়ো না। কিন্তু বড়দা তো তরুদির কথা একটু গ্রাহ্যও করলেন না, কাজে বের হয়ে গেলেন। হায় রে কাজ?

চা-বাগানের সকলেই জেনে ফেলেছে, কুমুদ ডাক্তারের এই শক্ত-

সমর্থ জোয়ান ভাইপো সুজিত একটি অদ্ভুত ঘরকুনো স্বভাবের ছেলে। ঘরের বাইরে বের হবার জন্য ছেলেটার প্রাণে কোন চাড় নেই, তাগিদ নেই। তেজপুরে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে, বাগানের বুধন সরদারও একদিন তেজপুরে গিয়ে সার্কাস দেখে এসেছে। কিন্তু সুজিত যায়নি। কম্পাউণ্ডার নন্দলালও সুজিতকে কতবার সাধাসাধি করেছে, সার্কাস দেখতে তেজপুরে যাবার সঙ্গী করতে চেয়েছে। কিন্তু যেতে রাজি হয়নি সুজিত।

হ্যাঁ, এই এক বছরের মধ্যে মাত্র দু'বার কদমবাড়ি বাগানের বাইরে গিয়েছিল সুজিত। তা'ও নিজের কোন ইচ্ছের জন্যে নয়; সাহেব বলেছিলেন বলে।—সুজিত, তুমি আজ তেজপুরে গিয়ে কোলিবাড়িতে আমার বন্ধু পরমেশের বাড়ির বাগানের রাজগাঁদার কিছু চারা নিয়ে এস। পরমেশ তো নেই; তার ছেলে শিশিরকে আমার নাম করে বললেই দিয়ে দেবে।

কিন্তু কুমুদ ডাক্তার জানেন, আগে তো সুজিতের এরকম আর এতটা ঘরকুনো স্বভাব ছিল না। সকালবেলা ঘুড়ি ওড়াতে বের হয়ে বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে আসতো। একবার না বলে-কয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গিয়েছিল। ফিরে এসেছিল তিন দিন পরে, কেঁদে-কেটে প্রিয়বালার যখন আধ-পাগল অবস্থা। এসব না হয় অল্প বয়সের ঘর-পালানো ছেলেমানুষীপনার কাণ্ড। কিন্তু বড় হয়েও, এই তিন বছর আগেও, ডুয়ার্সের বাগানে থাকতে মাছ ধরবার জন্যে কোথায় না চলে যেত সুজিত! মহাশোল ধরবার জন্যে তোর্সার জলে ডিঙ্গি ভাসিয়ে আর জাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে সারা দিনটা পার করে দিয়েছে। গো-বাঘা মারবার জন্যে সাঁওতাল সরদারের তীর-ধনুক নিয়ে তিন ক্রোশ দূরে গদাই ফকীরের জঙ্গলে ঢুকেছে। শুধু এই কদমবাড়িতে আসবার পরেই দেখা গেল যে, সুজিত যেন ওর প্রাণটাকে একেবারে অলস করে দিয়েছে। এই চা-বাগানের বাইরে গিয়ে কিছু দেখতে শুনতে ও খুঁজতে ওর আর ইচ্ছেই করে না। এই চা-বাগানের বাইরে যেন পৃথিবীটাই আর নেই।

সেদিন একটু লজ্জিত না হয়ে পারেননি কুমুদ ডাক্তার, সাহেবের মেয়ে শুক্তি প্রথম যেদিন এসে সুজিতকে বেশ মিষ্টি স্বরে একটা শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।—কী আশ্চর্য, মানুষও এত কুঁড়ে হয়! বুঝতে পারি না, আপনি কাজ করেন না কেন?

কুমুদ ডাক্তারের বাড়ির গেটের গা-ঘেঁষা কুঞ্জলতার গাছটার কাছে সুজিত; আর সাহেবকুঠির মেয়ে শুক্তি বুলডগ মহারাজার একটা কান শক্ত করে ধরে নিয়ে সুজিতের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

উত্তর দেয়নি সুজিত। হেসে ফেলেছিল শুক্তি।—গায়ে তো সিংহের জোর, তবে কাজ করতে সাহস নেই কেন?

সুজিত—কি বললেন?

শুক্তি—উঃ কী সাংঘাতিক জোর দিয়ে আমার পা'টাকে চেপে ধরেছিলেন! আর একটু হলে···।

সুজিত হাসে।—কি করবো বলুন, আপনি যে কারও কথা শুনছিলেন না, কাউকে বিশ্বাসও করছিলেন না।

শুক্তি—কিন্তু আপনি তখন হুট করে কোথেকে ছুটে এলেন? ছিলেন কোথায় আপনি?

সুজিত—আমার মনে হয়েছিল, ফোঁড়াকাটার ভয়ে আপনি একটা গণ্ডগোল বাধাবেন। তাই আমি সাহেবকুঠির ফটকের কাছেই ছিলাম।

শুক্তি—বাঃ, বেশ লোক আপনি!

চলে গেল শুক্তি।

সেদিন চলে গেলেও আরও অনেকবার এসেছে শুক্তি। বুলডগ মহারাজাকে সঙ্গে নিয়ে সারা বাগান টই-টই করে ঘুরে বেড়াবার অভ্যাসের সঙ্গে যেন আরও একটা অভ্যাস তৈরী কর নিয়েছে। কুমুদ ডাক্তারের বাড়ির গেটের কুঞ্জলতার কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়াবে। হয় সুজিতের কাকিমা প্রিয়বালার সঙ্গে, নয় সুজিতের সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলে চলে যাবে।

প্রিয়বালাকে দেখতে পেলে শুক্তি ওই সেই একই কথা বলে—আপনাদের সুজিত যতই অকেজো মানুষ হোন না কেন, আমার কিন্তু কয়েকটা উপকার করেছেন।

আর, সুজিতকে দেখতে পেলেও ওই সেই একই কথা বলে শুক্তি—আমি যদি বাবাকে বলি, তবে আপনার এখুনি একটা কাজ হয়ে যাবে।

উত্তর দেয় না সুজিত।

শুক্তি—আপনি জানেন না, আমি কিন্তু বাবাকে বলেছি। বাবা আপনাকে কাজ দিতে রাজি হয়েছেন। কাজটা হলো, বাগানবাবুর কাজ; এমন কিছু খাটুনির কাজ নয়। একটা টুল নিয়ে ছায়াশিরীষের কাছে বসে থাকবেন। বসে বসে শুধু দেখবেন, কামিনগুলো ঠিকমত পাতি ভাঙছে কিনা, কলম চায়ের গোড়ায় ঠিকমত জল পড়ছে কিনা; আর দেখবেন, চৌপলের চারার পাতা মশাতে চুষে শুকিয়ে দিচ্ছে কিনা; দরকার হলে ঝারি করে একটু গন্ধকজল ছিটিয়ে দেবেন, বাস্, এই তো কাজ।

ঘরের ভিতর থেকে প্রিয়বালা বের হয়ে এসে, আর বেশ একটু খুশি হয়ে কথা বলেন—আমি তো মনে করি এটা ভাল কাজ। দূরদেশে যেতে হবে না, বাড়িতে থেকে বাড়ির ভাত খেতে পাবে, অথচ চাকরি করাও হবে।

শুক্তি—এই তো, আপনার কাকিমাও বলছেন। কিন্তু আপনি চুপ করে আছেন কেন?

সুজিত—একটু ভেবে দেখছি।

—ভেবে দেখুন তবে। বলতে বলতে চলে যায় শুক্তি। কিন্তু তখুনি আবার থমকে দাঁড়ায়।—আমি কিন্তু কলকাতায় চলে যাচ্ছি। বার বার তাগিদ দিয়ে মনে করিয়ে দিতে আর আসবো না।

সুজিত—না, না, আপনি আর আসবেন কেন? আমার খুব মনে থাকবে। তবে…।

শুক্তি—কি তবে?

সুজিত—তবে এখানে কোন কাজ না নিয়ে বরং বাইরে কোথাও গিয়ে একটা কাজের চেষ্টা করা ভাল।

শুক্তি—খুব ভাল। তাই করুন। আপনার কাকার তো এই অবস্থা, একশো পঁচিশ টাকা মাইনে পান। তার ওপর আবার বুড়ো হয়েছেন। আপনার একটু ভেবে দেখা উচিত সুজিতবাবু।

সুজিত—হ্যাঁ···আচ্ছা···কিন্তু···

শুক্তি—কি? বলুন।

সুজিত—মজুমদার কি আজও একবার আসবেন?

শুক্তি—ওরকম করে বলবেন না। হয় বলুন, মিস্টার মজুমদার। নয় বলুন, সুশান্তবাবু।

সুজিত—হ্যাঁ, সুশান্তবাবুর কথাই বলছি।

শুক্তি—হ্যাঁ, আসবেন। কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?

সুজিত—না, এমনই; এর আগে তাঁকে আরও দেখেছি কিনা, তাই মনে হলো···।

শুক্তি—উনি তো মস্ত বড় কণ্ট্রাক্টর।

সুজিত—হ্যাঁ, ডুয়ার্সে থাকতে দেখেছি, রেলওয়ের অনেক স্টোর উনিই সাপ্লাই করতেন।

শুক্তি—আপনার কথা বলবো সুশান্তবাবুকে? তাঁর কাছে নিশ্চয় অনেক চাকরি আছে। ইচ্ছে করলে আপনাকে তাঁর কোন একটা অফিসে অন্তত ফাইলবাবুর কাজ দিতে পারবেন।

সুজিত—না, বলবেন না।

শুক্তি হাসে।—অদ্ভুত মানুষ আপনি।

শুক্তির হাতে একটা ট্রানজিস্টর রেডিও ঝুলছে। গান গাইছে রেডিও। শুক্তির রঙীন শাড়ির আঁচলটা যেমন, শুক্তির মুখের হাসিটাও তেমন, ফুরফুর করে উড়ছে।

সুজিত বলে—আপনি কি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন?

শুক্তি হাসে।—একথা কেন আপনার মনে হলো? আমি কি

বেড়াতে যাবার সাজ পরেছি? না, ফিকে নীল শাড়ি ছাড়া আমি বেড়াতে বের হই না।

সুজিত হাসতে চেষ্টা করে।—আমি কি করে বুঝবো, বলুন?

শুক্তি—ঠিক কথা, আমাকে ক'দিনই বা চোখে দেখেছেন যে, বুঝতে পারবেন? এই তো···বোধহয় মাত্র এক বছর হলো আপনারা কদমবাড়িতে এসেছেন, তাই না?

সুজিত—হ্যাঁ।

শুক্তি—সুশান্ত বাবুও বোধহয় আপনাদের আসবার মাস দু'তিন পরে, ও হ্যাঁ, সেই যে আপনি ছুটে গিয়ে আমার হাতের বন্দুকটা চেপে ধরলেন, ঠিক সেদিনই সুশান্তবাবু প্রথম এসেছিলেন।

সুজিত—হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

শুক্তি চলে যেতেই কাকিমা প্রিয়বালা দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে বারান্দার উপরে দাঁড়ান; তারপর সুজিতের কাছে এগিয়ে চোখ-মুখ করুণ করে নিয়ে আর গলা-কাঁপা স্বরে কথা বলেন—সবই তো শুনলাম, সাহেবের মেয়ে যা বলে গেল। কিন্তু তুই কি সত্যিই চাকরির চেষ্টায় বাইরে যাবি?

সুজিত বলে—না।

কোথাও যায়নি সুজিত। শুক্তি কলকাতা চলে যাবার পর সারা দিন-রাতের মধ্যে ঘরের বাইরে একবারও বের হয়েছে কিনা সন্দেহ। দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন প্রিয়বালা। দেখে খুব কষ্ট বোধ করেছেন কুমুদ ডাক্তার। এ কী ভয়ানক আলস্য দিয়ে জীবনটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছে সুজিত! ঘুমের মানুষও নিশির ডাক শুনে চমকে ওঠে আর বাইরে বের হয়ে যায়। কিন্তু সুজিতের ঘুম যেন ভয়ানক একটা রুপোর কাঠি ছোঁয়ানো ঘুম, ভাঙতেই চায় না।

ম্যানেজার ব্যানার্জীও কুমুদ ডাক্তারকে কথা শোনাতে ছাড়েন না। —কানে জল ঢেলে দিলেই ঘুম ভেঙে যাবে। আপনারা শুধু মায়া নিয়ে তুকুপুকু করবেন, কিছু বলবেন না; তবে ও-ছেলের শিক্ষা হবে কেমন করে?

তিন মাস পরে কলকাতা থেকে ফিরে এসে গগন বসুর মেয়ে শুক্তিও কুমুদ ডাক্তারের বাড়ির কুঞ্জলতার কাছে সুজিতকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।—এ কী, আপনি এখনও আছেন? কোথাও যাননি তবে?

সুজিত—না।

দুই চোখের দুটি শক্ত ভ্রূকুটির সঙ্গে শুক্তির চোখের তারা দুটোও যেন বেশ শক্ত হয়ে যায়।—আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।

আর একটিও কথা বলে না শুক্তি। শুধু বুলডগ মহারাজার মাথায় আস্তে একটা টোকা দিয়ে বলে—চল।

জানালার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে পেয়ে খুশি হন প্রিয়বালা, সাহেবের দুর্দান্ত মেয়ে সকালবেলার শান্ত বাতাসে যেন একটা ঝড় তুলে দিয়ে আর আঁচল উড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ভালই হয়েছে। রাগ করেছে করুক, কিন্তু গরীবের বাড়িতে এসে যেন ধমক-ধামক আর না করে।

শীতের দুপুর যখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন সাহেবকুঠির ভিতরের দিকে বাগানমুখী নিরালা বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে শুক্তিও ভাবে, ঠিকই, ওরকমের মানুষের কাছে এতবার যাওয়াই ভুল হয়েছে, এত কথা বলাও ভুল হয়েছে। ভাল কথার সম্মান দিতে জানে না, ওরা হলো সেই রকমের মানুষ।

কী অদ্ভুত স্তব্ধতা। কোথাও একটা শব্দ নেই। মহারাজাও ডাকে না। বাবা ঘুমিয়ে আছেন তাঁর অফিসঘরের আরাম-চেয়ারে। মা ঘুমিয়ে আছেন শুক্তির ঘরে, শুক্তিরই বিছানায়। কিন্তু বাগানের কলঘরের বয়লারও কি ঘুমিয়ে পড়েছে? পাতি ভাঙবার কামিনগুলোও কি গান গাইতে ভুলে গেল?

পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে শুক্তি। কি আশ্চর্য, কুঠির এদিকের এই বারান্দায় কেমন করে এত শব্দহীন হয়ে চলে এলেন সুশান্তবাবু? কেমন করেই বা বুঝলেন যে, শুক্তি এখন এদিকের এই নিরালা বারান্দার এক কোণে চুপ করে বসে আছে? তবে কি

লনের কিনারা ধরে নরম ঘাস মাড়িয়ে আর খুব আস্তে আস্তে হেঁটে এসেছেন?

সুশান্ত মজুমদারের কাঁধের সঙ্গে একটা ক্যামেরা ঝুলছে। সুশান্ত মজুমদারের হাতের পাইপের মুখ থেকে যেন সিরসির করে সরু ধোঁয়ার সাপ বের হয়ে কাঁপছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই সুশান্ত মজুমদার তো কতবার এই বাড়িতে এসেছেন। কিন্তু কোনদিন সুশান্তবাবুকে দেখতে এত অদ্ভুত লাগেনি শুক্তির। সুশান্তবাবুর চোখ দুটোকেও কোনদিন এত লাল হয়ে হাসতে দেখেনি শুক্তি।

—আমি এখন একজন গরীব কণ্ট্রাক্টর, কাকাবাবু। এই কথা বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার, যেদিন হঠাৎ কদমবাড়িতে এসে গগন বসুর কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেখেই চিনতে পেরেছিলেন গগন বসু।—চিনেছি, তুমি সুশান্ত।

হ্যাঁ, সেই সুশান্ত; গগন বসুর দার্জিলিংয়ের বন্ধু হেমেনের ছেলে সুশান্ত। দার্জিলিংয়ে হেমেনের তিনটে গার্ডেন আছে, সে গার্ডেনের বৈশাখী ফ্লাশের অরেঞ্জ পিকো'র কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই গেল, হৈমন্তী ফ্লাশের ব্রোকেন পিকো গুশংও প্রায় সোনার দরে বিকিয়ে যায়। কলকাতার ব্রোকারদের সঙ্গে ঝগড়া করে হেমেন একবার বলেছিল, আমি আর আমার চা অকশনে দেব না; বাগান থেকে সোজা লণ্ডনে চালান করে দেব।

সুশান্ত বলে—আমি এখন তেজা সিং-এর পার্টনার। রেলওয়ে সাপ্লাই বলুন, মিলিটারি সাপ্লাই বলুন, এমন কি হর্তাকর্তাদের মেয়ের বিয়ের সামিয়ানা সাপ্লাই পর্যন্ত, অনেক কিছু ঝঞ্ঝাট আপনাদের এই সুশান্তকে সহ্য করতে হয়।

গগন বসু হাসেন।—ভালই তো। যথেষ্ট উন্নতি করেছো।

সুশান্ত—বছরে তেত্রিশ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিই; আর কত দেব কাকাবাবু? বলুন?

গগন বসু—তুমি এখন কোথায় থাক?

সুশান্ত—সর্বঘটে থাকি, কাকাবাবু। [illegible] গ্যালারিতে আমাকে দেখতে পাবেন। মিনিস্টারের বাড়িতেও দেখতে পাবেন। আর, খোঁজ নেন তো দেখতে পাবেন, আমি একজন সামান্য রোড ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে গাছতলায় বসে আছি। আপনি কি স্বীকার করবেন না কাকাবাবু, এটা যে সত্যিই একটা ইয়ে?

গগন বসু—কি বলছো?

সুশান্ত—এটা যে টাকার যুগ?

গগন বসু বোধ হয় প্রশ্নটাকে এড়াবার জন্যেই হাসতে থাকেন।—হতে পারে। দেখছি, তুমি বেশ অকপট মনে কথা বলতে পার, সুশান্ত।

সুশান্ত—হ্যাঁ কাকাবাবু; আমার আর কিছু না থাকুক, আপনাদের আশীর্বাদে অন্তত ওই অ্যাসেটটুকু আছে, অকপটতা।

সেদিন শুক্তির সঙ্গে কথা বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার।—আমি ভাবতে পারিনি যে, আপনি এখানে থাকেন। আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। মাঝে মাঝে আসবো, কিন্তু বিরক্ত হতে পারবেন না।

মাঝে মাঝে, আর বার বার অনেকবার এ বাড়িতে এসেছেন এই সুশান্ত মজুমদার। যখনই এসেছেন, তখনই শুক্তির জন্য ঝুড়ি ভর্তি করে অজস্র ফুল এনেছেন।

—এই সবই তেজা সিং-এর মিসামারি বাগানের ফুল। ফুল ফলাবার মত সময় আমার নেই, মিস শুক্তি বসু। শিলং থেকে ফ্লাই করে তেজপুরে আসি, স্টেসন ক্লাবে থাকি, তারপর তেজা সিং-এর গাড়িটি নিয়ে এখানে ছুটে আসি। কেন আসি বুঝি না।

শুক্তিকে একদিন এরকমের হেঁয়ালিধরনের কথাও বলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন সুশান্ত মজুমদার। তারপর আরও কত কথা বললেন, সব কথাই চুপ করে শুনেছে শুক্তি, আর হাসতে চেষ্টাও করেছে।

গগন বসু বলেন, সুশান্ত কিন্তু বেশ অকপট মনের মানুষ। কিরণলেখা বলেন, হ্যাঁ। শুক্তি বলে, তাই তো মনে হয়।

কিরণলেখা একদিন শুক্তিকে একটা অদ্ভুত কথা জিজ্ঞেসা করেছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর গলার স্বরে একটা কৌতূহলও বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছিল।—সুশান্ত তো তোরই সঙ্গে বেশি কথা বলে; কি মনে হয় তোর? বেশ ভাল ছেলে?

শুক্তি—তাই তো মনে হয়।

শুক্তিকে একদিন বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার, আমি আপনাকে দেখবার জন্যেই আসি। ওকথা না বললেই ভাল করতেন; কিন্তু শুধু ওই একটি কথার জন্যে মানুষকে অভদ্র বলে মনে করা উচিত নয়। বলেছেন, আরও কত কথা বলেছেন, তার মধ্যে কোন অভদ্রতা ছিল না, যদিও শুনে খুব খুশি হয়নি শুক্তি। বলেছেন, ইচ্ছে করে যে, রোজই এখানে এসে আপনার সঙ্গে একটু টেনিস খেলে চলে যাই।

কিন্তু, সেদিন সত্যিই একটু বেশি কথা বলে ফেলেছিলেন।—চলুন মিস শুক্তি বসু; একটু প্লেজার অভিযান করে ফিরে আসি। মিসামারির কাছে গাভরু নদীর জলে রবার বোট ভাসিয়ে দু'জনে একটু ভেসে আসি। দেখবেন, কত ভাল-ভাল মিলিটারী অফিসারের স্ত্রী আর বান্ধবী সেখানে রবার বোটে ভাসছে, কোরাস গান গাইছে আর ফ্লাস্ক থেকে পানীয় বের করে মনের আনন্দে মুখে ঢালছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

চমকে উঠেছিল শুক্তি। বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল তবু বেশ শান্ত ভাষাতেই জবাব দিয়েছিল।—ওসব কথা আমাকে বলবেন না। বলে লাভ নেই।

সুশান্তর চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের একটা করুণতা নিয়ে কাঁপতে থাকে।—তবে কি আমাকে এখানে আসতেই মানা করে দিচ্ছেন?

শুক্তি—না না; মানা করবো কেন? আসবেন বইকি।

সেই সুশান্ত মজুমদার আবার এসেছে। শুক্তির মুখের দিকে

অপলক দুটো চোখ নিয়ে তাকিয়ে খুব মৃদুস্বরে কথা বলে সুশান্ত।—আমি বলি, বরং আরও একটু দূরে গিয়ে ধানসিরি নদীর জলে একটু আনন্দ করে আসা ভাল। আপনি কি বলেন? আপনার সুইমিং কস্ট্যুম আমিই যোগাড় করে দেব।

চমকে ওঠে শুক্তি।—কি বললেন?

হঠাৎ শুক্তির কাছে এগিয়ে যেয়ে আর চাপা-স্বরে যেন আরও একটা গভীর অনুরোধের কথা বলেন সুশান্ত মজুমদার।

শুক্তি বসুর দুই চোখের তারা দুটো স্তব্ধ হয়ে যায়। গায়ের শাড়িটাকে দুই হাতে শক্ত করে খিমচে আর চেপে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে শুক্তি। একটা কালো কঠিন আতঙ্কের বোবা পাথর যেন শুক্তির মুখের উপর চেপে রয়েছে; কথা বলতে পারে না শুক্তি।

কিন্তু কে একজন হঠাৎ এসে সেই নিরালা বারান্দার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে।

—সুজিতবাবু! ডাক দিয়েই বারান্দা থেকে ছুটে এসে সুজিতের একটা হাত শক্ত করে ধরে কাঁপতে থাকে শুক্তি।

সুজিত বলে—না, কিচ্ছু হয়নি। কোন ভয় নেই।

হাঁপাতে থাকে শুক্তি।—আমি পড়ে যাব, আমাকে শক্ত করে ধরুন।

দু'হাতে শুক্তির দুই হাত শক্ত করে ধরে জিজ্ঞেসা করে সুজিত—এইবার বলুন, কি হয়েছে?

যেন একটা লজ্জার যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে করুণ হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে শুক্তির গলার স্বর।—ফটো তুলতে চায়; ভয়ংকর ফটো।

সুজিতের দুই চোখ দপ করে জ্বলে উঠে শুধু দেখতে পায়, কেউ নেই বারান্দায়। বোধ হয় ওদিকের রেলিং টপকে চলে গিয়েছেন সুশান্ত মজুমদার। হ্যাঁ, চলেই গেলেন। শুনতেও পাওয়া গেল, গাড়ির শব্দটা সাহেবকুঠির ফটক থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে শুক্তির মুখটা অদ্ভুত এক উজ্জ্বলতায় ভরে যায়।—কি আশ্চর্য, আবার আপনি!

সুজিতও হাসে।—হ্যাঁ ; কিন্তু এইবার আমি যেতে পারবো। আর আমার এখানে থাকবার দরকার নেই।

শুক্তি—এতদিন এখানে কী দরকারে ছিলেন ?

সুজিত—এই তো এই জন্যে, এখনই যা হয়ে গেল। আমি জানতাম, আপনি এরকম একটা বিপদে পড়বেন।

চমকে ওঠে না শুক্তি। কিন্তু শুক্তির চোখের তারা ঝিকঝিক করে।—আশ্চর্য !

সুজিত হাসে।—কিন্তু আর আপনার আশ্চর্য হ[illegible]বে না।

শুক্তি—কি বললেন ?

সুজিত—আপনি যা বলেছিলেন ; এবার কাজের চেষ্টায় বাইরে বের হতে হবে।

—কোথায় যাবেন ?

—দেখি কোথায় যাই। এখনও কিছু ঠিক ক[illegible]নি।

বাগানের ঝাউয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি-যেন ভেবে নেয় শুক্তি। তারপরেই বলে—আমি কিন্তু আপনাকে একটা ঠিকানা দিতে পারি, চিঠিও দিতে পারি, যেখানে গেলে আপনার কাজ হবে।

সুজিতও চুপ করে শুক্তির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি-যেন ভেবে নেয়। তারপরেই বলে—দিন তবে।

—একটু দাঁড়ান। চিঠিটা লিখে আনছি।

সাহেবকুঠির বাইরের বারান্দার সিঁড়ির কাছে গিয়ে চুপ করে একটা নিরেট পাথরের মত শান্ত ও সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুজিত। ঘরের ভিতরে টেবিলের কাছে বসে চিঠি লেখে শুক্তি—মেজর পি. বোস, আসাম রাইফেলস, লোখরা। আমাদের বাগানের ডাক্তারবাবুর ভাইপো সুজিত রায়কে যদি একটি চাকরি করে দিতে পারেন কাকা, তবে খুশি হব। এবার ছুটির সময় নিশ্চয় আপনার ওখানে যাব। ইতি—শুক্তি।

জীপের চাকার টায়ার চুপসে গিয়েছে, হাওয়া নেই। ভিতরের টিউব বোধহয় ফেটেই গিয়েছে। সুজিত বলে—তা ছাড়া চাকার রীমও ফেটে গিয়েছে দেখছি।

শুক্তি বলে—ছেড়ে দিন। চলুন যাই। জীপ পড়ে থাকুক এখানে, উপেন মিস্তিরি এসে নিয়ে যাবে।

সুজিত—চলুন। কিন্তু আপনি যাচ্ছিলেন কোথায় ?

শুক্তি হাসে—বলবো না।

সুজিত—ওই সড়কে উঠলে কিন্তু আপনার বিপদ হতো। গর্তে পড়ে বোধহয় উল্টেই যেত জীপটা।

শুক্তির হাসির দোলা লেগে মাথার বেণীটাও দুলে ওঠে।—কেন বিপদ হবে ? বিপদ থেকে বাঁচাতে আপনিই তো আছেন!

সুজিত হাসে।—সে কথা বললে কি চলে ? আজ তো আর-একটু হলে...যদি চাকার হাওয়া ফুরিয়ে গিয়ে আর রীম ফেটে গিয়ে গাড়িটা হঠাৎ অচল হয়ে না যেত...।

শুক্তি—ভুল বলছেন। টিউব বার্স্ট করবার আগেই জীপকে থামিয়ে দেবার জন্যে আপনি হাত তুলেছিলেন।

সুজিত—তা হবে।

শুক্তি—এ তো বড় মজার নিয়ম হয়ে উঠলো দেখছি।

সুজিত—কি বললেন ?

শুক্তি—আমার একটা বিপদ হতে চললেই আপনি কোত্থেকে এসে হাজির হবেন।

সুজিত—না না; আজ কিন্তু আমি সত্যিই জানতাম না যে, আপনি জীপ নিয়ে বের হয়ে এই সাংঘাতিক সড়কের দিকে যাচ্ছেন।

শুক্তি—আমি কিন্তু জানতাম যে, আপনি এখন ওদিক থেকে আসছেন।

সুজিত—আপনি ঠাট্টা করছেন।

শুক্তি—ঠাট্টা করবো কেন? কুঠির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে কি দেখা যায় না যে, আপনি এই সড়কের কিনারা ধরে আস্তে-আস্তে হেঁটে এদিকে আসছেন?

সুজিত হাসতে থাকে।—তাই বলুন।

শুক্তি—কিন্তু আপনি কোত্থেকে আসছেন?

সুজিত—কেন? লোখরা থেকে আসছি।

—সত্যি কথা বলছেন তো? এতদিন লোখরাতে ছিলেন? সত্যিই কাজ করছেন সেখানে? সাহেবকুঠির খুশি মেয়ে শুক্তির মুখের ভাষা, গলার স্বর আর চোখের বিস্ময়, সবই যেন এক সঙ্গে উথলে উঠেছে।

সুজিত—আমার কাকা কি আপনাকে কিছু বলেননি? কাকিমার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়নি?

শুক্তি—না; কেউ আমাকে কিছু বলেননি। কারও সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি।

সুজিত—এই এক বছরের মধ্যেও কি আপনি কারও কাছ থেকে শুনতে পাননি যে···।

শুক্তি—না, কিছুই শুনিনি, যদিও এক বছরের মধ্যে তিনবার কদমবাড়িতে এসেছি আর কলকাতা চলে গিয়েছি। আমি শুধু জানতাম যে, আপনি এখানে নেই। কিন্তু···।

হঠাৎ চুপ করে আর মুখ টিপে হাসতে থাকে শুক্তি।—কিন্তু বলুন তো, কেমন করে জানতে পেলাম যে, আপনি কদমবাড়িতে নেই?

সুজিত—বোধহয় মেজর সাহেব আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, আমি লোখরাতে চাকরি করছি।

শুক্তি—না। একদিন বাগানের নালার জলের হাঁস ধরতে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। জলে ডুবে যেতেই চলেছিলাম, কিন্তু আপনি তবু এলেন না। তখনই বুঝলাম, আপনি এখানে নেই।

জীপের সুইচের চাবিটাকে দুই হাতে লোফালুফি করে হাসতে থাকে শুক্তি।

সুজিত কিন্তু হাসে না; চোখ দুটোও অদ্ভুত হয়ে কেঁপে ওঠে।—তারপর কি হলো?

শুক্তি—নালার ধারের ঘাসের ঝুঁটি দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সামলে গেলাম আর উঠে এলাম।

সুজিত—আপনি সাঁতার জানেন?

শুক্তি—না।

সুজিত—তা হলে বুঝে দেখুন, আপনি খুব ভুল করেছেন। জলের হাঁস ধরতে যাওয়া আপনার একটুও উচিত হয়নি।

শুক্তি—আঃ, ওসব কথা এখন রাখুন। আগে বলুন, কি কাজ করছেন?

সুজিতের গায়ে খাকি জিনের শার্ট, খাকি ফুল প্যাণ্ট। চকচক করছে খাকি নেয়ারের বেল্টের পেতল। পায়ে কাদামাখা গামবুট। সুজিতের এই নতুন মূর্তিটাও হাসছে। সুজিত বলে—আমি আসাম রাইফেলের হাবিলদার। আপনার কাকা মেজর সাহেব আমাকে খুব পছন্দ করে এই চাকরি করে দিয়েছেন।

শুক্তির খুশির মনটা যেন চেঁচিয়ে ওঠে।—কি আশ্চর্য! আপনি সোলজার! চমৎকার! আপনি একটা কাণ্ডই করেছেন সুজিতবাবু! খুব ভাল হলো। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে··· কাজ পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছেন তো?

সুজিত—নিশ্চয়।

শুক্তি—তবে চলুন।

সুজিত—কোথায়?

শুক্তি—বাবার কাছে আপনাকে নিয়ে গিয়ে একবার দেখাই।

সুজিত—আপনি যখন বলছেন তখন সাহেবের কাছে নিশ্চয় একবার গিয়ে দেখা করে আসবো। কিন্তু এখন এই কাদামাখা গামবুট পায়ে···।

শুক্তি—ঠিক আছে। ওতে কিছু আসে যায় না। চলুন।

সুজিতের সঙ্গে গল্প করে করে কাঁকরের ছোট রাস্তা ধরে

সাহেবকুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে শুক্তি। শুক্তির হাঁটবার ভঙ্গীটাও অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে, যেন একটা উতলা খুশির হিল্লোল। শুক্তি যেন কদমবাড়ির সাহেবকু[illegible] একটা জয়ের ট্রফি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে।

দেখে খুশি হলেন গগন বসু।—ভালই করেছো সুজিত, মন দিয়ে কাজে লেগে থাক। তাহলে আরও ভাল হবে।

শুক্তি—সুজিতবাবুকে এই কাজটা কিন্তু আমিই পাইয়ে দিয়েছি, বাবা।

গগন বসু—তুমি?

কিরণলেখা—তুই পাইয়ে দিয়েছিস, মানে?

সুজিত—মেজর সাহেবকে উনিই একটা চিঠি দিয়েছিলেন।

হেসে ফেলেন গগন বসু। সুজিতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।—কেমন আছে প্রণব?

সুজিত—আজ্ঞে?

গগন বসু—তোমাদের মেজর সাহেব, মেজর পি. বোস কেমন আছে?

সুজিত—ভাল। আপনাদের সবাইকে একবার যেতে বলেছেন।

গগন বসু—আর আমার যাওয়া! ওটা আর সম্ভব নয়। হ্যাঁ, এরা যদি যেতে চায় তো যাবে।

কিরণলেখা—আমার তো যেতে ইচ্ছে করে ঠিকই, কিন্তু…।

শুক্তি—আমি কিন্তু যাবই। কাকার বাড়ির কৃষ্ণচূড়ার দোলনাটা নিশ্চয় এখনও আছে।

কিরণলেখা—হ্যাঁ যেও, আর আবার একটা বিপদ বাধিও।

শুক্তি—বাধালেও ভয় নেই। এখন সুজিতবাবু ওখানে আছেন। বিপদ থেকে বাঁচাতে ছুটে আসবেন।

হেসে ফেলে সুজিত। হাত তুলে গগন বসু আর কিরণলেখাকে নমস্কার জানায়।—আসি।

চলে যায় সুজিত। আকাশের দিকে তাকিয়ে শুক্তি বলে—

এরকম কড়া রোদ্দুর আরও দুটো দিন থাকুক, সড়কটাও শুকিয়ে যাক, এদিকে ড্রাইভার কৈলাসও এসে পড়ুক, বাস, তারপর আর কোন কথা নয়, আমি কিন্তু লোখরাতে কাকার বাড়িতে অন্তত দুটো দিনের জন্য বেড়িয়ে আসবো।

কিরণলেখা—সাতদিনের মধ্যে একটি দিনও তোকে বই ছুঁতে দেখলুম না। এর মানে কি? অথচ সুমিত্রার সব চিঠিতে ওই একই কথা পড়তে হয়; শুক্তি সব সময়েই পড়ায় ব্যস্ত। এত ব্যস্ত যে, সময়মত স্নান করতে, খেতে আর ঘুমোতে ভুলে যায়। মেয়েকে নাকি সবই মনে করিয়ে দিতে হয়।

শুক্তি—বড় পিসি মিথ্যে কথা লেখেন না!

কিরণলেখা—বড় পিসি মিথ্যে কথা লেখেনি। কিন্তু তুমি এখানে এসে বড় পিসির কথাটাকে মিথ্যে করে দিচ্ছ কেন?

শুক্তি—মনে হচ্ছে তুমি রাগ করে কথা বলছো।

কিরণলেখা—পড়ার কথা বললেই যদি রাগের কথা হয়, তবে তাই।

গগন বসু—যাকগে, পড়তে ভাল লাগলে পড়বে, না লাগলে পড়বে না। ও নিয়ে এত মাথা ঘামাবার আর ব্যস্ত হবার কি আছে?

শুক্তি—আমি লোখরা থেকে একবার ঘুরে আসি, মা; তারপর দেখবে, দিনরাত পড়ি কিনা।

কিরণলেখা—সেটা আর হবে না; হতে বলছিও না। তবে একটু শান্ত হয়ে বাড়িতেই থেকো, যখন-তখন টই-টই করে ঘুরে বেড়িও না।

চলে যায় শুক্তি; ঘরের ভিতরে গিয়ে কিছুক্ষণ বেশ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; তারপর টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে।

বই পড়তে চেষ্টা করলে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে আর ঘুম পেয়ে যায়। আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলে চোখ দুটো যেন ধড়ফড় করে জেগে ওঠে আর ভুরু টান করে বই পড়তে থাকে; শুক্তির অবস্থা দেখে হেসে ফেলেন কিরণলেখা।—বেশ তো, আগে লোখরা থেকে একবার ঘুরে আয়, তারপর পড়া শুরু করিস।

নেফার পাহাড়ের মাথায় মেঘ নেই। সারা দিনের রোদ খেয়ে শুকিয়ে গেল বাগানের পুরনো পিলখানার সামনের কাদাটে মাঠটা। সেই শুকনো মাঠের উপর কাকের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ঠোঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে কাঁকড়া মারছে। তেড়ে যাচ্ছে বুলডগ মহারাজা।

আজই তো ড্রাইভার কৈলাসের ফিরে আসার কথা। বিকেল ফুরলো, সন্ধ্যা হলো, নারকেলের পাতার ঝালরে টাটকা চাঁদের আলোর ঝিলিমিলিও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কৈলাস এল না। মঙ্গলদই থেকে কদমবাড়ি আসতে কী এমন সময় লাগে যে, সকালে বের হলে সন্ধ্যার মধ্যেও পৌঁছিতে পারা যায় না?

কৈলাস আসেনি; কিন্তু কেউ একজন এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু কে? কে এই সময় বাইরের বারান্দায় গগন বসুর সঙ্গে কথা বলতে পারে? কিরণলেখা তো এখন শুক্তির এই ঘরের একটা আলমারির জিনিস সাজাতে গিয়ে পুরনো কালের ছোট্ট একটা ফ্রক হাতে তুলে নিয়েছেন আর হাসছেন; সেই দুরন্ত ছোট্ট শুক্তির ফ্রক, এখনও কলঘরের কালির ছোপ লেগে আছে ফ্রকের গায়ে।

হঠাৎ বই বন্ধ করে আর কান পেতে শুনতে থাকে শুক্তি। হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে কথা বলছেন কুমুদ ডাক্তার। বেশ অদ্ভুত রকমের কথা।

—আপনি তো জানেন স্যার, গল্পে আছে যে, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল আর হাজার বছরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমাদের সুজিতকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। সেই আলসেমির ঘুম হঠাৎ ভেঙ্গে গেছে। খুব খুশি হয়ে কাজ করছে।

গগন বসু—সুজিতকে দেখে আমারও তাই মনে হলো।

কুমুদ ডাক্তার—আমি কিন্তু আগে জানতাম না স্যার, আজ জানতে পেলাম, আপনার মেয়ে শুক্তিই চিঠি লিখে সুজিতকে এই কাজটা পাইয়ে দিয়েছে।

গগন বসু হাসেন।—হ্যাঁ, আমিও আজ জানতে পেলাম। দেখছি, শুক্তিও তাহলে দেশের বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করতে শিখেছে, যদিও…।

কুমুদ ডাক্তার—আজ্ঞে ?

গগন বসু—যদিও এটুকু চিন্তে করতে শেখেনি যে, নালার জলের হাঁস ধরতে গেলে পা পিছলে যেতে পারে।

কুমুদ ডাক্তার—তা স্যার···ছেলেমানুষের মন স্যার···ওরকম একটু···আচ্ছা আসি স্যার।

হেসে ফেলে শুক্তি। হাতের বইটাকে টেবিলের উপর ফেলে রেখে দিয়ে আর ছুটে গিয়ে এক হাতে গগন বসুর গলা জড়িয়ে ধরে, আর-এক হাতে গগন বসুর মুখটাকেও চেপে ধরে।—তুমি আমাকে এত ঠাট্টা করবে না, বাবা।

কদমবাড়ি চা-বাগানের সাহেবের সোনার ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে ফসকে পড়ে যায়; হাতের পাইপটাও আর-একটু হলে পড়ে যেত। গগন বসুর চেহারাটা যেন গলে যেতে চাইছে; গলার স্বরও যেন এক বিগলিত তৃপ্তির কলরোল।—কোথায় থাকিস তুই, শুক্তি ? দেখছিস, আমি এখানে একা-একা বসে আছি, তবু তুই ওদিকে পড়া নিয়ে পড়ে আছিস ? কাছে এসে একটু বসবি তো!

শুক্তি—নিশ্চয়। লোখরা থেকে ফিরে আসি, তারপর রোজ তোমার কাছে এসে বসবো।

শুক্তির লোখরা যাবার স্বপ্নটাকে আর দুটো দিনও অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। সড়ক শুকিয়ে গেল, কৈলাসও এসে গেল। বিকেল হতেই সাহেবকুঠির টুরার গ্যারেজ থেকে বের হয়ে গেটের সামনে শুধু এক মিনিটের মত দাঁড়ালো আর শুক্তিকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

কদমবাড়ি থেকে লোখরা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে ? দেড় ঘণ্টার বেশি নয়। কিন্তু এই শুকনো সড়কের রাক্ষুসে গর্তগুলি টুরারের স্পীড মিথ্যে করে দিয়ে লোখরা পৌঁছতে কত দেরি করিয়ে দেবে কে জানে ?

কৈলাস বলে—এই সড়কের মেরামতের জন্যে এ বছরে কন্ট্রাক্টর কত টাকা নিয়েছে, সে খবর তো আপনি জানেন না দিদি।

শুক্তি—কত টাকা ?

কৈলাস—একান্ন হাজার টাকা।

শুক্তি—কিন্তু কই, মেরামত করা তো হয়নি।

কৈলাস—মেরামত করবার দরকার কি? বিনা ভি মজেসে বন যাতা হ্যায়; আওর মজেসে পাস হো যাতা হ্যায়।

শুক্তি—কে কণ্ট্রাক্টর?

কৈলাস—মিসামারিকা তেজা সিং আওর মজুমদার।

শুক্তি—তোমার স্ত্রীর অসুখ এখন কেমন? সেরেছে?

কৈলাস—একটু সেরেছে। হাঁ, আপনি তো বলবেন…।

শুক্তি—আমি কিছু বলছি না, তুমি চুপ কর।

কৈলাস—রাগ করবেন না দিদি। আপনি বলবেন, এটা নেহরু-রাজ। হম বোলেঙ্গে, হায় ভগবান রাজ! চোরের জোর, চোরের খাতির, চোরের ইজ্জৎ! চোরলোগ ওই নেকার পাহাড়কেও গিলে খেয়ে ফেলবে। একদিন বলবেন, ঠিকই বলেছিল মুরুখ কৈলাস।

শুক্তি—আমি বলছি, তুমি চুপ কর।

কৈলাস—চুপ তো করতেই হবে, দিদি। আমার মত গরীবেরও দশটা টাকা খেয়ে নিয়ে তবে আমার লাইসেন্স রিনিউ করেছে পুলিশ। তাই বাড়ির রোগী মানুষটার জন্যে আমি এক টাকারও ওষুধ কিনে দিয়ে আসতে পারিনি। কাকেই বা বলবো একথা?

শুক্তি—আমি তোমাকে পাঁচ টাকা দেব। তুমি চুপ কর।

কৈলাস—আপনি আমাকে না হয় দিলেন। ভগবান আপকো ভালা করে! কিন্তু আরও যে কত কৈলাস আছে দিদি; তাদের কে দেবে?

শুক্তি—জানি না। কিন্তু তুমি তোমার মহাভারত থামাবে কিনা?

কৈলাস—হ্যাঁ, থেমেছি, থেমেই তো আছি।

শুক্তি—কি বললে?

কৈলাস হাসে।—এই তো মেজর সাহেবকা কোঠি।

চমকে ওঠে শুক্তি। হেসেও ফেলে। লোখরার কাকার বাড়ির

গেটের সামনে থেমে আছে গাড়িটা। বাড়ির বারান্দায় আলো জ্বলছে ; তাই দেখতে অসুবিধে নেই, দাঁড়িয়ে আছেন আর হাসছেন বাণী কাকিমা।

গাড়ি থেকে নামে শুক্তি।—কৈলাস, তুমি একটু জিরিয়ে নিয়ে আর চা খেয়ে তারপর যেও।

কৈলাস—কবে আবার আসতে হবে ?

শুক্তি—আমি খবর দেব।

[দশ]

বাণী কাকিমা বলেন—আগেই বলে রাখছি, শুক্তি, যাব-যাব করতে পারবে না। এসেছো যখন, তখন অন্তত দশটা দিন থাক।

শুক্তি—আমার তো দশটা বছর থাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু···ও কি! ও কি! কে ওটা ?

ঘরের ভিতরে চোখ পড়েছে শুক্তির ; আর, যেন সাংঘাতিক একটা লোভের বস্তু দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

—ইস্। এতদিন ধরে কত ছাই আজেবাজে কথা মনে পড়েছে, অথচ এটার কথা মনে পড়েনি। বলতে বলতে ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে বিছানা থেকে একটা বাচ্চাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে শুক্তি। এটা হলো বাণী কাকিমার সেই বাচ্চাটা, এক বছর আগে যেটা বিছানায় শুয়ে শুধু হাত-পা ছুঁড়তো, হামা দিতেও পারতো না। আজ এখন সেটা বিছানার উপর বসে, আর, একটা হাত তুলে শুক্তিকে যেন ছোট্ট একটা ঘুসি দেখিয়ে হাসছিল।

বাণী কাকিমা হাসেন।—এটার একটা আশ্চর্য অভ্যেস হয়েছে ; ঘরের লোকের কোলে উঠতে কোন চাড় নেই। কিন্তু বাইরের লোক দেখতে পেলেই কোলে ওঠবার জন্য উসখুস করবে, হাত ছুঁড়বে।

শুক্তি—এটা কি রকমের কথা হলো কাকিমা ? আমি কি বাইরের লোক ?

বাণী কাকিমা—আঃ, আগে শুনে নাও কথাটা। ওই যে, যে লোকটিকে তুমি চাকরির জন্য চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলে, কি-যেন নাম, সুজিত? হ্যাঁ, সে লোকটিকেও কী অদ্ভুত চিনে রেখেছে এইটুকু বাচ্চা! ওকে দেখলেই হাত ছুঁড়বে, কোলে যাবার জন্যে ছটফট করবে।

শুক্তি—সুজিত কি করে? কোলে নেয় না?

বাণী কাকিমা—নেয় বইকি। মাঝে মাঝে কাজের অর্ডার নেবার জন্যে তোমার কাকার কাছে সুজিত যখন আসে, তখন সেই তাড়াতাড়ির মধ্যেও দুষ্টুটাকে কোলে নিয়ে পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-সেদিক বেড়িয়ে আসে।

শুক্তি—দুষ্টুর নামটা কি?

বাণী কাকিমা—নাম তো এখনও কিছু হলো না। তোমার কাকা ডাকেন, হনুমান।

শুক্তি—ধেৎ! এটার নাম তুলতুল! সত্যি এটা কী নরম তুলতুলে হয়েছে, কাকিমা!

গগন বসুর খুড়তুতো ভাই প্রণব বসু, মেজর বোস; শক্ত করে পাকানো বড়-বড় এক জোড়া গোঁফ যাঁর লম্বা-চওড়া শরীরটার সঙ্গে চমৎকার মানায়, তিনি এক বছর আগে এই ঘরের ভিতরে শুক্তির দিকে তাকিয়ে, আর হাত তুলে বাণীকে দেখিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—এই মহিলা কেন যে আমাকে বিয়ে করলেন, বুঝি না। তুই কিছু বুঝিস নাকি শুক্তি?

শুক্তি—হ্যাঁ, খুব বুঝি।

প্রণব বসু—কি?

শুক্তি—আপনি এই মহিলাকে বিয়ে করলেন বলে?

প্রণব বসু—যাই হোক, হনুমানের মা একবার বলুক, আমি ওর কোন্ স্বপ্নটা ব্যর্থ করে দিলাম। সব সময় কিসের এত অভিযোগ?

বাণী—পুরো তিনটি বছর হলো শান্তিপুর যাইনি শুক্তি। তুমিই বল, মানুষ এই অবস্থা সহ্য করতে পারে?

প্রণব বসু—আমি কোনদিনও আপত্তি করিনি। আমি তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছি, যত দিন খুশি বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পার। কিন্তু আমার ইচ্ছের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলবো, না। যেতে দিতে আমার ইচ্ছে করে না।

বাণী—কেন করে না?

প্রণব বসু—আমি একটি খাঁটি স্ত্রৈণ স্বামী, তাই করে না। বাস, এর ওপর আর কথা কিসের?

কিন্তু প্রণব বসুর মুখের অদ্ভুত গম্ভীরতা তখুনি চেঁচিয়ে হেসে ফেলে।—যাবে যাবে, আমি কথা দিচ্ছি। ডিসেম্বরের আগেই তোমাকে শান্তিপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।

সেদিনের সে-ঘটনার হাসির শব্দটাকে এখন হঠাৎ যেন মনের ভিতরে শুনতে পেয়েছে শুক্তি। তাই জিজ্ঞাসা করে—প্রণব কাকা কোথায়? কোন সাড় পাচ্ছি না কেন?

বারান্দা থেকে একজোড়া শক্ত জুতোর খটমট শব্দ বাজতে বাজতে ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ঘরে ঢুকেই মাথার টুপিটাকে তুলে নিয়ে আর তুলতুলের মাথায় পরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন প্রণব বসু।—শুক্তি, তুই তাহলে সত্যিই এসেছিস? তাহলে এইবার একবার জিজ্ঞেস কর তো বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যাটিকে, গত ডিসেম্বরে তাঁর শান্তিপুর যাওয়া কেন হলো না?

বাণী ডাকেন—শুক্তি, তুমি ওর আজেবাজে কথায় কান না দিয়ে এখন বরং···।

প্রণব বসু—আমি সব ব্যবস্থা করেছিলাম, শুক্তি; কিন্তু এই মহিলাই রাগ করে বললেন, আমাকে শান্তিপুরে পাঠাবার জন্যে তুমি হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন? এখন তুই বল···।

বাণী—তুমি এস শুক্তি। ওঘরে চল। দুজনে মিলে চা তৈরী করি আর গল্প করি।

শুক্তি—চলুন।

প্রণব বসু—আমারও একটা কথা আছে, শুনে যা। এসেছিস

যখন, তখন একদিন এগজিবিশন দেখে, আর একদিন মাছ ধরা দেখে তারপর কদমবাড়িতে যাবি।

শুক্তি—কৃষ্ণচূড়ার দোলনাটা কি নেই ?

চেঁচিয়ে ওঠেন প্রণব বসু—আছে বইকি। আয় আমার সঙ্গে, দেখবি আয়।

তখুনি টেবিলের উপর থেকে একটা টর্চ তুলে নিয়ে আর জানালার কাছে এগিয়ে যেয়ে বাইরের অন্ধকারের উপর আলো ফেলেন প্রণব বসু।—ওই দেখ আছে কিনা ? ঠিক কিনা ?

দেখে খুশি হয়ে হাসতে থাকে শুক্তি। হ্যাঁ ঠিক আছে। সেই কৃষ্ণচূড়া আর সেই দোলনা।

হলোই বা ছেচল্লিশ বছর বয়স, প্রণব কাকা আজও ঠিক সেই প্রণব কাকা ; এক বছরে একটুও বদলাননি। এই প্রণব কাকাকে তাই বেশ ভাল লাগে। এই লোখরাকেও তাই ভাল লাগে।

বাণী কাকিমা অবশ্যি খুবই শান্ত মানুষ ; রাগ করলেও জোরে কথা বলতে পারেন না। প্রণব কাকার হৈ-চৈ স্বভাবের শখগুলিকে একটুও পছন্দ করেন না। বাণী কাকিমাকে কিন্তু এইজন্যেই ভাল লাগে।

বছর দুই আগে, সেবারের পুজোর ছুটিতে যখন লোখরা এসেছিল শুক্তি, তখন এই ঘরে বসে কথায় কথায় শুক্তির কাছে অদ্ভুত একটা অভিযোগও করে ফেলেছিলেন বাণী কাকিমা।—বয়সের হুঁস নেই তোমার কাকার। বড় বেশি ছেলেমানুষী বাতিক। দোলনাতে বসে গল্পের বই পড়ে।

শুক্তি হেসে ফেলেছিল।—তাতে তোমার এত আপত্তি কেন ?

বাণী—আপত্তি করবো না কেন ? এতদিন কিছু ছিল না, ছিল না ; সে একরকম ভালই ছিলাম। এবার আমাকে কী লজ্জায় ফেলেছে, বল দেখি ?

শুক্তি আশ্চর্য হয়েছিল।—তোমার লজ্জা কিসের ? তুমি তো আর দোলনাতে দুলছো না।

বাণীও সেদিন একটু আশ্চর্য হয়ে আর চোখ বড় করে শুক্তির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। তারপরেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে আর হতাশ-উদাস স্বরে একটা আক্ষেপের কথা বলেছিলেন—আমারও মাথা খারাপ হয়েছে। কার কাছে কী কথা বলছি!

শুক্তি—কি হলো?

বাণী—তুমি ঠিক বলেছ। আমার আবার কিসের লজ্জা? যাই হোক, তুমি কিন্তু এখনও সেই দোলনা-দোলা মেয়েটি, একটুও বড় হওনি।

আজ আবার কাকিমা সেই দু'বছর আগের পুরনো কথার মত একটা কথা বলে হেসে উঠলেন।—এবার আমি আশা করেছিলাম, তুমি একটু বদলেছো। কিন্তু যা দেখছি, তাতে তো মনে হচ্ছে, এই এক বছরেও একটুও বড় হওনি।

শুক্তি—না, বড় হইনি। কিন্তু ওরকম হেঁয়ালি করে কথা বললে আমি এখনই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দোলনাতে বসবো আর দুলবো।

বাণী—না শুক্তি, লক্ষ্মী, তুমি এখন ওসব আরম্ভ করলে ভদ্রলোকও এখনি বিউগল বাজাতে শুরু করবে।

শুক্তি—কিন্তু কি বলছিলে, বল।

বাণী—বলবার মত এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। কিরণদিকে একটা চিঠি দিয়েছি। জানতে চেয়েছি, এখন তোমার বয়স ঠিক কত।

শুক্তি—বাইশ বছর হয়ে গিয়েছে।

বাণী—কিরণদিও তাই লিখেছেন। আমিও শান্তিপুরের চিঠির জবাবে সে-কথা জানিয়ে দিয়েছি।

কথা বলে না শুক্তি। শুধু কোলের তুলতুলের দু'হাতের থাবাথাবির নরম উৎপাতের কাছে একটা হাত অলসভাবে এলিয়ে রেখে দিয়ে জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে আনমনার মত তাকিয়ে থাকে। বাণী কাকিমা মুখ টিপে হাসেন।—দেখছি, সত্যিই বড় হয়েছো। ভাবতে শিখেছো তাহলে? আমি মিথ্যে সন্দেহ করেছিলাম।

শুক্তি—আমিও তো দেখছি, তুমি এই একবছরে কত বুড়ি হয়ে উঠেছো।

বাইরের ঘরে প্রণব কাকার নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়! শুক্তি বলে—এ কি? কাকা এখুনি ঘুমিয়ে পড়লেন?

বাণী—চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছেন। চায়ের গন্ধ নাকে গেলে জেগে উঠবেন।

শুক্তি—কিন্তু আগে তো কাকার এরকম অভ্যেস দেখিনি।

বাণী—সাধে কি অভ্যেস হয়েছে? শেষ রাতে উঠে বেরিয়ে যেতে হয়, ফিরে আসতে এক একদিন বিকেল হয়ে যায়। খুব খাটুনি পড়েছে। নতুন প্লেটুনগুলোর মর্টার ট্রেনিং শুরু হয়েছে।

শুক্তি—অনেক দূরে যেতে হয় বোধহয়?

বাণী—হয় বইকি। জীপ নিয়ে ছুটছেন, কখনও এ-জঙ্গলে কখনো সে-জঙ্গলে। আর, নদীর কাছে কোন এক্সারসাইজ থাকলে তো কথাই নেই; ফিরতে রাত হয়ে যায়।

ঘুমন্ত প্রণব কাকা বোধহয় চায়ের গন্ধ পেয়েছেন। তাই তাঁর ডাক শোনা যায়।—চা কি হলো?

শুক্তি হেসে ফেলে। কিন্তু বাণী কাকিমা হাসেন না। বরং বেশ একটু অপ্রসন্ন স্বরে কথা বলেন।—তুমি মনে করছো, শুধু কাজের জন্যেই বাড়ি ফিরতে রাত হয়? না। কাজ শেষ হবার পর মাছ ধরবার জন্যে নদীর জলে ছিপ ফেলে বসে থাকবে। একবারও ভেবেও দেখবে না যে, এদিকে একটা মানুষ একা পড়ে আছে।

চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেলেন বাণী কাকিমা।

লোথরার এই রাতটাকে দেখতে বেশ ভাল লাগছে। জানালার দিকে তাকাতেই চোখে পড়েছে শুক্তির, এইটুকু এককুচি চাঁদের আলোতেই আকাশের কালোমেঘ যেন সাদা ধবধবে গুঁড়োর মত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষ্ণচূড়ার মাথা দুলিয়ে দিয়ে হুহু করে ছুটছে লোথরার ময়দানের হাওয়া। কোলের তুলতুল ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই রাত যখন শেষ হয়ে আসে, তখন প্রণব কাকার বুটের খুটখাট শব্দ, কিংবা বাণী কাকিমার চা-তৈরীর ঠুং-ঠাং শব্দ শুক্তির ঘুম ভেঙ্গে দিতে পারে না ; এমনই নিবিড় ঘুম। কিন্তু ভোরের দিকের আরও নিবিড় ঘুম হঠাৎ একটা বিউগলের শব্দে ভেঙ্গে যায়।

ধড়ফড় করে বিছানা থেকে নেমে একেবারে খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় শুক্তি।

বাণী কাকিমা বলেন—এ কি ? তুমি ওরকম করে হঠাৎ জেগে উঠলে কেন ?

শুক্তি—এ কী রকমের বিউগলের শব্দ ?

বাণী কাকিমা হাসেন।—কী রকমের আবার ? রোজই তো এইরকম বিউগলের শব্দ করে আর মার্চ করে ওরা চলে যায়।

বাণী কাকিমা ঠিক কথাই বলেছেন। শুনতে পায় শুক্তি, ভোরের বাতাসকে তালে তালে শিউরে দিয়ে বুটের শব্দের কাতার চলে যাচ্ছে। পাশের বাংলোর ক্যাপ্টেন থাপার চাকর কয়লাচাপানো উনানটাতে আগুন ধরিয়ে রাস্তার উপর রেখে দিয়েছে। ধোঁয়া ছড়াচ্ছে উনানটা। তাই দেখতে পাওয়া গেল না, কারা মার্চ করে চলে গেল।

ভোরের বিউগল রোজই বাজে। মেজর বোসের বাড়ির ফটকের ঠিক সামনে এসেই বেজে ওঠে। একদিন বলেই ফেলে শুক্তি।—আমার কি-রকম মনে হয় জান, কাকিমা ? বিউগলের শব্দটা যেন ইচ্ছে করে আমাদের বাংলোর ঠিক গেটের কাছে এসে বেজে ওঠে।

বাণী কাকিমা বলেন—হতে পারে। ওরা হয়তো মনে করে, বিউগলের শব্দ শুনে খুশি হবেন মেজর সাহেব।

না, কেষ্টচূড়ার দোলনাতে চড়ে বাণী কাকিমাকে আতঙ্কিত করতে চেষ্টা করেনি শুক্তি, যদিও পাঁচটা দিন এই লোখরাতেই কেটে গেল। বিকেল হয়েছে যখন, তখন এক হাতে তুলতুলকে দোলনাতে বসিয়ে আর ধরে রেখে, আর-এক হাতে আস্তে আস্তে দুলিয়েছে।

সন্ধ্যে হয়। চায়ের টেবিলে বসে বাণী কাকিমার সঙ্গে কথা বলে

শুক্তি।—এবার আমাকে কদমবাড়ি ফিরে যেতে হয় কাকিমা, আর দেরি করা চলে না। বাগানে একটা খবর পাঠাবার⋯।

শুক্তির কথাটা না ফুরোতেই পাশের ঘর থেকে প্রণব কাকা বলে ওঠেন।—হ্যাঁ, শুক্তি, বি রেডি। এখনই বের হতে হবে।

বাণী কাকিমা আশ্চর্য হয়ে বলেন—কী বলছেন ভদ্রলোক ?

প্রণব কাকা—বলছি, শুক্তিকে এখন এগজিবিশন দেখাতে নিয়ে যাব।

বেশ সুন্দর আর বেশ অদ্ভুত এগজিবিশন। মস্ত বড় সামিয়ানার নীচে ময়দানের একপাশের একটা জায়গার উপর নানারকমের তৈরী-করা বিচিত্রতা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নদীর উপর পনটুন ব্রিজ, পুরো প্যাক কাঁধে নিয়ে নদী পার হচ্ছে সৈনিক। দুসমনের মেসিনগানের দিকে তাক করে গ্রেনেড ছুঁড়ছে একলা একজন ভয়ানক শক্ত চেহারার জমাদার। রিমাউন্টের টাট্টু ঘোড়ার তিনটে সত্যিকারের নতুন বাচ্চা শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দানা খাচ্ছে। স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ক্যাপ্টেন থাপার বাগানের টমেটো, যার সাইজ ক্রিকেট বলের চেয়েও বড়। আর ওদিকের ওগুলো বোধহয় নেফার পাহাড়।

মস্ত বড় একটা ত্রিপালকে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে নেফার পাহাড় তৈরী করা হয়েছে। কালো রঙের প্রলেপ দিয়ে পাহাড়ের পাথুরে গা, আর সবুজ রঙ দিয়ে জঙ্গল আঁকা হয়েছে। ঝর্ণা আর নদীগুলো সাদা। সড়কটা মেটে রঙের। আর পেঁজা তুলোর মোটা একটা লাইন আঠা দিয়ে সেঁটে বরফঢাকা সীমান্তের চেহারাও আঁকা হয়েছে। নীল আলোর খুব ছোট এক-একটা বাল্‌ব জ্বলছে সেই তুলোর বরফ-লাইনের এখানে আর ওখানে—তোয়াং, ঢোলা, বুমলা, থাগলা।

সত্যিই যে সুজিতবাবু দাঁড়িয়ে আছে এখানে। হেসে ওঠে শুক্তি। —আপনি এখানে কি করছেন ?

সুজিত বলে—এটা আমিই তৈরী করেছি।

শুক্তি—আপনি ?

সুজিত—হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন থাপা বলেছেন, আমার এই নেফার পাহাড়ই ফার্স্ট প্রাইজ পাবে।

শুক্তি—বেশ, খুব সুখবর শোনালেন। সত্যিই দেখতে খুব চমৎকার হয়েছে এই নেফা-পাহাড়।

লম্বা একটা স্টিক হাতে তুলে নিয়ে, আর স্টিকের ডগাটাকে বুমলার বরফের গায়ে ছুঁইয়ে দিয়ে সুজিত হাসতে থাকে।—আরও একটি সুখবর পেয়েছি। এই বুমলাতে আমাদের প্লেটুনের পোস্টিং হবে।

—তাই নাকি। খুব ভাল হলো। সত্যি খুব ভাল খবর। শুক্তির দুই চোখের তারার উপর নীল বাল্‌বের বুমলার আলোটাও যেন নীলাভ বিস্ময়ের আলো হয়ে হাসতে থাকে।

এতক্ষণ ওদিকে ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন থাপার সঙ্গে গল্প করছিলেন প্রণব কাকা। এইবার হাত তুলে ইসারায় শুক্তিকে ডাক দিলেন। চলে গেল শুক্তি।

আজ ছিল এগজিবিশনের শেষ দিন। কাজেই আর একটি দিন পরে ময়দানের সামিয়ানা অদৃশ্য হয়ে গেল। শুক্তি বলে—আর দেরি করবো না কাকা। এবার কদমবাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে দিন; কৈলাস গাড়ি নিয়ে এসে আমাকে নিয়ে যাক।

প্রণব কাকা—আজ নয়, কাল খবর পাঠাবো। আজ তুই বরং এখুনি তৈরী হয়ে নে। কুইক!

শুক্তি—কেন?

প্রণব কাকা—মাছ ধরবি, চল।

বাণী কাকিমা ভ্রুকুটি করেন—এ কি কথা।

প্রণব কাকা—তার মানে আমি মাছ ধরবো, শুক্তি শুধু বসে বসে দেখবে।

বাণী কাকিমা—তাতে শুক্তির লাভ কি?

প্রণব কাকা—শুক্তির লাভ, বসে বসে নদীর বিউটি দেখবে। নদী জিয়াভরলি, একেবারে জীবন্ত ভরলি।

শুক্তির আপত্তি নেই। তাই বাণীও আর আপত্তি করেন না। বরং রান্নাঘরে ঢুকে এক ঘণ্টার মধ্যে একগাদা লুচি ভেজে আর হালুয়া তৈরী করে হাঁপিয়ে উঠলেন। এক হাতে খাবারের বাস্কেট তুলে নিয়ে,

আর-এক হাতে শুক্তির একটা হাত ধরে প্রণব কাকাও জীপে উঠলেন।

গরগর করে শব্দ করছে জীপের ইঞ্জিন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর জীপের দিকে তাকিয়ে বাণী বলেন—আস্তে চালিও।

মেজর পি. বোস সেই মুহূর্তে তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালির সব জোর দিয়ে অ্যাক্সিলেটার চেপে দিলেন। বাঘের মত তিনটে লাফ দিয়েই মত্ত হয়ে ছুটে চললো জীপ।

—অনেকটা রাস্তা। তাড়াতাড়ি না গেলে তাড়াতাড়ি ফিরবো কি করে? তোর কাকিমার কমনসেন্স একটু কম, যদিও মানুষটা ভাল। মেজর বোসের গলার স্বরও যেন একটা ছুটন্ত আনন্দে গরগর করে হাসতে থাকে।

—ওই যে ছেলেটা, তোর চিঠি নিয়ে চাকরির জন্যে আমার কাছে এসেছিল···।

শুক্তি—সুজিত।

মেজর বোস—হ্যাঁ, সুজিত ছেলেটা আমার চেয়েও বড় ট্যালেন্ট।

শুক্তি—কি বললেন কাকা?

মেজর বোস—মাছ ধরতে সাংঘাতিক ওস্তাদ। সেদিন আমাকে কেমন সরল করে বুঝিয়ে দিল, টোপের ঝুল আর 'হাত বাড়িয়ে দিন; তা না হলে এরকম স্রোতের জলে বড় মাছ পা না। সত্যি, টোপের ঝুল বাড়িয়ে দিয়ে ছিপ ফেলতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইয়া বড় একটা সাতসেরী চিতল গেঁথে ফেললাম। তাই আমি···।

লোখরা ময়দানের সীমানা পার হয়ে জীপ এখন একটা আমবাগানের ছায়াঘেঁষা কাঁকরে রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। আমবাগানের ভিতরে অনেক তাঁবু।

মেজর বোস হঠাৎ ব্রেক দাবিয়ে জীপ থামালেন।—তাই আমি যখনই মাছ ধরতে যাই, তখন হাবিলদার সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে যাই। আগেই ওকে একটা খবর দিয়ে রাখি। থাপাকে বলে ওর একবেলার ছুটি করিয়েও নিই।···ওই যে এসে পড়েছে।

আমবাগানের তাঁবুর ভিড়ের ভিতর থেকে বের হয়ে, একটা ছিপ আর একটা থলি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে সুজিত।

ছিপ-ধরা হাতটা জীপের বাইরে রেখে পিছনের সীটের উপর উঠে বসে সুজিত। সামনের সীট থেকে শুক্তি মুখ ফিরিয়ে তাকায় আর হেসে ফেলে।—আপনি মাছ ধরতে ওস্তাদ?

সুজিত হাসে—সাহেব তাই বলেন।

মেজর বোস—পটাশালিতেই যাওয়া যাক, কি বল সুজিত?

সুজিত—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

কলকল করে জিয়াভরলির জলের স্রোত যেন পটাশালির যত শিলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার এক বিপুল কল্লোল তুলে ছুটে চলেছে। ভেসে চলেছে রঙীন হাঁসের সারি। কিনারা থেকে লতার ঝোপ ঝুঁকে ঝুঁকে জিয়াভরলির জলের দুরন্ত ফুর্তির বুকটাকে দেখছে। জলের ভিতর থেকে ছোট ছোট উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক হঠাৎ ছটফটিয়ে লাফিয়ে উঠেই আবার ডুবে যায়। রোদ লেগে হীরার কুচির মত ঝিকমিকিয়ে জ্বলে ওঠে উড়ুক্কু ছোট-মাছের গা।

সুজিত যেখানে বসতে বলেছে, ঠিক সেখানেই বসেছেন মেজর বোস। শক্ত করে ছিপ ধরে আর ফাতনার [illegible]লার দিকে তাকিয়ে ধ্যানীর মত বসে থাকেন। চার ঘণ্টার মধ্যে তিনটে ফলুই তুললেন, সাইজ আর ওজন মন্দ নয়।

শুক্তি যখন খাবারের বাস্কেট খোলে, তখন তিনটে খাবারের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসতে থাকেন মেজর বোস।—তোর কাকিমার বেশ কমনসেন্স আছে, তাই না, শুক্তি? তিনটে প্যাকেট করে দিয়েছে, তোর আর খাবার নাড়া-চাড়া করবার কোন ঝঞ্ঝাট ভুগতে হলো না। ওসব অভ্যেসও তোর বোধহয় নেই।

শুক্তি হাসে।---তাহলে বাড়ি গিয়ে বাণী কাকিমাকে একটা ধন্যবাদ জানাবেন।

এতক্ষণে প্রণব কাকার পাশে বসে আর জলের শব্দ শুনে শুনে শুক্তির চোখের পাতা তিনবার জড়িয়ে গিয়েছে; ঘুমের আবেশ

সামলাতে গিয়ে কয়েকবার হেলেপড়া মাথাটাকেও সামলাতে হয়েছে। প্রণব কাকা অবশ্য একবার বলেছেন, ঘুমোতে হলে না, জীপের সীটে বসে ঘুমোগে। কিন্তু কাকার কথার তো কেউ মানে হয় না ; জীপের কাছে একটা গাছের ছায়াতে যে চুপ করে বসে আছে সুজিত।

খাবারের একটা প্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে সেই গাছের ছায়ার দিকে তাকায় শুক্তি। সুজিতও এসে খাবারের প্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

শুক্তি বলে—আর কত দেরি করবেন, কাকা ?

প্রণব কাকা বলেন—মনে হচ্ছে, চুপ করে বসে থাকতে তোর আর ভাল লাগছে না, তাই না ?

শুক্তি হাসে—হ্যাঁ।

প্রণব কাকা—তবে কি করবি ?

শুক্তি—আমি বরং···

প্রণব কাকা—বেশ তো, একটু ঘুরে ফিরে দেখ।

ঘুরে ফিরে আর কি দেখবারই বা আছে ? দেখতে পায় শুক্তি, একটু দূরে সেগুনের ছায়ার কাছে সাদাটে চেহারার একটা পাথর স্রোতের জল ছুঁয়ে একটা আরামের বেদির মত পড়ে আছে।

এগিয়ে যেয়ে, সাদাটে পাথরের উপর বসে, আর উঁকি ঝুঁকি দিয়ে নীচের স্রোতের জলের ঘূর্ণিটাকে দেখতে থাকে শুক্তি।

—জলে পা ডোবাবেন না কিন্তু। ডাক দেয় সুজিত। শুনতে পায় শুক্তি।

মুখ ফিরিয়ে দেখতেও পায় শুক্তি, এগিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুজিত। এদিকের এই সাদাটে পাথরের দিকে তাকিয়ে আছে আর হাসছে।

শুক্তি বলে—ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন ? এখানে এসে দেখুন।

আরও কাছে এগিয়ে আসে সুজিত। সাদাটে পাথরটার উপরে উঠেই ব্যস্তভাবে বলে—আঃ, এখানে এই ঘূর্ণিটাকে এত দেখছেন কেন ? হঠাৎ মাথা ঘুরে যেতে পারে। বরং ওখানে তাকিয়ে দেখুন।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, স্রোতের এই ঘূর্ণিটার দিকে আর না তাকিয়ে, মাঝনদীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকে শুক্তি।

ওখানে মাঝনদীর রোদমাখানো জল, যেন গলা সোনার ঢল; এখানে ছায়া। সেগুনের পাতার আড়ালে বসে কতরকমের সুরে শিস দিচ্ছে পাখি। জলের গুঁড়ো ছিটকে এসে চোখে-মুখে লাগছে। জলের শব্দটাও অদ্ভুত; পাথরের কাছে এসে ছলছল করে, ছায়ার কাছে গিয়ে কলকল করে।

যেন হঠাৎ-বিহ্বল একটা খুশির গুঞ্জন। আপনমনের একলা ভাষার মত গুনগুন করে কথা বলে শুক্তি।—সত্যি চমৎকার। জিয়া-ভরলি সত্যি জিয়া ভরলি। প্রাণ ভরে গেল।

[এগার]

গৌহাটি থেকে যাত্রীতে ভরতি হয়ে আর অনেক মেঘ পার হয়ে প্লেন এখন কলকাতার কাছাকাছি আকাশে এসে পড়েছে। বোধহয় আর দশ মিনিটের মধ্যে দমদম পৌঁছে যাবে এই প্লেন, এই ডাকোটা, যার পাইলট হলেন সেই চেনা-মুখ ভদ্রলোক।

কিন্তু এ তো বড় অদ্ভুত অস্বস্তি। এই চেনা আকাশের আসা-যাওয়ার পথে কোনদিনও এরকমের অস্বস্তি বোধ করেনি শুক্তি। অস্বস্তিটা যেন একটা করুণ কৌতুক।

এ অস্বস্তিকে ভয় করবার কিছু নেই, লজ্জা করবারও কোন মানে হয় না। কিন্তু, কি আশ্চর্য, শুক্তি হেসে ফেললেও অস্বস্তিটা যেন লজ্জিত হয় না, সরেও যায় না; বরং বেশ করুণ-শান্ত একটা মুখ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, আকাশের পশ্চিমের একটা মেঘের দিকে চোখ তুলে তাকায়; তারপর সিগারেট ধরিয়ে কোন্ দিকে যেন চলে যায়।

কদমবাড়ি থেকে রওনা হবার দিন সত্যিই মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর একবার তেজপুরের একটা দিন; তারপর আর নয়। তারপর আর যা-কিছু দেখতে হলো আর শুনতে হলো,

তার সবই তো মন হাসিয়ে দেবার মত এক-একটা বিস্ময়ের আচমকা আলোর ঝিলিক। শুধু এই অস্বস্তিটা, যেটা গৌহাটি থেকে প্লেন ছাড়তেই শুক্তির মনের শান্তির একটা নতুন উৎপাত হয়ে উঠেছে, সেটা শুক্তিকে হাসিয়ে দিয়েও হঠাৎ এক-এক... একটু গম্ভীর করে দেয়।

কথা ছিল ড্রাইভার কৈলাস গাড়ি নিয়ে শুক্তিকে কদমবাড়ি থেকে তেজপুরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু কৈলাস নয়; শেষ পর্যন্ত উপেন মিস্তিরি এসে সাহেবকুঠির টুরারের স্টিয়ারিং-এ বসলো আর শুক্তিকে তেজপুরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

মঙ্গলদই থেকে চিঠি পেয়েছে কৈলাস, কৈলাসের স্ত্রী মারা গিয়েছে। কিন্তু কাঁদেনি কৈলাস, শুধু গ্যারেজের একটা পুরনো গাড়ির সীটের ছেঁড়া গদির উপর অনেকক্ষণ ধরে স্তব্ধ মড়ার শরীরের মত লুটিয়ে পড়ে রইল। তারপরেই উঠে এল কৈলাস; সাহেবকুঠির সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আর গগন বসুর মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে, ফরফর করে ওর লাইসেন্সটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিল।—মাপ করবেন হুজুর, আমি আর চাকরি করবো না।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করে কৈলাস, কিন্তু হাসতে পারে না। তবু বেশ শান্তস্বরে বলে—আপনার কাছ থেকে পাঁচ টাকা বকসিস নেবার আর দরকার হলো না, দিদি।

শুক্তি—তুমি এখন কোথায় যাবে? কি করবে?

এইবার হেসে ফেলে কৈলাস।—দেখি, কোথায় যাই। দেখি কি করতে পারি। ভিখারী যোগী কিংবা পরমহংস, কিছু একটা হতে হবে তো।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো কৈলাস। তারপর কৈলাসের চোখ দুটো যেন শক্ত হয়ে ইস্পাতের গুলির মত চিকচিক করে উঠলো।—শুনেছি সেই পুলিশ মহারাজ মঙ্গলদই থেকে বদলি হয়ে তেজপুরে এসেছেন। তরক্কি হয়েছে তাঁর, আওরভি উঁচা তক্ত পর বসেছেন। আচ্ছা চলি; নমস্তে হুজুর, নমস্তে দিদি।

বাবাকে একবার বলে দেখলে হতো, কৈলাসকে অন্তত ছ'মাসের মাইনের মত টাকা বকসিস করে দাও যাকগে, না বলে ভালই হয়েছে। সে-বকসিস নিতে কৈলাস রাজি হতো কিনা সন্দেহ। কৈলাসের তো মাথার ঠিক নেই।

না, ইনি চেনা-মুখ নন, এই এয়ার-হোসটেস। ইনি বোধহয় সাউথ ইণ্ডিয়ার মেয়ে। শান্তি কাপুর থাকলে আজও নিশ্চয় সেবারের মত নিজেই কাছে এসে আর গল্প করে চলে যেত। কিন্তু কে জানে, আবার হঠাৎ কি-কথা বলে ফেলতো আর মুখ টিপে হাসতো। শান্তির চোখের কোণে সব সময় যেন ভয়ানক একটা বুদ্ধির হাসি চিকমিক করে।

মালতীর চোখে কিন্তু আগের মত সেই দুষ্টু খুশির হাসি আর চিকচিক করে না। হাসে বটে মালতী, কিন্তু বড় বেশি শান্ত হাসি। জিজ্ঞাসা করেছিল শুক্তি, হাতির দাঁতের সেই চিরুনিটা আছে তো মালতী?

মালতী—আছে।

শুক্তি—মাঝে মাঝে মাথায় দাও তো?

মালতী—এই তো মাথাতেই রয়েছে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে, আবার হেসেও ফেলে মালতী।

মালতীর দাদা শিশিরবাবু একটা নতুন চাকরি নেবার খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাননি। মালতী বলে—সরকারী এগ্রিকালচারের চাকরি। একটা পরীক্ষাও হয়েছিল, ইণ্টারভিউও হয়েছিল। সব চেয়ে বেশি নম্বরও পেল দাদা। জানই তো, দাদা খুব ভাল বোটানি জানে।

শুক্তি—জানি।

মালতী—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না।

শুক্তি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পেল কে?

মালতী—পেয়েছে সুবীর শর্মা নামে কে একজন, কোন্ এক মিনিস্টারের সেক্রেটারীর ভাগ্নে, ইণ্টারমিডিয়েটও পাস করেনি। আজ আবার···।

শুক্তি—আজ আবার কি হলো ?

মালতী—বোধহয় রেলওয়ে কিংবা এল আই সি-র চাকরি, দরখাস্ত করবার ফরম আনতে সরকারী অফিসে গিয়েছিল দাদা, কিন্তু ভাগ্যে আর ফরম পাওয়া হলো না।

শুক্তি—কেন ?

হেসে ফেলে মালতী।—কেরানীবাবু বললেন, ফরম পেতে হলে অন্তত আমার সঙ্গে একটু ভদ্রতা করুন।

শুক্তি—তার মানে ?

মালতী—তার মানে অন্তত পাঁচটা টাকা দিন, পান খাওয়ার জন্যে।

শুক্তিও হেসে ফেলে।—কী রকম লোক রে বাবা !

মালতী—তারপর যা হবার তাই হয়েছে। দাদার যা স্বভাব, কেরানীবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বলেও কোন ফল হলো না। তিনি বললেন, বাড়ি যান মশাই, মাথা গরম করবেন না।

শুক্তি—শিশিরবাবু এখন বাড়িতে নেই বোধহয়।

মালতী—না ; বউদিকে নিয়ে ডাক্তার মুখার্জীর কাছে গিয়েছে।

শুক্তি—কি হয়েছে প্রমীলার ?

মালতী—হার্টের কষ্ট।

শুক্তি—সেরে যাবে নিশ্চয়।···আচ্ছা চলি···না, আজ আর চা খেতে ইচ্ছে করছে না, মালতী।

মালতীদের বাড়ির বাইরে এসে একবার, আর রবার বাগানের বাড়িতে ফিরে এসে একবার, খুব জোরে হাঁপ ছেড়েছিল শুক্তি।

সব শুনেও মেসোমশাই মহিমবাবু কিন্তু অদ্ভুত কথা বললেন আর হাসলেন।—হ্যাঁ, এসব একটু দুঃখের কথা বটে ; কিন্তু ঝগড়াঝাটি আর তর্কাতর্কিও কাজের কথা নয়। একটু সহ্য করতে হয়। তা ছাড়া, ভাগ্য নামে একটা ব্যাপার আছে ; সেটাও তো অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীর চওড়া বারান্দার মোজেয়িকের উপর আস্তে-আস্তে হাঁটছেন আর কথা বলছেন মহিম দস্তিদার। মাঝে মাঝে আলোর কাছে এসে থামছেন আর মুগার চাদরটাকে ভাল করে গায়ে জড়াচ্ছেন। দেখতে অদ্ভুত লাগে, মেসোমশাই মানুষটা নিজে এত আলোকিত বলেই বোধ-হয় বাইরের কোন অন্ধকার তাঁর চোখে পড়ে না। ভাল কথাই তো বললেন মেসোমশাই, কিন্তু কেমন-যেন হেঁয়ালির মত কথা। ঠিক বুঝতে পারা যায় না।

শুধু কি একা মহিম দস্তিদার? এই ভারতীর বাইরের ঘরে মহিম-বাবুর যে-সব বন্ধু আসেন আর গল্প করে চলে যান, যেমন শৈলেশ্বর শইকিয়া আর মহাদেব চৌধুরী, তাঁরাও সবাই ঠিক ওই রকম হেঁয়ালির মত কথা বলেন, আর দুঃখিতভাবে হাসেন। শৈলেশ্বর শইকিয়ার অনেক বাড়ি আছে এই তেজপুরে; তাছাড়া গৌহাটিতে আর শিলং-এ। ইনকম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী তিন ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন; দুই জামাইকে দুটি বাড়ি উপহার দিয়েছেন। তাছাড়া যখন-তখন, প্রায় প্রতি মাসে সোনা কেনাও তাঁর একটা অভ্যাস।

কিন্তু মণিমাসি হঠাৎ খুশি হয়ে যে-কথা বলে উঠলেন, তার মধ্যে কোন হেঁয়ালির ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। ভাবতে পারেনি শুক্তি, মণিমাসির মত মানুষ, যিনি সোম লজ থেকে শুক্তির ফিরতে একটু দেরি হলে দশবার দশরকমের কথা জিজ্ঞেস করেন, তিনি নিজেই এরকম একটা কথা বলে ফেলবেন।

সেই সোম লজ। ভিতরের ঘরে অঞ্জলির সঙ্গে গল্প করছেন মণিমাসি। আর, সোনালী রঙের গ্রীল দিয়ে ঘেরা বারান্দার ঠিক সেখানে সেই চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে অনিমেষ।

ব্রহ্মপুত্রের জলের কোন ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু শুক্তির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনিমেষের গলার স্বরে যেন ঢেউ জেগেছে, যদিও গল্পের কথাগুলি নতুনরকমের কোন কথা নয়। তেজপুর এয়ারপোর্ট থেকে সামান্য একটু দূরে একটা বিল আছে; নাম, শোলমারা বিল।

—নাম শুনে ঘাবড়ে যাবেন না। লোকে বলে, আকাশে যদি পূর্ণিমা চাঁদ থাকে, আর বিলের জলে তখন যদি একটা সাদা হাঁস উড়ে এসে নামে, তবে তখুনি দেখা যাবে যে, বিলের জলের উপর নীলপদ্ম ফুটে রয়েছে। কাল তো পূর্ণিমা, চলুন না, একবার দেখেই আসি, সত্যি নীলপদ্ম ফোটে কিনা।

অনিমেষের এই উতলা অনুরোধের একটা জবাব দিতে হবে। কিন্তু কী জবাব দিতে পারে শুক্তি? নীরব শুক্তির নিঃশ্বাসের বাতাসের সঙ্গে যেন হাঁসফাঁস করছে শুক্তির প্রাণের সব সাহস।

কিন্তু কি আশ্চর্য, মণিমাসি নিজেই হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে কত সহজে বলে দিলেন—বেশ তো, যাও না দু'জনে, একবার জায়গাটা বেড়িয়ে দেখে এস।

অনিমেষ হাসে।—উনি যদি আপত্তি না করেন তবেই তো যাওয়া সম্ভব।

মণিমাসি—না না, আপত্তি করবার কি আছে? আপত্তি করবে কেন শুক্তি?

শুক্তিও এইবার হাসতে চেষ্টা করে।—আমি আপত্তি করছি না। কিন্তু···।

মণিমাসি—কিসের কিন্তু?

শুক্তি—কলকাতা থেকে ফিরে আসি, তারপর না হয় যে-কোন দিন···।

মণিমাসি—বেশ তো; তাই না হয় হবে, আপত্তি না থাকলেই হলো।

সেদিনের পর আর যে-দুটো দিন তেজপুরে থাকতে হয়েছিল, তার মধ্যে আর একবারও সোম লজে যাওয়া হয়নি শুক্তির, যদিও অনেকবার মনে পড়েছে, সন্ধ্যাবেলার সোম লজের বারান্দায় একটা চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন অনিমেষবাবু। আপত্তি নেই, শুধু এই একটা কথার মধ্যে কে-জানে-কিসের সান্ত্বনা পেয়ে গেলেন অনিমেষবাবু, যে জন্যে শুক্তির মুখের দিকে ওরকম অদ্ভুত শান্ত একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইলেন।

নতুন পাড়ার মীরা কাকিমাও যে অদ্ভুত একটা গল্প বলে হাসিয়ে দিলেন। কল্পনা করতে পারেনি শুক্তি, মীরা কাকিমার কাছে গেলে হঠাৎ এরকম একটা গল্প শুনতে হবে। গল্প বটে, কিন্তু সেটা মীরা কাকিমার নিজেরই একটা চিন্তার কীর্তি।

শীতল বিশ্বাস গরীব মানুষ, মীরাও গরীবের ঘরের মেয়ে। কিন্তু মীরার মামার বাড়ি খুবই বড় ধরনের বড়লোকের বাড়ি। সে-কথা তো জানাই ছিল শুক্তির; মণিমাসিও শুক্তির কাছে শীতলের বউ মীরার মামার অগাধ সম্পত্তির কাহিনী অনেকবার বলেছেন। আমেরিকা থেকে জাহাজে বোম্বাই হয়ে মীরার মামার আমদানির মেশিন আসে। কারবারের হেড অফিস বোম্বাই, সে-অফিস দেখাশোনা করে মীরার মামার বড় ছেলে রাজীব। মীরার মামা-মামী থাকেন নাসিকে, গোদাবরীর কাছে শখের দুর্গের মত মস্ত বড় এক বাড়ি। সে-বাড়ির বাগানের ভিতরে টেনিস খেলবার তিনটে কোর্ট আছে।

দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত এই রাজীবের গল্প বলে বলে শুক্তির মনের যত সন্দেহ বিস্ময় আর কৌতুকের প্রাণ ক্লান্ত করে দিলেন মীরা। রাজীব সত্যিই রাজীব, দেখতে খুব ভাল। স্বভাবে বা কথায় এক ফোঁটাও অহংকার নেই। রাজীব একদিন ওর অফিসের কেরানী সদাশিব নাইডুর বুড়ি মাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল।

হেসে ফেলে শুক্তি।—আমাকে হঠাৎ একটা ট্রেজার আইল্যাণ্ডের গল্প শুনিয়ে তোমার লাভ কি মীরা কাকিমা?

মীরা—আমার লাভ এই যে, তোমার লাভ হতে পারে।

শুক্তি—বাস, আর নয়, এইবার এখানে তোমার গল্প থামিয়ে অন্য কথা বল।

মীরা—আমি কিন্তু নাসিকে মামীর কাছে চিঠি লিখে দিয়েছি!

শুক্তি—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

মীরা—রাগ করলে নাকি?

শুক্তি হেসে ফেলে।—এত মজার একটা গল্প শুনে কি কেউ রাগ করে?

মীরা—যাক, তা হলেই হলো।

হঠাৎ শুক্তির চোখ দুটো একটু চমকে ওঠে, আর বড়-বড় হয়ে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকায়।—দেয়ালের গায়ে ওটা কী বস্তু ঝুলিয়ে রেখেছো, মীরা কাকিমা ?

একটা সামান্য বস্তু। ছোট-ছোট রঙীন পাথর-নুড়ির একটা মালা। ছোট মেয়ের খেলবার জিনিস নয়, মীরার মত বয়সের বাঙালী নারীর গলায় পরবার জিনিসও নয়।

মুখে হাত রেখে হাসি চাপতে চেষ্টা করেন মীরা।—বলতে পারি, কিন্তু বলা উচিত নয়; মণিদি বলে রেখেছেন, শুক্তির কাছে কখনও এ-গল্প বলবে না।

শুক্তি—তাহলে বলো না।

মীরা—তাহলে বলেই ফেলি। ওটা হলো দফলা-মেয়ে সেই রেনকির রাগের মালা।

শুক্তি—তার মানে ?

মীরা—তার মানে অনুরাগের মালা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, রেনকি একদিন এই মালাটাকে ওর ঝোলার ভেতর থেকে বের করে রতন টাকুরপোর হাতের কাছে···।

শুক্তি—থাক, এবার তুমি চুপ কর।

কিন্তু মীরা কি চুপ করে থাকবার মত মানুষ? তাড়াতাড়ি করে একটা রেকাবী ভর্তি করে একগাদা জিলিপী নিয়ে এসে শুক্তির হাতের কাছে এগিয়ে দিলেন।—খাও আর শোন। এমন কিছু বাজে কথা নয় যে শুনতে তোমার খারাপ লাগবে।

রেনকি সেদিন রাগ করে চলে যাবার পরেই দেখতে পেয়েছিলেন মীরা, ঘরের কোণে একটা বাক্সের পিছনে ওই মালাটা পড়ে আছে। রেনকি নয়; রতনই মালাটাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল। মীরার কাছে একদিন একেবারে স্পষ্ট করে বলে ফেলেছিল রেনকি, আমি তোমাদের রতনের কাছে বউ হয়ে থাকবো।

মীরা জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু রতন কি বলে ?

রেনকি—রতন বলে, তা হয় না।

মীরা—তবে কি করে হবে?

রেনকি—তবে আমার মুখে রঙ দিয়েছিল কেন রতন?

মীরা—দিয়েছিল নাকি?

রেনকি—নিশ্চয়, রতনকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

মীরা—তোমার মুখে কেন রঙ দিল রতন?

রেনকি—আমি বলেছিলাম।

মীরা—কেন বলেছিলে?

রেনকি—রতন বলেছিল, যাকে ভাল লাগে তাঁর মুখে রঙ মাখিয়ে দিয়ে পরব করে ওর দেশের লোক।

মীরা—কিন্তু তোমাদের বিয়ে কি করে হবে রেনকি? সরকারী মানা আছে যে?

আর কোন কথা বলেনি রেনকি। শুধু ঘরের আয়নাটার দিকে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

মীরা বলে—সত্যি শুক্তি, রেনকি যেন আয়নাতে ওর মাথার ওই নতুন খোঁপা, গায়ের জরি-হাতা ব্লাউজ, আর রঙীন তাঁতের শাড়িপরা চেহারাটারই ওপর রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখতে আমারও বেশ একটু কষ্ট হয়েছিল শুক্তি।

শুক্তি—রতন কাকা নেফা থেকে আর এখানে আসেননি?

মীরা—না।

শুক্তি—আসবেন নিশ্চয়। ছুটি পেলেই আসবেন।

মীরা—তাই যেন হয়।

বেচারা দফলা-মেয়ে, বোকা রেনকি! বেচারা রতন কাকা, নেফা মেডিক্যালের পিয়ন। কিন্তু সরকারী আইনের নিষেধটাকে বেচারা বলতে একটুও ইচ্ছে করে না। মীরা কাকিমার কাছ থেকে এ গল্পটা না শুনলেই ভাল ছিল। হাতে ধরা গল্পের বইটার পাতার উপর শুক্তির চোখ পড়ে থাকলেও হঠাৎ এক-একবার চোখের সামনে যেন রেনকির পাথুরে মালাটা দুলে ওঠে। তাই বইটাকে এখন বন্ধ করে রেখে দিতে ইচ্ছে করে।

গৌহাটি এয়ারপোর্টের মাথার উপর এসে ... কাত হয়ে প্লেন নামতে শুরু করেছে। খোলা বইটা বন্ধ করে হাতব্যাগের ভিতরে ভরে দেয় শুক্তি।

তারপর আর নেফার দফলা-মেয়ে রেনকির কথা নয়, কদমবাড়ির গগন বসুর মেয়ে শুক্তি বসুরই একটা অদ্ভুত হঠাৎ-বিস্ময়ের অস্বস্তিকে এতক্ষণ ধরে হাসিমুখে সহ্য করতে চেষ্টা করেছে শুক্তি। মনে হয়, এই প্লেন থেকে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত এই অস্বস্তি দূর হবে না। দমদম পৌঁছতে কি দশ মিনিটের আরও বেশি সময় লাগবে?

গৌহাটিতে নেমে বিরামের পঁচিশ মিনিট সময় অনায়াসে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের কোচের উপর বসে আর গল্পের বই পড়ে কাটিয়ে দিতে পারা যাবে, এই তো আশা করেছিল শুক্তি। কিন্তু সে-আশা যেন একটা আচমকা আঘাতে গল্পের সামনে পড়ে মিথ্যে হয়ে গেল।

পাইলট ভদ্রলোক হঠাৎ কোথা থেকে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন।—আমি আপনাকে চিনি। কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন না; পরিচয় দিলেও চিনতে পারবেন বলে মনে হয় না।

চমকে ওঠে শুক্তি।—আমি তো সত্যিই আপনাকে চিনি না। শুধু আগে দু'একবার দেখেছি। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে?

—এখানে অনেকেই তো আপনাকে চেনে। জিজ্ঞেসা করলে ক্যান্টিনের ম্যানেজারও বলে দিতে পারবেন যে, আপনি প্ল্যান্টার বোস সাহেবের মেয়ে। কাজেই আপনার পরিচয় জেনে নিতে আমার বেশি খোঁজ করতে হয়নি।

শুক্তি—প্লেন ছাড়তে আর কত দেরি?

—দেরি আছে। অন্তত আরও বিশ মিনিট না পার হলে প্লেন ছাড়বে না। আপনার বাণী কাকিমা কিন্তু আমাকে চেনেন। আমাদের বাড়ি শান্তিপুর। আমার নাম পরিতোষ মৌলিক।

শুক্তি—আমি শান্তিপুর কখনো দেখিনি।

পরিতোষ—দেখলে আপনার খুব খারাপ লাগবে না মনে হয়।

আপনার বাণী কাকিমার বাবা হলেন আমাদের পাশের বাড়ির প্রতাপবাবু; আত্মীয় না হয়েও তিনি আমাদের প্রায় আপন-জন। ছেলেবেলায় প্রতাপ কাকাকে খুব ভয় করতাম; উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে যখন বুঝতাম যে প্রতাপকাকা বাড়ি নেই, তখন ডাণ্ডা-গুলি হাতে নিয়ে খেলতে বের হতাম।

শুধু হাতঘড়ির উপর দু'চোখের দৃষ্টিটাকে বসিয়ে রেখে, আর নিজেকে একেবারে নীরব করে নিয়ে বসে থাকে শুক্তি।

পরিতোষ—আপনি বোধহয় একটু আশ্চর্য হয়েছেন, আর বেশ বিরক্ত বোধ করছেন। সবই বুঝেছি; তবু সাহস করে আপনাকে আর-একটু আশ্চর্য করে দিতে চাইছি।

শুক্তি—কি বললেন?

পকেট থেকে একটা ফটো বের করে পরিতোষ।—এটা নিশ্চয় আপনার ফটো?

চমকে ওঠে শুক্তি—এ কি!

পরিতোষ হাসে।—চুরি করিনি।

শুক্তি—একথা কেন বলছেন? আমি কি তাই মনে করেছি?

পরিতোষ—তবে কি মনে করলেন?

শুক্তি—ভাবছি, আপনার কাছে আমার ফটো কেমন করে এল?

পরিতোষ—মনে নেই কি আপনার? অনেকদিন আগে একবার আপনার ব্যাগ থেকে···।

শুক্তি—হ্যাঁ, কয়েকটা ফটো পড়ে গিয়েছিল আর আপনি কুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পরিতোষ—তবু বলছি, সন্দেহ করবেন না। তখুনি চুরি করে আপনার এই ফটোটাকে লুকিয়ে রাখিনি। আপনি প্লেন থেকে নেমে যাবার অনেক পরে, হঠাৎ আমার চোখে পড়েছিল, এই ফটোটা সীটের নীচে পড়ে আছে। হ্যাঁ, বলতে পারেন, আপনার ঠিকানায় ফটোটা ফেরত পাঠিয়ে না দেওয়া অন্যায় হয়েছে।

কোন কথা না বলে আবার চোখ নামিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায়

শুক্তি। পরিতোষ বলে—এই নিন আপনার সেই ফটো; আর, কিছু মনে করবেন না যেন।

ফটোটাকে শুক্তির হাতব্যাগের উপর রেখে দিয়ে সরে যায় পরিতোষ। এইবার ব্যস্তভাবে নিজেরই হাতঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর এগিয়ে যেয়ে লাউঞ্জের বাইরের বারান্দা... তানে গোলাপের কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের একটা মেঘের দিকে তাকায়। তারপর সিগারেট ধরায়। তারপর অন্যদিকে চলে যায়।

বুঝতে পারে না শুক্তি, ফটোটাকে হাতব্যাগের ভিতরে ভরতে গিয়ে হাতটা কেঁপে উঠলো কেন? পরিতোষবাবুকে কি একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল? কিংবা, বলে দেওয়াই উচিত ছিল, ও ফটো আর ফেরত দেবারই বা কি দরকার? দেড় বছর ধরে যে-ফটো একজন অচেনা মানুষের কাছে ছিল, সে ফটো শুক্তি বসুর নিজের ফটো হলেও হাত দিয়ে স্পর্শ করতে সত্যিই যে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে হয়।

ভদ্রলোককে কিন্তু মুখর-স্বভাবের মানুষ বলে ... হলো না। তবে চক্ষুলজ্জা নিশ্চয় একটু কম। অজানা অচেনা মেয়ের ... দেড় বছর ধরে নিজের কাছে পুষে রেখেছেন, এই কথাটাকেই তো খুব ভদ্রভাবে বলে চলে গেলেন। কিছু মনে করবেন না, একথা ব...ারও কোন মানে হয় না।

বাম্প্ করেনি প্লেন, কিন্তু শুক্তি বসুর এই অস্বস্তি...ন যেন হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে ওঠে। বুকের ভিতরে একটা ভীরু নিঃশ্বাসের বাতাস ভয়ানক একটা সন্দেহ হয়ে দুলতে থাকে। লোখরা থেকে বাণী কাকিমার শান্তিপুরে লেখা চিঠিটার মানে কি এই পাইলট ভদ্রলোক, এই পরিতোষ মৌলিক?

আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে না, ভালও লাগে না। এই অস্বস্তি এখানেই মরে যাক। চেনা আকাশের পথে এ কী বিশ্রী দুর্ঘটনার মত একটা অচেনা মেঘের উপদ্রব!

যাক, এইবার নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। নামতে শুরু করেছে প্লেন।

প্লেন থেকে নেমে দমদমের মাটিতে পা দিয়েই একেবারে ফুল্ল হয়ে হেসে ওঠে শুক্তির এতক্ষণের অস্বস্তির মন। ওই তো, দাঁড়িয়ে আছে ওরা; ড্রাইভার কেষ্টবাবু, কৃষ্ণা আর সুকু।

[বার]

কলকাতা থেকে যাবার সময় যে-মেয়ের ব্যস্ততাকে পালিয়ে যাবার ছটফটানি বলে মনে হয়, সে-মেয়ে বোধহয় কলকাতায় ফিরে আসবার জন্যেও ছটফট করে উঠেছিল। তা না হলে ঘরে ঢুকে এরই মধ্যে শেলফের সব বই পরিপাটি করে সাজিয়ে ফেলবে কেন শুক্তি? কত ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে শুক্তি। আলনার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে।

ঘরে ঢুকেই বড় পিসি সুমিত্রা যেন একটা হাসি চাপতে চেষ্টা করে কথা বলেন—কি দেখছো তুমি?

আলনাতে একটা কল্কা পাড়ের টাঙাইল। শাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে শুক্তি বলে—শাড়িটাকে এরকম এলোমেলো করে ভাঁজ করলে কে?

সুমিত্রা হাসেন।—কৃষ্ণা।

শুক্তি—কৃষ্ণা কেন?

ঘরে ঢোকে কৃষ্ণা।—শাড়িটাকে কোথায় রেখে গিয়েছিলে, মনে পড়ে?

হেসে ফেলে শুক্তি।—মনে পড়েছে। তাড়াতাড়িতে ভুল করে বিছানার উপর ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলাম।

কৃষ্ণা—সেই জন্যে আমি···।

সুমিত্রা হাসেন।—সেই জন্যে কৃষ্ণা রাগ করে শাড়িটাকে আলনাতে তুলে রেখেছে, লণ্ড্রিতে দিতে দেয়নি।

শুক্তি—কেন?

কৃষ্ণা—প্রমাণ করে দিলাম কিনা, তুমি সব ভুলে যাও।

কৃষ্ণার গাল টিপে ধরে শুক্তি।—কী ভুলে ?

কৃষ্ণা—তুমি কলকাতার বাইরে গেলে একটা চিঠি দিতেও ভুলে যাও কেন।

শুক্তি—চিঠি দিতে ভুলে যাই ঠিকই, কিন্তু তোমাকে তো ভুলে যাই না।

কৃষ্ণা—শ্যামলদাও বলছিলেন, তোমার শুক্তিদি কি কলকাতাকে ভুলেই গেল ? কলেজের পুজোর ছুটি তো তিন দিন হলো শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু আসে না কেন ?

সুমিত্রা তবু দাঁড়িয়ে আছেন। সরে যাবেন বলেও মনে হয় না। কৃষ্ণাকে এখন কি-কথা বলে ওর মুখ বন্ধ করা যায়, তাও ভেবে পায় না শুক্তি।

কৃষ্ণার একটা অভিমানের মুখরতা বটে ; কিন্তু শুক্তির চোখ-মুখের অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন একটা কঠোর জিজ্ঞাসার ডাক শুনতে পেয়েছে শুক্তি।

কৃষ্ণা বলে—আমি সত্যি খুব রাগ করেছি, শুক্তিদি।

হাসতে চেষ্টা করে শুক্তি।—রাগ করো না কৃষ্ণা। দিদির ওপর কখখনো রাগ করতে নেই।

কৃষ্ণা—আমাদের ভুলে যাও কেন ?

শুক্তি—ভুলিনি কৃষ্ণা ; আমি কাউকেও ভুলিনি।

সুমিত্রা হাসেন।—চুপ কর কৃষ্ণা, শুক্তিকে আর বেশি বিরক্ত করিস না।

চলে গেলেন সুমিত্রা।

বাড়ি থেকে কলেজ, আর কলেজ থেকে বাড়ি ; এই চেনা পথের জীবনে নতুন করে দেখে আশ্চর্য হবার মত কোন ঘটনা নেই, কোন দৃশ্যও নেই। হাজরার মোড়ে সেই খোঁড়া ভিখারীটা এখনও হরেকৃষ্ণ বলে চেঁচিয়ে ওঠে আর হাত পেতে ভিক্ষে চায়। আর চেতলার পুল পার হবার সময় দেখা যায়, সেই ভাঙ্গা নৌকাটা নালার কাদার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

শুক্তির সুন্দর মুখটা কি আরও সুন্দর হয়ে গিয়েছে? তা না হলে শুক্তির বড় পিসি কেন বার বার শুক্তির মুখের দিকে ওরকম করে তাকিয়ে থাকেন? যখন তখন শুক্তির কাছে এসে দাঁড়াবেন, শুক্তির পিঠে হাত বোলাবেন। সুমিত্রার এ এক নতুন অভ্যেস হয়ে উঠেছে! দিন দিন আদর বাড়িয়ে চলেছেন সুমিত্রা। শুক্তি তাই না হেসে আর না বলে থাকতে পারে না।—তুমি এসব কী আরম্ভ করলে বড় পিসি? দেখতে পেলে কৃষ্ণা যে হিংসেতে ছটফট করবে।

সুমিত্রাও হাসেন।—ছাই করবে কৃষ্ণা। ও মেয়েকে আমি চিনে নিয়েছি। আমাকে ওর একটু কাছ ঘেঁষে বসতেও দেয় না। ঠেলে সরিয়ে দেয়। ওর নাকি ভয়ানক গরম লাগে।

শুক্তি—আজ বুঝছে না, কিন্তু পরে একদিন বুঝবে, কী ভুল করছে বোকাটা।

আজকাল শুক্তির মুখের এক-একটা কথা শুনে সুমিত্রার মায়াকাতর মন যে কত গভীর তৃপ্তিতে ভরে যায়, সেটা তিনি বুঝতে পারেন বটে; কিন্তু চোখে তো দেখতে পান না যে, তাঁর মুখের হাসিটাও কত নিবিড় হয়ে থমথম করে। সে-ছবি দেখতে পায় শুক্তি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না, বড়পিসির মন এত বেশি খুশি কেন?

শ্যামল আসে মাঝে মাঝে, যদিও শ্যামলের কাজে ব্যস্ততার অন্ত নেই। পশারের নাম-ডাক যেমন বেড়ে চলেছে, পেশার হাঁকডাকও তেমনি বাড়ছে! তবু তো, এই অফুরান দায়িত্বের ছুটোছুটির মধ্যেও একটু সময় করে নিয়ে এক-একবার, মাসে অন্তত ছুটো-তিনটে দিন আলিপুরের এই বাড়ির চা খেয়ে যেতে ভুলে যায় না শ্যামল।

শ্যামলকে দেখে শুক্তিও আর সারামুখের চেহারা লালচে করে, চোখ নামিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে না। বসুন আপনি, কৃষ্ণাকে ডেকে দিচ্ছি; বেশ তো স্পষ্ট করে ভদ্রতার ভাষণ শুনিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারে শুক্তি। কথা বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলে ভীরু নিঃশ্বাসের বাতাস গিলতে হয় না। সবই দেখতে পান সুমিত্রা।

কত সহজে সেদিন ভবানীপুরে যেতে রাজি হয়ে গেল শুক্তি, যেদিন

সুমিত্রা বললেন—সুধাদি আমাদের সবাইকে ডেকেছেন, তুমিও যাবে নাকি শুক্তি ?

কেন কিসের জন্য ভবানীপুরের বাড়ি থেকে এই আহ্বান এসেছে, তার কিছুই জানে না শুক্তি। সুমিত্রা অবশ্য বলতেই যাচ্ছিলেন যে, সুধাদি কীর্তনগান শুনতে খুব ভালবাসেন, তাই ব্যবস্থা করেছেন, সুধাদির চেনা এক সুগায়িকা মহিলা আজ তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে কীর্তন গাইবেন।

কিন্তু শুক্তির যাবার ইচ্ছাটা যেন তৈরী হয়েই ছিল। কিছুই জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইল না শুক্তি, কেন আর কিসের জন্য ভবানীপুরের বাড়ি থেকে আজ হঠাৎ একটা আমন্ত্রণ উপস্থিত হলো। সুমিত্রা শুধু একটু প্রশ্ন করে কথাটাকে বলেছেন, আর, শুক্তিও সেই মুহূর্তে রাজি হয়ে জবাব দিয়ে দিল—যাব।

ভবানীপুরের বাড়ির বড়ঘরে সেই সন্ধ্যাবেলায় অনেক মানুষের আসরটিকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিয়ে সুগায়িকা মহিলা যখন চলে গেলেন, তখন ঘরভরা এলোমেলো কলরবের মধ্যেই শুনতে পেলেন আর দেখতে পেলেন সুমিত্রা, দরজার কাছে শ্যামলের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, কত খুশি হয়ে আর হেসে-হেসে কথা বলছে শুক্তি।

শ্যামল হাসছে আর বলছে—আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না।

শুক্তি—বিশ্বাস করুন, আমি আপত্তি করিনি।

শ্যামল—আপত্তি না কর; কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় তো আসনি। কাকিমা বলেছেন, তাই এসেছো।

শুক্তি—এর মানে কি অনিচ্ছার আসা ?

শ্যামল—হ্যাঁ।

শুক্তি—তাহলে আমি আর কি করতে পারি ?

শ্যামল—একদিন কি নিজেই ইচ্ছে করে আসতে পার না ?

শুক্তি—কি জবাব দেব, বুঝতে পারছি না।

শ্যামল—আসতে ইচ্ছে করে ?

শুক্তি—হ্যাঁ।

রাত ফুরোতে দেরি আছে মনে করে মানুষের চোখ আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে যদি দেখতে পায় যে, লাল সূর্য হাসছে, তবে সে মানুষের চোখের বিস্ময়ও আচমকা রঙীন হয়ে যায়। সুমিত্রার চোখের ও মনের অবস্থাও প্রায় তাই। মনে করেছিলেন, নিজের মুখে শ্যামলের কাছে যা বলবার তা বলতে বেশ দেরি করে ফেলবে শুক্তি, বড় বেশি লাজুক ভীরু আর মনচাপা স্বভাবের এই মেয়ে। কিন্তু কই, দেরি তো করলো না শুক্তি। মিথ্যে লজ্জা করলো না, ভয়ও পেল না, বেশ মন খুলে ইচ্ছের কথাটা বলে দিল।

দিল্লীতে করুণার কাছে চিঠি লিখলেন সুমিত্রা। সাতদিনের মধ্যে করুণার জবাবের চিঠি পৌঁছে গেল।—আপনি এর চেয়ে আর বেশি কিছু জানতে চাইছেনই বা কেন? এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর কি-ই বা বলতে পারে শুক্তি? আপনি এখন অনায়াসে কদমবাড়িতে চিঠি দিতে পারেন যে, শুক্তি নিজেই বলেছে।

জয়ন্ত সরকার সব কথা শুনে খুশি হয়েও শেষে আক্ষেপ করেন। —আমার কিন্তু একটা দুঃখ রয়ে গেল।

সুমিত্রা—কিসের দুঃখ?

জয়ন্ত সরকার—মেয়েটাকে বছরের পর বছর ধরে আমরা কাছে রাখলাম, এইবার বিয়েও দেব, সবই ভাল। কিন্তু মেয়েটার লেখা-পড়া আর এগুলো না।

চুপ করে কি-যেন ভাবতে থাকেন সুমিত্রা। তাঁরও মনে বোধহয় ছোট্ট একটা ব্যথার কাঁটা বিঁধছে।

জয়ন্ত সরকার মৃদুভাবে হাসেন।—আমি তো যখন তখন তেজপুরের চিঠি পাব বলে ভয় পাচ্ছি। শুক্তির মাসি নিশ্চয় বলবেন, আর বললেও অন্যায় বলা হবে না যে, শুক্তিকে আমরা ভাল করে লেখা-পড়া না শিখিয়ে শুধু তাড়াহুড়ো করে একটা বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

সুমিত্রা—আমি বলি, শুক্তি এই বছরেই ফাইনালটা দিয়ে দিক, তারপর কিরণ বউদিকে চিঠি দেব।

জয়ন্ত সরকার—আমিও সেই কথা তোমাকে বলতে চাইছি। বরং, এখন তোমার চেষ্টা করা উচিত, মেয়েটা যাতে ভাল করে পড়াশোনা করে, আর ভাল করে পাসও করতে পারে।

সুমিত্রা—ঠিকই বলেছ ; তাহলে সব দিক দিয়ে [illegible] বিষয় হবে। কারও অভিযোগ করে কিছু বলবার থাকবে না।

কদমবাড়িতে চিঠি লিখতে দেরি করলেন না সুমিত্রা। —আপনাদের একটু সহ্য করতে হবে, বউদি। ফাইনাল না দেওয়া পর্যন্ত শুক্তিকে আর কদমবাড়ি যেতে দিতে চাই না। গগনদাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, পরীক্ষার পর শুক্তিকে আর একটি দিনও এখানে দেরি না করিয়ে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। নবেম্বর তো শেষ হতে চললো, আর মাত্র পাঁচ মাস পরে শুক্তি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। মাঝে বড়দিনের ছুটিতে আর নাই বা গেল।

কদমবাড়ি থেকে কিরণলেখাও জবাব দিতে দেরি করেন না।—শুনে খুশি হয়েছেন তোমার দাদা। কাজের কাজ তোমরাই করছো, মেয়েটাকে মানুষ করছো। আমরা তো শুধু মায়া করি। মন দিয়ে পড়াশোনা করুক শুক্তি, পরীক্ষা দিক, তারপর যেন আসে।

সুমিত্রা সরকারের আশার মন এইবার যেন ক[illegible]ন এক প্রতিজ্ঞার মন হয়ে কঠিন একটা চেষ্টার দায় নেবার জন্যে তৈরী [illegible]য়। শুক্তিকে ফাইনালে ভাল করে পাস করাতেই হবে। সকা[illegible] একঘণ্টা আর রাত্রিতে দু'ঘণ্টা, সুমিত্রা নিজেই শুক্তিকে পড়াতে শুরু করেন। অঙ্ক নিয়ে শুক্তিকে খাটাতে গিয়ে নিজেও খাটেন। শুক্তিকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে, তাই সুমিত্রাকেও একদিন মাঝরাত পর্যন্ত জেগে অনেকবছর আগের চেনা ক্যালকুলাসের আর স্ট্যাটিকসের যত জটিল থিওরী ও ফরমূলাকে আবার নতুন করে চিনে নিতে ও বুঝে নিতে হয়। কাজটা যেন সুমিত্রার একটা কল্পনার ক্লান্তিহীন আনন্দের ব্রত।

মাঝে যদি এক-আধদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে সুমিত্রাকে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবু তাঁর এই প্রতিজ্ঞার কাজটিকে থামিয়ে

রাখতে তিনি পারেন না।—এস, বই খাতা নিয়ে আমার কাছে বসো। শুক্তিকে সেদিনও কাছে ডাকবেন আর পড়াবেন।

শুক্তি আপত্তি করে।—আজ আর তুমি নাই বা পড়ালে বড় পিসি। ডাক্তার যে তোমাকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বলেছেন।

সুমিত্রা—শুয়েই তো আছি। একটু কথা বললে কিংবা তোমার পড়া শুনলে আমার জ্বর বেড়ে যাবে না। তুমি পড়।

শুক্তি মাঝে মাঝে হেসেও ফেলে।—তুমি শুধু আমাকেই দেখছো, কিন্তু ওদিকের কিছু দেখতে পাচ্ছ কি ?

ঠিকই, ওদিকের কিছু সুমিত্রার যেন চোখেও পড়ে না। ওঘরে মাস্টার গণেশবাবুর ধমক আর ভ্রূকুটিকে নির্বিকার মনে অগ্রাহ্য করে আর পড়ার বই বন্ধ করে রেখে কৃষ্ণা যে গণেশবাবুর চোখের সামনেই বসে ঘষা ঝিনুকের টুকরো গেঁথে গেঁথে মালা তৈরী করে চলেছে।

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে এক-একটা মাস। কোন সন্দেহ নেই, ভাল করে পাস করবার জন্যে শুক্তিও ওর মন-প্রাণের সব চেষ্টা ঢেলে দিয়েছে। কল্পনা করতেও মনটা হেসে ওঠে ; একদিন শুনতে পেয়ে চমকে উঠবেন দিবুদা, অঙ্কে কত ভাল নম্বর পেয়ে ফাইনাল পরীক্ষা পাস করে গেল শুক্তি। সেদিন দিবুদাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে শুক্তি, এবার বল, কার নাক থেঁতো করবে তুমি ?

শুধু রবিবারের দিন, শুক্তির কলেজে যাবার ব্যাপার যেদিন থাকে না, সেদিন সকালবেলায় শুক্তির ঘরে পড়ার টেবিলের কাছে বসে অনেকক্ষণ ধরে খবরের কাগজটাকে ভাল করে পড়ে নিয়ে অন্যরকম দু-একটা কথা বলেন সুমিত্রা। শুক্তির এই পড়াশোনার পৃথিবীর বাইরে কোন অচেনা পৃথিবীর কথার প্রতিধ্বনির মত দু-একটা কথা। আবার বন্যা !···বিজয়লক্ষ্মী বোধহয় শেষ পর্যন্ত কোন স্টেটের গভর্নর হবেন, চুপ করে বসে থাকবেন না।···চীনাদের মতলব ভাল নয়, নেফাতে উপদ্রব করবে বলে মনে হয়।

—আপনারা শুনে সুখী হবেন যে···ইত্যাদি।

তেজপুরের সোম লজের ছেলে অনিমেষের রূপগুণের অনেক প্রশংসা করে আরও এমন কয়েকটি কথা লিখেছেন তেজপুরের মণিমালা দস্তিদার, যে-কথা একেবারে সন্দেহবিহীন একটা খাঁটি বিশ্বাসের মত খুশির আবেগের কথা। তাই চিঠির ভাষা বেশ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কোথায় কোন্ বিলের জলে নীলপদ্ম ফোটে, শুক্তি আর অনিমেষ দুজনে মিলে সে-গল্পও করে।—কাজেই, ওদের দুজনের মনে যখন কোন অনিচ্ছা নেই, তখন আমি তো মনে করি যে, এ বিয়ে হলে ভালই হবে।

ভাল হলেই ভাল। সুমিত্রার চোখ দুটো শুকনো হয়ে খটখট করে। মন শক্ত করতে চেষ্টা করেন সুমিত্রা, যেন তাঁর কষ্টের কোন আক্ষেপ শব্দ করে বেজে উঠতে না পারে; যেন শুক্তি শুনতে না পায়।

এঘরে বসেই শোনা যায়, বারান্দার ফুলের টবের কাছে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করছে আর হাসছে শুক্তি। হাসুক। শুক্তিকে যেন এভাবে আরও দুটো দিন হাসিয়ে রেখে ভালয়-ভালয় তেজপুরের প্লেনে তুলে দিয়ে আসতে পারেন, এ ছাড়া এখন সুমিত্রার আর কিছু চিন্তা করবার বা আশা করবার নেই।

তবে তাঁর মনের ভিতরে একটা করুণ বিস্ময়ের প্রশ্ন যেন কথা বলতে চায়; ওখানে দাঁড়িয়ে হেসে-হেসে কথা বলছে যে-শুক্তি, সে কি সেই শুক্তি, যাকে এতদিন তিনি শুক্তি বলে চিনতেন? যে-মেয়ে এখানে শ্যামলের কাছে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে, সে-মেয়ে ওখানে অনিমেষের সঙ্গে নীলপদ্মের গল্প করেছে?

তবে কি শুক্তিকে ঘেন্না করতে চাইছে শুক্তির বড়পিসির মন? ছি ছি, অসম্ভব। শুক্তিকে ঘেন্না করতে হলে যে সুমিত্রার বুকের ভিতরের সব মায়ার নিঃশ্বাস নিজের লজ্জার জ্বালায় পুড়ে মরে যাবে।

উচিত-অনুচিত বিচার করে আর লাভ কি? না হয় ভুল করেই একটা ফুল কুড়িয়েছে শুক্তি; কিন্তু সেজন্যে কি শুক্তির

হাতটাকে ঘেন্না করে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে? শত হলেও ওটা যে শুক্তিরই হাত।

ভুল বলেই বা মনে করতে হবে কেন? হয়তো ওটাই আসল সত্য, এটা তেমন কিছু নয়। না, সুমিত্রার আর কিছু বলা সাজে না। শুক্তির ভালবাসার ভাগ্য নিজেই নিজেকে চিনে নিক।

কিন্তু শুক্তি কি বড় পিসির এই খটখটে শুকনো চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারে? পারে না বোধ হয়; তা না হলে বড় পিসির হাত ধরে টানাটানি করে আর আদুরে অভিমানের স্বরে এমন কথা বলতে পারতো না, আমি যে আর দুদিন পরে তেজপুরে চলে যাব, সেটা যেন তুমি ভুলেই গিয়েছ বড় পিসি?

সুমিত্রা হাসেন।—একথা তোমার মনে হলো কেন?

শুক্তি—আমার গান শুনতে পেয়েও তুমি আমার ঘরে ঢুকলে না, তাড়াতাড়ি ওদিকে কোথায় যেন চলে গেলে?

সুমিত্রা—খবরের কাগজটাকে তোমার পিসেমশাইয়ের ঘরে রেখে এলাম।

শুক্তি—উঃ, কী মস্ত কাজ করলে!

চোখ কাঁপে সুমিত্রার। মুখের হাসিটাও কেঁপে ওঠে। তখুনি সরে যান সুমিত্রা, তাড়াতাড়ি হেঁটে একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে রাঁধুনি ঠাকরুণের সঙ্গে কথা বলেন—নিশির মা, শুনছেন? পায়েসে বেশি মিষ্টি দেবেন না কিন্তু; বেশি মিষ্টি হলে শুক্তি সে-পায়েস মুখে তুলবে না।

প্লেনের টিকেট কিনে নিয়ে এসেছেন ড্রাইভার কেষ্টবাবু। আজকের রাতটার শুধু ফুরিয়ে যাওয়া বাকি, কাল সকালেই রওনা হয়ে যাবে শুক্তি।

ঘরের আলোর কাছে বসে ডাক দিলেন সুমিত্রা—শুক্তি, শোন।

—কী বড় পিসি? ডাক শুনেই ছুটে আসে শুক্তি।

সুমিত্রার চোখ-মুখ হাসছে। কী অদ্ভুত শান্ত অথচ জ্বলজ্বলে হাসি।—তেজপুরের সোম লজের অনিমেষকে তুমি চেন নিশ্চয়?

চমকে ওঠে শুক্তি।—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—তোমার মণিমাসি লিখেছেন, অনিমেষ খুবই ভাল ছেলে। তোমার কি মনে হয়? সত্যি খুব ভাল?

শুক্তি—আমার তো তাই মনে হয়।

সুমিত্রার মুখের হাসিটা এবার বড় বেশি স্নিগ্ধ হয়ে যায়।—বেশ তো; ভালই; আজ আর কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে বেশি রাত করে দিও না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে।

যেন ভাল ঘুম হয়, যেন শরীর খারাপ না হয়, তাই বেশি রাত না করে শুয়ে পড়তে বলেছেন বড় পিসি। রাত ন'টাও হয়নি, শুয়ে পড়ে শুক্তি।

কিন্তু কিছুতেই যে ঘুম আসে না। বন্ধ চোখ দুটো হঠাৎ ছটফট করে খুলে যায়, ঘরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। বালিশটা তো বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু এপাশ-ওপাশ করলেও মাথাটা কোন ঠাণ্ডা খুঁজে পায় না কেন? শক্ত করে বাঁধা বেণীটাই বোধহয় দুমড়ে গিয়ে ঘাড়টাকে জ্বালাচ্ছে।

বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালে শুক্তি। বেণীটাকে ভেঙে দিয়ে ঢিলে করে একটা খোঁপা বাঁধে। এই ভাল। ওরকম একটা দোলানো বেণী আর দেখতে একটুও ভাল লাগে না। ভাল দেখায়ও না।

আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে শুক্তি। কিন্তু সন্দেহ হয়, ঘুম কি হবে? চোখের পাতাগুলি যেন কাঁটার মত শক্ত, নরম হতেই চায় না। উঠে পড়তে ইচ্ছে করে; ছুটে গিয়ে বড় পিসিকেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে; তুমি তো আজ আমাকে কোন অদ্ভুত কথা বলনি, তবে আমার ঘুম আসে না কেন, বড় পিসি?

জাগা পাখির মত শুক্তির প্রাণটাও যেন উসখুস করে, কখন ভোর হবে।

ভোর হয়। বৈশাখী সকালবেলার রোদও তেতে উঠতে দেরি করে না। দমদম এয়ারপোর্টের রানওয়ের শুরুপথে সেই অনেক-চেনা শিকল-বেড়া; ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে তেজপুর যাবার ডাকোটা।

হেসে হেসে কৃষ্ণা আর স্নুকুর গলা জড়িয়ে ধরে শুক্তি। বড় পিসিকে প্রণাম করবার সময় আর চোখ তুলে তাকাতে পারে না ; তাই দেখতে পায় না, বড় পিসির চোখে কোন মায়া আজও আবার আগের মত তেমনি সজল হয়ে উঠলো কিনা।

[তের]

দেখলে তো মনে হয় না যে, তেজপুরের জল মাটি আর আলো-ছায়ার চেহারা এই সাত মাসের মধ্যে একটুও বদলেছে। এদিকে ব্রহ্মপুত্র, ওদিকে নেফার পাহাড়, আশে-পাশে ধানের ক্ষেত; সবই তো ঠিক তেমনই আছে। সেই সার্কিট হাউস, স্টেশন ক্লাব আর চক-বাজার। সেই আদালত, নেহরু ময়দান আর রিজার্ভ পুলিশ লাইন। মীনা পার্কের ফোয়ারার জল সেই পাথুরে শিশুর সাপজড়ানো মাথাটাকে ঠিক তেমনই করে ভিজিয়ে দিয়ে ঝরে পড়ছে। কিন্তু তেজপুরের জীবনের চেহারাতে রদবদলের নানা নতুন ঘটনার দাগ পড়েছে, পড়ছে ও আরও পড়বে বলে মনে হয়।

একটি কম্বলে বিড়ির আগুনের পোড়া দাগ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সে-কম্বল এখন শিশির হাজরিকার বাড়ির বাইরের ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। এটা হলো গগন বসুর ড্রাইভার কৈলাসের কম্বল। কৈলাস এখন তেজপুর জেলের কয়েদী। পুলিশ অফিসার পরেশ ভট্টাচার্যিকে বাজারের চকের কাছে দেখতে পেয়েই গলা টিপে ধরেছিল কৈলাস। সেই অপরাধের শাস্তি, এক বছরের শক্ত কয়েদ।

কৈলাসের জামিন হয়েছিল শিশির। মামলাতে কৈলাসকে ডিফেণ্ড করবার জন্য উকীল আর আদালতের সব খরচ দিয়েছিল শিশিরের তিন বন্ধু ; অমল ঘোষ, হিতেন রায় আর জগদীশ কাকতি। কিন্তু কিছুই হলো না। রায় শোনবার পর কৈলাস সবাইকে নমস্তে জানিয়ে পুলিশ ভ্যানের দিকে চলে গেল।

শীতল বিশ্বাসের সেই ক্ষুদ্র বস্ত্রালয়টিকে তেজপুরের বাজারে আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

কী যন্ত্রণাই না ভুগলেন শীতল বিশ্বাস! দোকানের খাতা-পত্র ঝোলায় ভরে নিয়ে ইনকাম ট্যাক্সের অফিসে যান আর ফিরে আসেন। সামান্য আয়ের কৈফিয়ত দিতে দিতে হয়রান হন। সবই সহ্য করছিলেন শীতল বিশ্বাস। কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী একদিন বেশ ভ্রূকুটি করে হাসলেন।—আপনি যে একজন শীতল অবিশ্বাস নন, সেটা প্রমাণ করতে পারবেন?

—আজ্ঞে না!

—তা হলে এসব খাতাপত্রের সাধুতা দেখাতে আর আসবেন না।

—তাহলে কি করবো, বলুন।

—আমার একজন লোক, নাম মধুবাবু, আপনার কাছে যাবে। তাকে খুশি করে দেবেন।

মধুবাবু এসে বলেছিলেন।—অন্তত দেড় হাজার টাকা দিন। শীতল বিশ্বাস বলেন—না। টাকা থাকলেও দিতাম না।

একদিন মহিম দস্তিদারও বলেন—এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুন শীতলবাবু। আর, আমার টাকাটাও শোধ করে দিন। আপনার কাছ থেকে ইন্টারেস্ট পেতে আমি আর ইন্টারেস্টেড নই।

এর পর আর দেরি করেননি শীতল বিশ্বাস। দোকান বিক্রী করে দিয়ে মহিমবাবুর পাওনা টাকা সুদসুদ্ধ শোধ করে দিয়েছেন। মহিমবাবু অবশ্য দুঃখিতভাবে হেসেছেন।—এখন তাহলে সম্পত্তি বলতে আপনার কিছু রইলো কি, শীতলবাবু?

শীতল বিশ্বাস—হ্যাঁ, একটা পুরনো মরচেপড়া তোবড়ানো ট্রাক রয়ে গেল।

মহিমবাবু—তাহলে তো অনাদায় ট্যাক্সের জন্য ওটাই ক্রোক হবে।

শীতল বিশ্বাস হাসেন।—হলে হবে, কিন্তু ওরা ঠকবে।

মহিমবাবু চোখ টান করেন।—ঠকবে কেন?

শীতল বিশ্বাস—ক্রোক করতে আসবার আগেই ওটাকে একটা মুগুর দিয়ে পিটিয়ে দেব ; চমৎকার একটা অপদার্থের পিণ্ডি হয়ে যাবে। সে-মাল ওরা নীলাম করে যাট টাকাও পাবে কিনা সন্দেহ।

হাসতে থাকেন শীতল বিশ্বাস। অদ্ভুত হাসি। যেন একটা ক্ষেপা রোগীর হাসি।

মহিমবাবু দুঃখিতভাবে হাসেন।—এঃ, আপনি বড় ক্রোধী মানুষ, শীতলবাবু। ক্রোধ কিন্তু একটা রিপু।

কোলিবাড়িতে শিশির হাজরিকা নিজেই এখন ওই বাড়ির একজন ভাড়াটিয়া বাসিন্দা ; বাড়িটা এখন শৈলেশ্বর শইকিয়ার সম্পত্তি।

মালতী বলেছিল, চাকরি করতে চাই, তা না হলে চলবে কি করে ? দিন দিন যে দেনা বেড়েই চলেছে। মালতীর কথা শুনে সেই যে রাগ করে চেঁচিয়ে আর ধমক দিয়ে উঠলো শিশির, তার ঠিক সাতদিন পরে বাড়িটাকে বিক্রী করে দিল।

জগদীশ বলে—তাড়াহুড়ো করে এত অল্প দামে বাড়িটাকে বিক্রী না করলেই ভাল করতে, শিশির।

বাড়ির সামনে কচি নারকেলের পাতার ঝালরে চাঁদের আলো চিকচিক করে ; চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নেয় শিশির, জগদীশের কথার কোন জবাব দেয় না।

শৈলেশ্বর শইকিয়া দুঃখিতভাবে হেসেছেন।—তোমার বাবাকে আমি চিনতাম শিশির। মানুষটিকে আমার খুব ভাল লাগতো। তাই ইচ্ছে করেই আমি বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে বাড়িটা কিনে নিলাম। কিন্তু আমি চাই, তুমি একদিন উন্নতি করে এর চেয়ে অনেক ভাল বাড়ি তৈরি করবে আর সুখে থাকবে।

নেফা মেডিক্যালের পিয়ন রতন বিশ্বাস আজকাল নতুনপাড়ার বাড়ির একটি ঘরের মেজেতে মাদুরের উপর যেন দুর্ঘটনায় জখম একটা মানুষের চেহারার মত করুণ হয়ে শুয়ে পড়ে থাকে, যদিও রতনের হাতে পায়ে ও মাথাতে কোন ব্যাণ্ডেজ নেই।

ঘরের দেয়ালে অবশ্য একটা রঙীন নুড়িপাথরের মালা এখনও

ঝুলছে। কিন্তু ঘরের জানালা সব সময় বন্ধ করে রাখে রতন, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত, যেন বাইরের কোন আলো এসে ঘরের অন্ধকার ভেঙে না দেয়, আর কোন রঙীন জিনিস যেন চোখে না পড়ে।

রতনের চাকরি নেই। নেফার আইন রতনকে ক্ষমা করতে পারেনি। কারণ, দফলাদের গাঁ বিলং একদিন দা হাতে নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে নেচেছে আর নালিশ করেছে, গাঁওবুড়ার মেয়ে রেনকিকে নষ্ট করতে চেষ্টা করেছে মেডিক্যালের পিয়ন রতন।

শীতল বিশ্বাস তাঁর গলার স্বর চেপে আস্তে আস্তে কথা বলেন—হ্যাঁ, ম্যালেরিয়া-ইন্সপেক্টর ধীরেনের কাছ থেকে সব কথা শুনলাম। পলিটিকাল খোসলা সাহেব নিজের হাতে রতনকে গলাধাক্কা দিয়ে কোয়ার্টার গার্ডে পুরেছিলেন। তিনটে মাস কোয়ার্টার গার্ডে বন্ধ ছিল রতন। এক বছরের মাইনে থেকে জমানো টাকার সব টাকা, পুরো পাঁচশো টাকা জরিমানা দিয়েছে রতন। সে-টাকা নিয়ে বিলং-এর দফলারা মিথুন কিনেছে, কেটেছে আর খেয়েছে।

মীরা—কিন্তু রতন ঠাকুরপো কি সত্যিই···আমার তো বিশ্বাস হয় না।

শীতল—কিন্তু রতন যে নিজেই স্বীকার করেছে।

চমকে ওঠেন মীরা।—কি স্বীকার করেছে?

শীতল—রেনকিকে একদিন জড়িয়ে ধরেছিল রতন।

মীরার মুখটা করুণ বিষাদে ভরে যায়।—রেনকি কিছু বলেনি?

শীতল—রেনকি শুধু একবার গাঁ থেকে পালিয়ে এসে কোয়ার্টার গার্ডের বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল আর কেঁদেছিল। তারপর আর কোন গণ্ডগোল না করে চলে গেল।···রতন জেগেছে মনে হচ্ছে?

শব্দ শোনা যায়, ঘরের জানালা খুলছে রতন। কারণ সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ কালো হয়ে উঠেছে।

ডক্টর সি টি এলগিন, সেই বোটানিস্ট সাহেব, তিনিও নেফা থেকে ফিরে এসেছেন। সরকারী সমাদর তাঁকে তোয়াং থেকে হেলিকপ্টারে

তুলে নিয়ে তেজপুরে পৌঁছে দিয়েছে। নেফা-অফিসার মনোহর লাল সার্কিট হাউসে এসে এলগিনের কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।—অনুমান করি, আপনার কোন অসুবিধে ভুগতে হয়নি স্যার ?

এলগিন হাসেন।—একটুও না। আপনার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন।

মনোহর লাল—কর্তব্য করেছি, এইমাত্র। আমাদের সার্ভিস তো ঠিক চাকরির ব্যাপার নয় স্যার, এটা একটা ডেডিকেশন।

এলগিন—খুব সত্য কথা।

মহিমবাবু আসেন, শৈলেশ্বরবাবু আসেন; সরকারী গণ্যমান্য আর পদস্থেরাও আসেন। সকলের কুশল-জিজ্ঞাসার জবাবে এলগিন বিনীতভাবে বলেন—আমার পিলগ্রিমেজ প্রায় শেষ হয়েছে। এবার শুধু সাতটা দিন এই তেজপুরের এদিক-ওদিক একটু ঘুরে-ফিরে আর চোখ তৃপ্ত করে চলে যাব।

মহিমবাবু—কিন্তু চলে যাবার আগের দিন যদি আমার বাড়িতে এসে সামান্য একটি চায়ের আসরে বসে টাউনের এলিটের সঙ্গে একটু আলাপ করেন, তবে আমাদের পক্ষে সেটা খুবই সুখের বিষয় হবে।

এলগিন—নিশ্চয় যাব; এ তো আমার সৌভাগ্য।

মহিমবাবু—তাহলে আশা করছি, আগামী শনিবার সন্ধ্যায় আপনাকে আমাদের মধ্যে দেখতে পাব।

এলগিন—ও ইয়েস! নিশ্চয়

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা, সার্কিট হাউসের বারান্দায় একা-একা একটি চেয়ারে বসে আর টেবিলের আলোর কাছে একটা কাগজ রেখে যখন তুটি চোখের সব আগ্রহ ঢেলে দিয়ে কি-যেন দেখছিলেন আর পড়ছিলেন এলগিন, তখন হঠাৎ কয়েকটা ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন। সেই মুহূর্তে কাগজটাকে ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ঝুড়ির ভিতরে ফেলে দিলেন।

ছায়া নয়; শিশির, হিতেন আর অমল এসে দাঁড়িয়েছে। আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে বেশ স্নিগ্ধভাবে হাসেন এলগিন।—আসুন।

শিশির—নেফার ফ্লোরা সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই। আর, কয়েকটা কথাও আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।

একবার শিশিরের, একবার অমলের, একবার হিতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে, তারপর খুব জোরে একবার কেশে নিয়ে হেসে ওঠেন এলগিন।—খুব ভাল কথা। আপনারা কাল বিকেলে আমার এখানে আসুন। আমি খুব খুশি হয়ে নেফার ফ্লোরার অনেক চমৎকার কথা আপনাদের শোনাবো।

কিন্তু পরের দিনের বিকালে নয়, শনিবারের সন্ধ্যাতেও নয়; এই তেজপুরের প্রায় একশোটি বিকেল আর সন্ধ্যা এসেছে আর চলে গিয়েছে, তবু বোটানিস্ট সাহেব এলগিনকে কেউ আর দেখতে পায়নি। সার্কিট হাউসে গিয়ে এলগিনকে দেখতে না পেয়ে শিশির, অমল আর হিতেন হেসে ফেলেছিল। মহিমবাবুর বাড়িতে শনিবারের সন্ধ্যার চায়ের পার্টি একটু দুঃখিতভাবে বিস্মিত হয়েছিল।—এভাবে হঠাৎ কেন উধাও হয়ে গেলেন এলগিন?

মহিমবাবুর বাড়ি ভারতীর কালোর মা একদিন কিন্তু বেশ একটু ভয় পেয়ে বাড়ির ছাদ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে চলে এলেন।

রাতের কাজ শেষ হবার পর জপের মালা হাতে নিয়ে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কালোর মা। হঠাৎ চোখে পড়ে, দূরে ঊষাপাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বলছে। আগুনটা যেন পাহাড়ের গায়ে উঠছে নামছে আর হেঁটে বেড়াচ্ছে।—ভাল লক্ষণ নয় মা। বলতে গিয়ে কালোর মা'র গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

মণিমালা বলেন—ও কিছু নয়। ওটা সেই পাগলা সাধুর ধুনির আগুন।

বোধহয় খুব ভুল কথা বলেননি মণিমালা; অনেকেরই এ-গল্প জানা আছে; একজন পাগল সাধু, যার ভয়-ডরের কোন বালাই নেই, মাঝে-মাঝে ঊষাপাহাড়ে উঠে ধুনি জ্বালায় আর রাত কাটায়।

কিন্তু তেজপুরের ভিতরে-বাইরে আনাচে-কানাচে আর আশে-পাশে সত্যিই যে একটা উপকথার জগতের যত অলক্ষুণে কায়া ছায়া

আর ভাষা ঢুকেছে; ঘুরছে ফিরছে হাসছে আর ছুটছে। বিচিত্র অদ্ভুত করুণ আর কুৎসিত।

মুরগীতে ভরতি হয়ে ছুটে যাচ্ছে টাস্কারের রোড-ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল সাহেবের জীপ। ফুটহিলের কাছে এসে ইনার লাইন পার হবার আগেই সড়কের গর্তে পড়ে মিলিটারীর ট্রাকের চাকা ভেঙ্গে গিয়েছে। উল্টে গিয়েছে ট্রাক। ট্রাক থেকে গড়িয়ে পড়েছে সাজানো পেটির স্তূপ; পেটি ভেঙ্গে বোতল; আর বোতল ভেঙ্গে গড়িয়ে যায় তরল সোলান আর সাহারানপুর।

বাজারের আড়তদারের গদিতে বসে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে শুধু হাসছেন আর হাসছেন আর টাকা গুনছেন মিলিটারীর এক খুশি অফিসার। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে এসে সরকারী পারমিটের একজন কর্তা অফিসার তাঁর সভ্য-ভব্য স্যুট-শোভিত চেহারা নিয়ে এমন একজন কারবারী মহাজনের হাত ধরে হাসছেন আর কথা বলছেন, যাঁর পরনে একটি খাটো ধুতি আর কাঁধে একটি গামছা। হোটেলের টেবিলের এপাশে কন্ট্রাক্টর, ওপাশে ইঞ্জিনীয়ার, মাঝখানে ছুটি বীয়ারের বোতল। সাপ্লাইয়ের চালান তখনি তৈরী হয়; বিলও তখনি। সেই বিল আর চালান তখনি সই করে দিয়ে হেসে ওঠেন ইঞ্জিনীয়ার। কন্ট্রাক্টরও তখনই হাঁক দেন।—জলদি করো বয়, আউর দু'বোতল বীয়ার।

বুঝতে পারা যায় না, চারজন বাইজী কেন এসে ডাকবাংলোতে ঠাঁই নিয়েছে। ওরা বমডিলাতেই বা কেন যেতে চায়? মাইফেলের বায়না পেয়েছে নাকি ওরা?

এত রাতে ওখানে ওটা কিসের ভিড়? মিলিটারীর দু'জন অফিসার মানুষের উপর মারমুখী হয়ে ঝগড়া করছে কেন শিশির আর অমল? একজন পুলিশ এস-আই বা কেন নির্বিকার অসহায়তার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন?

সিনেমা হাউসের সামনে রাস্তার একপাশে একটা রিক্সার উপর বেহুঁস হয়ে শুয়ে পড়ে আছে একটা অল্পবয়সের মেয়ে, বোধহয় গাঁয়ের

চাষীর ঘরের মেয়ে। মেয়েটার গায়ে নতুন কেনা একটা হালফ্যাশনের মেয়েলী ওভারকোট, মুখে মদের গন্ধ।

মিলিটারীর দুই অফিসার একসঙ্গে ছড়ি ঘুরিয়ে নেশাজড়ানো স্বরে ধমক দেন।—আমরা কিছুই জানি না। রিক্সাওয়ালা কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে—আমি কিছু জানি না; মেলিট্রি সে পুছিয়ে।

মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে পুলিশ এস-আই কাতরস্বরে ডাকেন।—শিশিরবাবু, প্লীজ; আমার কথা রাখুন। মিথ্যে গোলমাল বাধাবেন না।

টাস্কারের পতাকার হাতির-মাথা দুলে দুলে হাওয়া খায়, ছুটে ছুটে হাওয়া খায় টাস্কারের গাড়ি। এ ব্যস্ততা যেন একটা মত্ততা। বাজারের লোকে বলাবলি করে, ওদের পান আনতে জীপ ছোটে, আর সিগারেট আনতে ট্রাক।

শিশির বলে—সত্যিই কি ওরা রোড তৈরী করে, না ম্যাপ আর মডেলের মধ্যে রোডের দাগ টানে?

জগদীশ বলে—তা জানি না; কিন্তু ওদের অফিসার-মেসের সন্ধ্যা-বেলার আলোর ঝলমলানি দেখে মনে হয়, যেন একটা কার্নিভালের ফুর্তি চলছে সেখানে।

ফোর্থ ডিভিসনের একটা ব্যাটেলিয়ন এসেছিল অনেকদিন আগে তারা নেফার পাহাড়ের এদিকে-ওদিকে কবেই চলে গিয়েছে। কিন্তু তারপর আর যারা এসেছে তাদের যেন কোথাও যাবার কথা নেই তেজপুর আর মিসামারির সেনা-বারিক যেন দুটো বিশ্রামসুখের ধরমশালা। ব্যস্ততা বলতে শুধু পিকনিকের ব্যস্ততা। এদিকে পিকনিক, ওদিকে পিকনিক; নিয়মিত রুটিন উৎসবের মত পিকনিক।

স্টেশন-ক্লাবে এসে পানীয় মুখে ঢেলেই মেজর নায়ার বলেন—চীনারা অ্যাগ্রেস করবে, এটা একটা কক অ্যাণ্ড বুল স্টোরি।

রেলের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার মুস্তফী তাঁর হাতের গেলাস নামিয়ে রেখে ঢেঁকুর তোলেন।—আমি একজন ক্যাপ্টেনের মুখেও ঠিক একথা শুনেছি।

—কাজেই আমাদের ফোর্স এখানেই থাকবে; এর চেয়ে বেশি এগিয়ে যাবার দরকার হয় না।

—ঠিক বলেছেন, ইউ আর রাইট!

—যেটা নিতান্ত বর্ডার পুলিশের কাজ, সে-কাজে আর্মিকে ভি... দেওয়া খুবই অসঙ্গত।

—আরও সত্যি কথা; ইউ আর মোর দ্যান রাইট!

—বর্ডার পুলিশ যেন ভয় না পায়, মরেল ঠিক রাখতে পারে; সেজন্য বড় জোর ইনফ্যান্ট্রির কয়েকটা প্লেটুন পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

—উপরের এইরকম ইনস্ট্রাকশন আছে বোধহয়?

মেজর নায়ার হঠাৎ শক্ত করে ভুরু কুঁচকিয়ে বলে ওঠেন—একজন সিভিল চ্যাপ কোন্ সাহসে আশা করে যে, আমি তার কাছে মিলিটারির একটা সিক্রেট প্রকাশ করে দেব?

মিস্টার মুস্তফী একটা হাই তুলে নিয়ে উঠে পড়েন; গেলাসের দিকে আর তাকান না। চলে যান।

কিন্তু কন্ট্রাক্টর তেজা সিং-এর মিসামারি বাগানে একটি খানাপিনার আসরে, লালপানি আর ভাজা মাংসের ঢালাও উৎসবে, একদিন এই মিলিটারী নায়ার আর সিভিল মুস্তফী দুজনে হাত ধরাধরি করে হাসলেন আর গল্প করলেন। দু'জনেরই অন্যহাতে তখন দুটি চকচকে প্লাস্টিকের ফোলিও ব্যাগ ঝুলছে; তার ভিতরে তেজা সিং-এর কৃতার্থতার উপহার একগাদা একশো টাকার নোট কিন্তু কোন শব্দ করে না।

অনেকে যাকে বলে তেজা সিং-এর এজেন্ট, সেই সুশান্ত মজুমদারের টেলিফোনের একটা ডাক শুনে উতলা হয়ে যান, এমন পদস্থ সিভিলের সংখ্যাও কম নয়। মজুমদার সাহেব শিলং চলে যাবেন শুনতে পেয়ে সোজা একেবারে এয়ারপোর্টে হাজির হলেন সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কসের চন্দ্রনাথন; ইনি সেই চন্দ্রনাথন, যিনি পণ্ডিচেরী ভঙ্গীতে ফরাসী ভাষা বলে পোস্টমাস্টারকে একদিন খুব ভয়

পাইয়ে দিয়েছিলেন। ফরেস্টের গোস্বামীও সোজা এয়ারপোর্টে ছুটে আসেন। বিদায় নেবার আগে ব্যাগ উপুড় করে গাড়ির সীটের উপরে নোটের তাড়া ঢালেন মজুমদার। গোস্বামী হাসেন।—আশা করি আবার দেখা হবে। চন্দ্রনাথন হাসেন।—ওর্‌র্‌ রাভোয়ার!

মিসামারি থেকে মাত্র পাঁচ মাইল; ছোট নদীর কিনারায় আমবাগানের ছায়াকে মিষ্টি করে দিয়েছে ফাল্গুন মাসের কোকিলের ডাক। পিকনিক সেরে নিয়ে শিশির আর শিশিরের স্কুলের ছেলের দল সড়কের ধারে নিমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ফুটহিলের দিক থেকে বাস আসবে; ওরা সবাই আবার তেজপুরে ফিরে যাবে।

ছেলেদের চোখগুলি হঠাৎ এদিকে ঘুরে গেল। বুটের শব্দের সঙ্গে সড়কের ধুলো উড়ছে। কাঁধের উপর পুরো প্যাক আর রাইফেল, জাঠ রেজিমেন্টের একটা প্লেটুন আসছে। বেশ শান্ত চাহনি, বেশ শক্ত চেহারা, হাসিমাখা মুখ; জওয়ানদের কপালের ঘাম ধুলোতে ভরে গিয়ে কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছে। কারও পায়ে ছেঁড়া বুট; কারও গায়ে ছেঁড়া আস্তিনের উর্দি। ওরা বোধহয় ফুটহিলের ক্যাম্পের কাছে গিয়ে জীপে উঠবে।

কিন্তু কী অদ্ভুত শিশির হজারিকার কড়া মেজাজের মন! শিশিরের শুকনো চোখে কোন সমবেদনার একছিটে ছায়াও কাঁপে না। বরং ছেলেদের সাবধান করে দেয় শিশির।—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক আর দেখ। হাততালি দেবে না, কথা বলবে না, হই-হই করবে না।

চলে গেল জাঠ প্লেটুন। কিন্তু তেজপুর যাবার বাস আসতে বোধহয় আরও আধঘন্টা লাগবে। ছেলের দল নিমের ছায়ায় চুপ করে বসে থাকতে না পেরে ছটফট করে।

শিশির হঠাৎ আবার ছেলেদের সাবধান করে দেয়।—কেউ কথা বলবে না। কারণ, ধুলো উড়িয়ে, বুটের শব্দ বাজিয়ে আর-একটা জওয়ান-দল কাছে এসে পড়েছে। এটা আসাম রাইফেলের একটা প্লেটুন।

কিন্তু নীরব শিশিরের শক্ত-উদাস চোখ দুটো হঠাৎ চমকে ওঠে।

দেখতে পেয়েছে শিশির, বেশ শক্ত বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা আর বেশ অল্প বয়সের ওই প্লেটুন হাবিলদার শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে আর হেসে হেসে চলে যাচ্ছে।

কথা বলে ফেলে শিশির—সুজিতবাবু, আপনি !

—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

হাত তুলে নেফার একটা পাহাড়ের মেঘলা রঙের মাথাটাকে দেখিয়ে দেয় সুজিত।

ফাল্গুন গেল, চৈত্র গেল, বৈশাখও যায়-যায় ; মণিমাসি একদিন খুব খুশির স্বরে হাসতে থাকেন।—কি কালোর মা, ঊষা-পাহাড়ের আগুন আর কখনও চোখে পড়েছে ?

—জানি না মা, আমি আর ওদিকে তাকাই না।

—তুমি তো মিথ্যে ভয় করে একটা অলক্ষণ দেখতে পেলে ; কিন্তু লাহিড়ীবাবুর মেয়ে কি বলে গেল শুনবে ?

—বলুন, শুনি।

—সকালবেলাতে অগ্নিগড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেয়েছে লাহিড়ীবাবুর মেয়ে, বরফে ঢাকা সাদা গৌরীচেন চূড়া উত্তুরে আকাশে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে।

শুনে খুশি হন কালোর মা।—শুনেছি, এটা নাকি খুব সুলক্ষণ।

মণিমালা—খুব সুলক্ষণ। মেয়েটাকে আমি বলেছি ; তোর বিয়ে হবে শিগগির, শিবের মত বর হবে তোর।

কথা শেষ করেও হাসতে থাকেন মণিমাসি। হঠাৎ আরও খুশি হয়ে বলে ওঠেন—শুনেছো তো কালোর মা, আজ যে শুক্তির আসবার কথা।

—শুনেছি মা।

—আমারও ইচ্ছে, শুক্তি একবার অগ্নিগড়ে গিয়ে দেখে আসুক উত্তুরে নেফার ওই গৌরীচেন ; একটু ভাল করে দেখে আসুক।

[চৌদ্দ]

শুক্তিকে দেখতে বেশ রোগা-রোগা মনে হয়েছে, তাই একটু দুঃখিত হয়েছেন মণিমাসি। আর, দুঃখের ভাষাটা যেন একটা উদ্বেগের ভাষা।—এখন এরকম একটা রোগাটে মূর্তি ধরলে তো চলবে না। তাড়াতাড়ি শরীর সারিয়ে ফেলতে হবে। শুনছিস তো শুক্তি?

শুক্তি—শুনছি।

মণিমাসি—শরীর ভাল না করে কদমবাড়ি যেতে পারবে না। আমি আগেই বলে রাখছি।

শুক্তি—তাহলে তো আজকেই কদমবাড়ি যেতে হয়।

মণিমাসি—কেন? কেন?

শুক্তি—আমার শরীর খুব ভাল আছে, যথেষ্ট ভাল আছে।

মণিমাসি—না, নেই।

শুক্তি—তাহলে আমারও আর কিছু বলবার নেই।

মণিমাসি—আমি কিরণদিকে আজ চিঠি দিচ্ছি, তুমি বেশ কিছুদিন এখানে থাকবে।

শুক্তি হাসে।—বেশ কিছুদিন করো না মণিমাসি; অন্তত পরীক্ষার ফল বের হবার আগেই আমাকে সরে পড়তে দিও।

মণিমাসি—পরীক্ষার ফলের কথা ভেবে এত ভয় করবার কি আছে?

শুক্তি—আমার একটুও ভয় নেই। ফেল করলে বড়পিসি ভয়ানক কষ্ট পাবেন, শুধু এই ভয়।

—তা তো বটে; তোর বড় পিসি দুঃখিত না হয়ে পারবেন কেন? একে তো নিজে বিদুষী মানুষ, তার ওপর তোকে পড়াতে গিয়ে মানুষটা এই বয়সে নিজেও কত খেটেছে। কিন্তু এখন তো আর তোর পাস-ফেল নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছে মণিমাসির, শুক্তি যেন বড় বেশি ভাবছে। হাতে কোন গল্পের বই নেই, রেডিওটারও মুখ বন্ধ, তবু

ঘরের ভিতরে একা একটা চেয়ারে বসে শুধু আংটিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঙুল থেকে খুলছে, আবার পরিয়ে ফেলছে।

মণিমাসি বলেন—অনিমেষ এখন তেজপুরে নেই। থাকলে কি আর এই দশদিনের মধ্যে একটা দিনও না এসে পারতো? কিন্তু আসবে। অঞ্জলি বলেছে, বড়জোর আর দেড় মাস। তারপর ছুটি পেতে অনিমেষের আর কোন অসুবিধে হবে না।

মাঝে মাঝে মনে হয় মণিমাসির, শুক্তি যেন বড় বেশি শান্ত হয়ে গিয়েছে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করছে রাজবাহাদুর, শব্দ শুনে আর দেখতে পেয়েও ছটফট করে ওঠে না শুক্তি।

মণিমাসি বলেন—কি হলো তোর শুক্তি? না মীরা, না মালতী, কারও সঙ্গে একটিবার দেখা করতেও গেলি না, অথচ এক মাসেরও বেশি হলো তেজপুরে এসেছিস।

শুক্তি—যাব একদিন।

মণিমাসি—আমি বলি, একদিন অবজারভেটরী হিলে গিয়ে উত্তরে নেফার গৌরীচেন দেখে আয়। সাদা চূড়াটাকে আজকাল বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

শুক্তি—যাব একদিন; এখন যেতে ইচ্ছে করে না।

মণিমাসি হাসেন।—একা একা যেতে ইচ্ছে করে না বুঝি!

এক-একবার সন্দেহ হয় মণিমাসির, এবার যেন কলকাতা থেকে একটা ক্লান্ত শরীর নিয়ে তেজপুরে এসেছে শুক্তি। তা না হলে আজকাল এত ঘুমোতে আর শুয়ে পড়ে থাকতে চায় কেন মেয়েটা?

তেজপুরের জষ্ঠি মাসের গরমের জ্বালায় উষাপাহাড় যতই শুকনো আর রুক্ষ হয়ে যাক না কেন, রবার বাগানের বাড়ি ভারতীর কোন ঘরে সে-জ্বালার কোন ছোঁয়া ঢুকতে পায় না। খস ঘাসের মোটা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে ভারতীর সব ঘরের জানালা আর দরজা। প্রতি ঘণ্টায় পিচকারী দিয়ে জল ছিটিয়ে সে পর্দা ভিজিয়ে রাখবার জন্য দুজন চাকর দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে। পাখা ঘোরে; ঘরের বাতাস ঠাণ্ডা, বাতাসে ভিজে খসের সুগন্ধ। ঢিলে খোঁপাকে আরও ঢিলে করে

দিয়ে, বিছানার উপর শুয়ে আর চোখ বন্ধ করে যেন স্নিগ্ধ একটা স্বপ্ন দেখতে চাইছে শুক্তি। দেখতে পেয়ে মণিমাসির তো তাই মনে হয়।

এগিয়ে আসেন মণিমাসি। শুক্তির বিছানার একপাশে বসে শুক্তির কপালে বেশ কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে নিয়ে চলে যান। বোধহয় ডাকপিয়ন এসেছে। বোধহয় কিরণদির কাছ থেকে আর-একটা চিঠি এসেছে।

ভুল নয় মণিমাসির অনুমান। কদমবাড়ি থেকে কিরণলেখার বেশ বড় একটা চিঠি এসেছে। সে চিঠিকে খুব মন দিয়ে বার বার তিনবার পড়লেন মণিমাসি।

কিন্তু চিঠিটা তাঁর হাত থেকে বোধহয় টুপ করে ঝরে পড়ে যাবে। আলগা হয়ে ঝুলছে তাঁর হাতের চিঠিটা। আর চোখের দৃষ্টিটা যেন কুচি-কুচি হয়ে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। চিঠিটা সত্যিই যে তাঁর এতদিনের একটা সুন্দর বিশ্বাসের গায়ে কালি ছিটিয়ে দিয়ে ভয়ানক ঠাট্টা করছে।

লিখেছেন [illegible]—[illegible]তা থেকে সুমিত্রার চিঠি পেয়ে এখন আমার মনে হয়েছে, তুমি চিঠিতে একটু বেশি তাড়াতাড়ি করে অনিমেষের কথা লিখে ফেলেছো। আরও কিছুদিন পরে লিখলে বোধহয় ভাল করতে। শুধু একা সুমিত্রা নয়, আলিপুরের বাড়ির সবাই, জয়ন্তবাবু, দিবাকর আর করুণা, এমনকি নিশির মা'রও বিশ্বাস যে, শ্যামলের কাছে শুক্তির কোন আপত্তি নেই। শ্যামলের স[illegible] শুক্তির চেনা-শোনা আর মেলা-মেশাও হয়েছে। শ্যামলকে চিনতে পারলে তো? সুমিত্রার বড়জায়ের ছেলে শ্যামল সরকার, ডাক্তার, খুব কৃতী ছেলে। সুমিত্রা একটু দুঃখ করে লিখেছে, ওরা সবাই এতদিন ধরে যা দেখেছে শুনেছে আর বুঝেছে, সেটা কি একেবারে মিথ্যে?

অনেকদিন আগে তেজপুরে একটা সার্কাস-দল খেলা দেখাতে এসেছিল। মণিমালা একদিন সেই সার্কাসের খেলা দেখে এসেছিলেন। বেশ হাসি-খুশি চেহারা, বেণী দুলিয়ে একটা মেয়ে তারের উপর নেচেছিল। দুজন দু'রকমের চেহারার ক্লাউন; একটার মুখে

সাদা রঙের, আর-একটার মুখে লাল রঙের ছোপ ; মাটিতে দাঁড়িয়ে তারের দু'পাশের দু'দিক থেকে হাতছানি দিয়ে মেয়েটাকে ডাকে। মেয়েটা তারের উপর দিয়ে নেচে নেচে এসে একবার এই ক্লাউনের মাথাতে, একবার ওই ক্লাউনের মাথাতে রঙী ছাতাটা ছুঁইয়ে দিয়ে হাসতে থাকে।

একটা রঙ্গিলা খেলা ; তামাসার জীবনে ওরকম খেলা চলতে পারে। কিন্তু শুক্তির মত মেয়ের জীবনে এ খেলা যে বিশ্রী একটা ভুলের খেলা। শুক্তির কি এটুকুও বুঝবার চেষ্টা নেই যে, সার্কাসের মেয়ের খেলাতে যেটা তামাসা, ঘরের মেয়ের জীবনে সেটা একটা ঘেন্না ; এ কি কাণ্ড করে বসে আছে শুক্তি ?

কিরণদির এই চিঠির কী উত্তর দেবেন মণিমালা ? ভাবতে গিয়ে মনের মধ্যে একটাও কথা খুঁজে পান না। যেন ভাষা ভুলে গিয়েছেন মণিমালা। এত ভাল একটা শুভেচ্ছা, এত সুন্দর একটা আশা, আর এত ব্যস্ত একটা চেষ্টা, কত হঠাৎ একটা মিথ্যের জঞ্জাল হয়ে গেল। মণিমালার বুকের ভিতরে যেন একটা কান্না মুখ বন্ধ করে শুধু হাঁসফাঁস করতে থাকে। শুক্তির ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকেন মণিমালা।

এখন তো বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে, অনেক রাতে ছাদে উঠে উষাপাহাড়ের গায়ে যে আগুনটাকে জ্বলতে দেখেছিল কালোর মা, সেটা একটা অলক্ষুণে ইঙ্গিত। ভবানীপুরে আপত্তি নেই, সোম লজেও আপত্তি নেই ; ছি ছি, কোন ভালবাসার মন কি এমন কুৎসিত কথা বলতে পারে ?

সত্যিই কি তাই বলেছে শুক্তি ? ও মেয়ের মুখ দেখে তো বিশ্বাস করতেই পারা যায় না যে, দু'জায়গায় দু'জনের কাছে মন সঁপে দিয়ে ও-মেয়ের সাধ-স্বপ্ন সবই নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছে। অঞ্জনা আর অর্চনা, ওরা তো এই শুক্তিরই দুই দিদি, ওরা যে জীবনে কোনদিন এক ছাড়া দুই ভাবতেই পারেনি। ওদের ভাগ্য ওদের ঠকিয়েছে, ওরা ইচ্ছা করে আর ভুল করে ভাগ্যটাকে ঠকাতে চায়নি। কিন্তু শুক্তি যে ইচ্ছে করে আর ভুল করে…। শুক্তির ঘুম ভেঙেছে মনে হয়।

শুক্তির ঘরে ঢুকে, শুক্তির মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর জিজ্ঞাসা করেন মণিমালা—ভবানীপুরের শ্যামলের সঙ্গে তোমার তো বেশ চেনাশোনা হয়েছে।

চমকে ওঠে শুক্তি।—হ্যাঁ।

মণিমালা—তুমি নাকি বলেছ যে, ওখানে তোমার কোন আপত্তি নেই?

লালচে হয়ে যায় শুক্তির মুখ। মাথা হেঁট করে আর মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দেয় শুক্তি—অনেক দিন আগে করুণা বউদির কাছে বলেছিলাম।

মণিমালা—বেশ করেছিলে। কিন্তু তোমার আপত্তি নেই, এই কথাটা তো মিথ্যে নয়।

শুক্তি—তা আমি কেন আপত্তি করতে যাব, বল? আমাকে ওকথা জিজ্ঞাসা করাই বা কেন?

মণিমালা—কেন নয়?

শুক্তি—তোমরা আছ কি করতে?

মণিমালা—আমি থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি?

শুক্তি হাসে।—কেন?

মণিমালা—আমি তো আমার বোকা মনে বিশ্বাস করেছিলাম, অনিমেষের সঙ্গে তোমার কোন আপত্তি নেই।

শুক্তি—আমি কি কখনও বলেছি যে, আপত্তি আছে?

চমকে ওঠেন মণিমালা।—তোমার কথাটা আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগলো না। খুব বাজে কথা, খুব ভুল কথা।

শুক্তি—কেন? কিসের ভুল হলো?

মণিমালার গলার স্বর যেন একটা ভর্ৎসনার ধমক হয়ে ফেটে পড়তে চায়। তবু খুব চেষ্টা করে গলার স্বরের সঙ্গে ভাষার রূঢ়তাও সামলে নিলেন মণিমালা। কিন্তু তাঁর চোখ দুটো রুক্ষ হয়ে কাঁপতে থাকে।—আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি একটা মানুষ, না দুটো মানুষ? তোমার কি একটা প্রাণ, না দুটো প্রাণ? গগনবাবুর কি শুক্তি নামে দুটো

মেয়ে আছে ; একজনের মন ভবানীপুরে, আর একজনের মন তেজপুরে ? খুব দুঃখের কথা ; আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি যে, তোমার মত মেয়ে ঠিক বরেন ঘোষের মেয়েটার মত এরকম একটা দোমনা কাণ্ড করবে।

—মণিমাসি ! চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি।—আমিও কোনদিন ভাবতে পারিনি যে, তুমি আমাকে এত শক্ত কথা বলবে।

শুক্তির চোখের তারা দুটো যেন ভয় পেয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। থেকে-থেকে শিউরে উঠছে এক-একটা নিঃশ্বাস। মণিমাসির কথাগুলি তো কথা নয় ; উষাপাহাড়ের আগুনটার যত ফুলকি, ছুটে এসে শুক্তির মাথার উপর কুচি-কুচি জ্বালার মত ঝরে পড়ছে।

শক্ত কথা সামলাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন মণিমালা। শুক্তি এগিয়ে এসে মণিমালার দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে। শুক্তির বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাস যেন ক্ষেপে উঠেছে।—আমি ছাড়বো না, বলতেই হবে মণিমাসি, কি দোষ করলাম আমি ?

মণিমাসি—আর কত বলবো ?

শুক্তি—না, আরও বল। আমাকে বুঝিয়ে দাও।

মণিমাসি—তুমি বুঝে দেখ।

শুক্তি—আমি বুঝতে পারছি না।

মণিমাসি—অনিমেষকে ভাল লাগে ?

শুক্তি—হ্যাঁ।

মণিমাসি—শ্যামলকে ভাল লাগে ?

শুক্তি—হ্যাঁ।

মণিমাসি—লজ্জার কথা। তুমি ভুল করে তোমার মনটাকে নষ্ট করেছো।

হঠাৎ শান্ত হয়ে যায় শুক্তি। মণিমালার হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু হাত তুলে আর খোঁপাটাকে বাঁধতে পারে না। দুঃসহ একটা লজ্জার ভারে ভারী হয়ে গিয়েছে হাত দুটো। সে লজ্জা শুক্তির গলার স্বরেও একটা যন্ত্রণার আত্মবিলাপের মত বেজে ওঠে।—বুঝতে পেরেছি মণিমাসি ; কিন্তু আমি ইচ্ছে করে ভুল করিনি।

মণিমালার চোখ-মুখ এইবার যেন অদ্ভুত এক উতলা করুণতায় ভরে যায়। শুক্তির হাত ধরে টানতে থাকেন মণিমালা।—আয়, চোখমুখ ধুয়ে নিয়ে আমার কাছে একটু বসবি, আয়।

চোখ-মুখ ধুয়ে মণিমালার কাছে চুপ করে বসে থাকলেও শুক্তিকে ঠিক আর সেই শুক্তির মত দেখায় না। ঝড়বৃষ্টির পর ভারতীর বাগানের ছোট কামিনী গাছটাকে যেমন দেখায়, শুক্তিকেও প্রায় সেই-রকম দেখায়; শান্ত অথচ এলোমেলো। সবই তো বুঝতে পারা গেল, মনটা তাই শান্ত। কিন্তু এর পর যে কি হবে, বুঝতে না পেরে প্রাণটা এলোমেলো।

রাতের কাজ শেষ হবার পর জপের মালা হাতে নিয়ে ছাদে ওঠেন কালোর মা। শুক্তিও ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মণিমালা আপত্তি করেন, না না না, যাসনি শুক্তি। কিন্তু শুক্তি হাসে।—সত্যি আমার খুব ভাল লাগে, তুমি মানা করো না, এখনই চলে আসবো।

যেন চেনা-আকাশের তারা খুঁজছে শুক্তির চোখ। দেখতেও অসুবিধে নেই। দুটো তারা জ্বলছে।

ভালই করলেন মণিমাসি। ভুল বুঝিয়ে দিতে গেয়ে কিছু বলতে আর বাকি রাখেননি। বরেন ঘোষের মেয়ে! যেটুকু বলতে বাকি ছিল, সেটুকু ওই একটি তুলনার কথা দিয়ে একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

বরেন ঘোষের মেয়ের গল্প করতে গিয়ে মীরা কাকিমা যে-কথাটা বলেছিলেন, সে-কথাটাও কী ভয়ানক একটা স্পষ্ট কথা, ডবল প্রেম। শেফালিকা ঘোষ শিলংয়ে থাকতে দুজনকে ভালবেসে শেষে একটা বিশ্রী মামলার কাণ্ড বাধিয়েছিল। আদালতে একটা ফটো দাখিল করেছিলেন উকিল; দু'হাতে দুজনের হাত ধরে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে শেফালিকা ঘোষ।

সেদিন শেফালিকা ঘোষের গল্প শুনে শিউরে উঠেছিল শুক্তি। আজ নিজের কথা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠতে হয়। কেউ যদি আজ এখন চুপি-চুপি এখানে এসে শুক্তির একটা ফটো তুলে নিয়ে চলে যায়,

তবে সেই ফটোতেও দেখতে পাওয়া যাবে, চেনা-আকাশের দুটো তারার দিকে তাকিয়ে শুক্তি বসুও দাঁড়িয়ে আছে।

লজ্জা পেলে তো সত্যটা আর মিথ্যে হয়ে যাবে না। গোলাপকে যে নামে ডাক, শুক্তি বসুর এই আপত্তি-নেই মনটা যে ভালবাসারই মন। বুঝতে চেষ্টা না করে, আর ভুলে থাকতে চেষ্টা করে, কিংবা লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে কি এই ছাই অদ্ভুত মনের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায়? যায় না, যাবেও না। একটা মামলার আদালত যদি এখনই এসে শুক্তির গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়ে বলে যে, মরবার আগে সত্যি কথাটা স্বীকার করে যাও, তবে তো বলতেই হবে, হ্যাঁ, এখনও আপত্তি নেই। শ্যামলবাবুর জন্মদিনে একটা ফুলের তোড়া পাঠাতে, আর অনিমেষবাবুর সঙ্গে বিলের জলের নীলপদ্ম দেখতে যেতে একটুও খারাপ লাগবে না।

দোতলার বারান্দার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মণিমালা ডাকলেন—আর দেরি করো না, শুক্তি। এবার চলে এস।

এ-ছাড়া মণিমালার মনের মায়াটার যে আর কোন কাজও নেই। আশা করবার কিছু নেই; শুক্তিকে শুধু যত্ন করে আর সাবধানে আগলে রাখতে হবে, যতদিন এখানে থাকতে চাইবে ওর মন।

সব চেয়ে কষ্ট হয় তখন, যখন বুঝতে পারেন মণিমালা, কিরণদিকে আর লিখে জানাবার মত কিছু নেই। আর কিছু লেখবার দরকারও হয় না। কিরণদি এবার তাঁর মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই সব বুঝে নিতে পারবেন। তবু কষ্ট হয় বইকি। গগনবাবুর কথা ভেবেও কষ্ট হয়। কিরণদিরও যে বার বার শুধু এই কথাটাই মনে হবে, শুক্তিকে নিজের মেয়ের মত মনে করে যে-দুটি মানুষ শুক্তির ভাল করতে চেয়েছিল, তাদের আর কিছুই চেষ্টা করবার রইলো না। শুক্তিই তাদের চেষ্টার হাত ভেঙ্গে দিয়েছে। কিরণদির এই বয়সের জীবনে এটা কি একটা কঠিন আঘাত হয়ে বাজবে না?

কলম হাতে তুলে নিয়েও কিছু লিখতে পারেন না মণিমালা,

একটিও কথা না লিখেও হাতটা যেন ক্লান্ত হয়ে যায়। তবু লিখে ফেললেন—আমি আর কিছু লিখতে পারছি না, কিরণদি। কিছু মনে করো না। তুমি শুক্তিকে জিজ্ঞেসা করে সব জেনে নিও।

ভাঁজ করা চিঠিটাকে খামে বন্ধ করতে গিয়ে আবার একটু ভাবেন মণিমালা। তারপর চিঠির ভাঁজ খুলে আবার লিখতে থাকেন।—না, চিন্তে করবার কিছু নেই, কিরণদি। শুক্তির শরীর এখন বেশ ভাল আছে। আরও ভাল হবে। আরও কিছুদিন, অন্তত পরীক্ষার ফল বের হওয়া পর্যন্ত শুক্তি আমার কাছেই থাকুক।

নেফার পাহাড়ের মাথায় মাঝে মাঝে কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। এক-আধ পশলা বৃষ্টি আশা করছে তপ্ত শহর তেজপুর। শুক্তিও আশা করে; আর দেরি নেই বোধহয়, এইবার পরীক্ষার ফল বের হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর?

শুক্তি বলে—তারপর আর দেরি করো না মণিমাসি; মা'র চিঠি আমাকে যেতে বলুক আর না বলুক, তোমার ইচ্ছে হোক বা না হোক, আমাকে কদমবাড়ি পাঠিয়ে দিও।

মণিমাসি—তাই হবে গো মেয়ে। আমি তো একটা মাসি মাত্র, ইচ্ছে থাকলেও কত আর ধরে রাখতে পারবো।

সেদিনই কলকাতা থেকে সুমিত্রা সরকারের একটা চিঠি পেলেন মণিমালা,—শুক্তিকে বলবেন, আর সাতদিন পরে পরীক্ষার ফল বের হবে।

—তবে আর কি? মাসির বকা-ঝকা থেকে রেহাই পেয়ে আর সাতদিন পরেই হাঁপ ছাড়বি, শুক্তি।

শুক্তি হাসতে চেষ্টা করে।—তুমি ওরকম করে মিথ্যে কথা বলো না, মণিমাসি। তুমি আবার কবে আমাকে বকা-ঝকা করলে?

মণিমাসির চোখ ছলছল করে।—করেছি বইকি। তুই হয়তো রাগও করেছিস, কিন্তু···।

শুক্তি হাসে।—এইবার কিন্তু আমি সত্যিই রাগ করবো, যদিও আগে কখনও রাগ করিনি।

মণিমাসি—তোকে চলে যেতে দিতে সত্যিই আমার একটুও ভাল লাগছে না।

শুক্তি—কি আশ্চর্য, আমি যেন আর তোমার কাছে আসবোই না, তুমি এরকম একটা মিথ্যে ধারণা করে যা-খুশি-তাই ভাবছো।

মণিমাসি—না না, কিছু ভাবছি না। যাট, আসবি বইকি; যখন ইচ্ছে হয় তখনই চলে আসবি। তবে···।

শুক্তি—কি?

মণিমাসি—তবে, পরীক্ষার ফল বের হবার পর আরও পাঁচ-দশটা দিন তোকে এখানে আটকে রাখলে কিরণদি কিছু মনে করবেন না বোধহয়।

শুক্তি হাসে।—সেটা তুমি জান, আর তোমার দিদি জানে।

কিন্তু পরের দিন সকালবেলা মণিমাসির মনের এই মায়ার বিলাপ যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে, জব্দ হয়ে যায়, আর বোবা হয়ে ছটফট করে। এখনই শুক্তির কাছে ছুটে গিয়ে বলে দিতে ইচ্ছে করে, না, তোর এখন আর এখানে থাকতে হবে না, থেকে কাজ নেই, থেকে লাভ কি, থাকা উচিত নয়, তুই আজই কদমবাড়ি চলে যা।

বলে দিতে ইচ্ছে করলেই কি বলতে পারা যাবে? শুক্তি কি একটু আশ্চর্য হয়ে যাবে না? তারপর হঠাৎ যদি মেয়েটা মুখ খুলে বলেই দেয়—তুমি যেন তোমার মান বাঁচাবার জন্যে সাবধান হয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছো, মণিমাসি; তবে সে কথাটা সহ্য করবেনই বা কেমন করে? কিন্তু সেটা তো খুব-একটা মিথ্যে কথা হবে না।

সোম লজের মালী এসে মণিমালাকে খবর দিয়েছে; মা আপনাকে বলতে বললেন, শিলিগুড়ি থেকে দাদাবাবু কাল এখানে পৌঁছবেন।

তারপর? তারপর যা হবে সেটা কল্পনা করতেও অসুবিধে নেই। অনিমেষ নিজেই এখানে আসবে। শুক্তির সঙ্গে কথা

বলবে। শুক্তি কথা বলবে। যে-কথা আর যেমন কথাই হোক না কেন, সে-সব কথার তো কোন মানে হতে পারে না। দেখতে ও শুনতে বড় জোর একটা ভাল থিয়েটারের মত লাগবে, এই মাত্র। অনিমেষ তেজপুরে পৌঁছবার আগেই শুক্তির কদমবাড়ি চলে যাওয়া ভাল।

কিন্তু সে-কথা বলতে হলে যে মণিমালার বুকের ভিতরে একটা লজ্জা মাথা খুঁড়ে মরতে চাইবে। জীবনে কোনদিন শুক্তিকে একথা বলবার দুর্ভাগ্য হয়নি মণিমালার, তুই এবার চলে যা, শুক্তি। আজ কি সেই ভয়ানক নিষ্ঠুর কথাটা বলতে হবে?

দেখতে পাননি মণিমালা, শুক্তি কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে। মণিমালার গলার স্বর ছটফট করে।—কি শুক্তি? কি বলছিস, লক্ষ্মী মা?

শুক্তি—পরীক্ষার ফল তো আর ছ'দিন পরে বের হবেই, সবাই জানতেও পারবে।

মণিমাসি—হ্যাঁ।

শুক্তি—কিন্তু আমি তার আগেই কদমবাড়ি চলে যাই না কেন? পরীক্ষার ফল জানবার জন্যে আমায় আর এখানে না থাকলেও তো কিছু আসে যায় না?

মণিমাসি—যেতে চাস?

শুক্তি—হ্যাঁ। রাজবাহাদুর কোথায়?

মণিমাসি—কেন?

শুক্তি—আমি আজই কদমবাড়ি যাব। রাজবাহাদুরকে গাড়ি বের করতে বল।

মণিমাসি—এখনই রওনা হতে চাস নাকি?

শুক্তি—হ্যাঁ।

[পনের]

কদমবাড়ির চা-কলমের গায়ে কচি পাতা ধরেছে। নেফার পাহাড়ের মেঘ বার বার অনেকবার ভেসে এসেছে আর গুঁড়ো বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে। আবার রোদ উঠেছে। আষাঢ়ের এই ফাঁকা চেহারা যে আর বেশিদিন থাকবে না, তারই আভাস দিয়ে কদমবাড়ির আকাশে ঘোর মেঘলা আবেশও মাঝে মাঝে কালো হয়ে ওঠে।

বুলডগ মহারাজা কতবার শুক্তির কাছে এসে ছুটোছুটির হাতছানি দেখবার জন্যে ছটফট করে, শুক্তির শাড়ির আঁচল কামড়ে ধরে টানাটানিও করে। কিন্তু সাহেবকুঠির মেয়ে শুক্তি শুধু চুপ করে বসে থাকে। কখনও বারান্দার এককোণের একটি মেহগনির চেয়ারে, কখনও লনের পাশে কংক্রীটের ছোট বেদিটার উপরে, কিংবা পুরনো পিলখানার সামনে বকুলের ছায়ার কাছে রাখা পদ্মকাটা পাথরটার উপর, যেটাকে পঞ্চাশ বছর আগে পাব্লিক ওয়ার্কসে চীফ ইঞ্জিনীয়ার রবার্টসন ভালুকপংয়ের কাছাকাছি পুরাকালের একটা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে কুড়িয়ে আর হাতি দিয়ে টানিয়ে এনে এখানে রেখেছিলেন।

কিরণলেখা বলেন—তোকে একটা কথা একটু বুঝিয়ে বলবার ছিল শুক্তি।

শুক্তি—বল।

কিরণলেখা—বলবোই তো, কিন্তু এটা কি? তোমার নতুন শখ, না নতুন বাতিক?

শুক্তি—কি?

কিরণলেখা—তোমার গায়ের এই শাড়ি? একেবারে সাদা একটা গরদ।

নেহাতই সাদা একটা গরদ, পাড়ও নেই। এ যেন এই বয়সের জীবনের সব রঙ ধুয়ে-মুছে দিয়ে একেবারে একলা হয়ে থাকবার

একটা ইচ্ছার সাজ। লনের এক পাশে সবুজ ঘাসের উপর নিথর ও শান্ত একটি সাদা অস্তিত্ব হয়ে বসে আছে শুক্তি। শুক্তিকে দেখতে তো একটুও খারাপ দেখায় না; তবু কিরণলেখার দেখতে ভাল লাগে না। চোখে পড়তেই তাঁর চোখের চশমার কাচ বেশ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে; তাই এগিয়ে এসেছেন আর প্রশ্ন করেছেন।

শুক্তি হাসে।—খারাপ দেখাচ্ছে?

কিরণলেখা—না, খারাপ দেখাবে কেন? কিন্তু ভাল দেখাচ্ছে না।

শুক্তি—আমি তো ভাল দেখাবার জন্যে সাদা গরদ পরিনি।

কিরণলেখা—তবে কেন পরেছিস?

শুক্তি—ভাল লাগলো, তাই পরেছি।

আর কথা না বাড়িয়ে, শুধু শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মনের প্রশ্নটাকে মনের মধ্যেই চেপে রাখেন কিরণলেখা। বলতে ইচ্ছে করে, আজ হঠাৎ তোমার কেন ভাল লাগছে এই সাদা সাজ? কী এমন ব্যাপার হলো যে, এত শান্ত হয়ে বসে থাকতে হবে? কিসের এত ক্লান্তি যে, এত কম কথা বলতে হবে? সবই যে নতুন বাতিক বলে মনে হয়।

কিরণলেখার চোখে চশমার কাচ ঝাপসা হবেই বা না কেন? বেণী নেই, মস্ত বড় একটা খোঁপা, তার উপর এই সাদা গরদ; এ যেন অন্য একটা মেয়ে, শুধু মুখটা শুক্তির মত। একটা বছরও পার হয়নি, এত হাসি-খুশি আর এত দুরন্ত মেয়েটাকে কে যেন মনে-প্রাণে আর চেহারাতেও একেবারে অন্যরকম করে সাজিয়ে কদমবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মাঝে অবশ্য একটি দিন, যেদিন শুক্তির পাসের খবরটা নিয়ে কলকাতা থেকে সুমিত্রার চিঠি এল, সেদিন খুব খুশি হয়ে হেসেছিল শুক্তি।—আঃ, আমার কী ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন কেটে গেল, মা।

—কি বললি?

—তিনটে মাস ধরে সমস্তক্ষণ ভয়-ভয় করেছে; শুধু মনে হয়েছে, ফেল করলে বড় পিসির মনে কী কষ্টই না হবে।

গগন বসুও না হেসে থাকতে পারেননি :—সুমির কাছে থাকলে কারও কি লেখাপড়া না শেখবার সাধ্যি আছে?

কিরণলেখাও খুশি হয়ে হাসেন।—আসল কথা হলো শুক্তির ভাগ্য। শুক্তিকে একটু হিংসে করলে মন্দ হয় না।

গগন বসু—কেন বল তো?

কিরণলেখা—সুমিত্রার মত পিসি আর মণিমালার মত মাসি থাকতে শুক্তির আর ভাবনা কিসের? পিসির যত্নে বি-এ পাস করা হলো, আর মাসির যত্নে রোগা চেহারা দু'মাসেই ভাল হয়ে গেল।

গগন বসু—ঠিক কথা। শুক্তির মণিমাসির স্নেহচ্ছায়ায় থাকলে কি কারও রোগা হয়ে থাকবার সাধ্যি আছে?

কিরণলেখা—ঠাট্টা করছো কেন? মণি বেচারা এমন কিছু মোটা নয়।

কদমবাড়ির সাহেবকুঠির জীবনে সুখী কলরবের সেই দিনটির পর পুরো ত্রিশটা দিন পার হয়ে গেলেও কিরণলেখা কিন্তু এখনও শুক্তির কাছে সেই কথাটা আজও বলতে পারেননি, যে-কথা শুক্তির জীবনের একটি সুখী উৎসবের ইচ্ছার কথা।

বলতে গিয়েও অনেকবার কুণ্ঠিত হয়ে চুপ করে গিয়েছেন কিরণলেখা। শুক্তির চোখ দুটো যেন দুটো চোখ মাত্র, তার মধ্যে কোন ভাবনা আর কল্পনার চঞ্চলতা নেই। দুরন্তপনার সেই ছটফটে মেয়ের এত শান্তপনা দেখতে একটুও ভাল লাগে না কিরণলেখার। সুমিত্রার আর মণিমালার চিঠির অমন শুকনো হতাশ-উদাস ভাষাও ভাল লাগেনি। কিরণলেখার শুধু মনে হয়েছে, আর মনে হতেই বেশ একটু আশ্চর্যও হয়েছেন যে, সবাই যেন চোখের ভুলে মিথ্যে একটা কালোছায়া দেখে ভয় পেয়েছে আর গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। না, মোটেই না; সাদা গরদ পরতে ভাল লাগবে শুক্তির, এমন কোন অপরাধ করেনি শুক্তির মন।

তাই কিরণলেখা যেন একটা সুখী লগ্নের অপেক্ষায় আছেন। বোধ হয় কামনা করেন কিরণলেখা, রাতের আকাশের মেঘ হঠাৎ

একটু ভেঙ্গে যাক, মুখঢাকা চাঁদটা একবার ঝিক করে হেসে উঠুক, কদমবাড়ির অন্ধকারের গায়ে একটু জ্যোৎস্না ঝরে পড়ুক, আর সাহেবকুঠির বারান্দার কোচের উপর বসে আর গুনগুন করে গান গেয়ে ফেলুক শুক্তি; তখনই শুক্তির কাছে গিয়ে বসে আর হেসে-হেসে কথাটা তুলতে পারবেন কিরণলেখা। বলে দিতে পারবেন, না, তোমার এত গম্ভীর হয়ে যাওয়ার মত কিছুই হয়নি। এরকম হয়েই থাকে! ওটা একটা সমস্যাই নয়; কোন গিঁট নয়, কাঁটা নয়, ময়লা ধুলোও নয়।

আজ থাক্ তবে। আজ এখন এই লনের ঘাসের উপর চুপ করে বসে থাকুক শুক্তি। যদিও বিকেল ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু এমনই একটা ঘন মেঘলার দিন যে, পশ্চিমের আকাশে একটা লালচে আভার রেখাও ফুটে উঠতে পারেনি। আজ এ-সময় কথাটা তুলতে গেলে শুক্তির চোখ দুটোও বোধহয় ভয় পেয়ে মেঘলা হয়ে যাবে, মুখ ফিরিয়ে নেবে, হয়তো কোন কথাই বলবে না।

সন্ধ্যা হতেই সাহেবকুঠির সব ঘরে যখন আলো জ্বলতে শুরু করে, তখন বারান্দার চেয়ারে বসে অফিসের হিসাবের খাতায় সই করেন গগন বসু। তারপর পাইপ ধরান। তারপর খবরের কাগজটাকে তুলে নেন।

বৃষ্টি নেই, শুধু ফুরফুরে হাওয়া। সাহেবকুঠির একটি ঘরের রঙীন কাপড়ের পর্দা ফুলে-ফেঁপে কাঁপতে থাকে। সে-ঘরের বিছানার উপর বসে আর কোলের উপর একটা বই রেখে আনমনার মত কি-যেন দেখতে থাকে শুক্তি। তারপর কি-যেন শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে।

গগনবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন কুমুদ ডাক্তার। গগন বসু হাসছেন —তা আপনি আর কী করবেন? আপনিও ওইরকম দু-একটা কথা বলে ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে রাখুন।

কুমুদ ডাক্তার—তা তো বলছিই; সব সময় বলছি; কিন্তু মানতে কি চায়? মুন্সী চাপরাশি দফাদার কামদার সরদার, যাকে দেখতে পাবে, তাকেই ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, হ্যাঁ গো, বুমলা জায়গাটা

কোথায় ? এখান থেকে কত দূরে ? এবেলা গিয়ে ওবেলা ফিরে আসতে পারবো তো ?

গগন বসু—ওরা কী জবাব দেয় ?

কুমুদ ডাক্তার হাসেন।—আমি ওদের সবাইকে যা শি য়ে দিয়েছি, তাই ওরা বলে দেয় ওই তো ওখানে, চারত্নয়ারের াছে বুমলা। মুড়ি-মুড়কি আর কইমাছ, সব কিছুই সেখানে পাওয়া যায়। তবে, এখন সেখানে যেতে অসুবিধা আছে। পথের উপর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, কাউকে যেতে দেয় না।

গগন বসু—সুজিতের চিঠি-পত্র পাচ্ছেন ?

কুমুদ ডাক্তার—পাচ্ছি। কিন্তু সে-সব চিঠি লুকিয়ে রাখতে হয়।

গগন বসু—কেন ?

কুমুদ ডাক্তার—না লুকিয়ে উপায় কি ? সুজিতের কাকিমার হাতে সে-চিঠি পড়লে কি তা আর বুঝে ফেলতে কিছু বাকি থাকবে ?

গগন বসু—কী লেখে সুজিত ?

কুমুদ ডাক্তার—আমি ভাল আছি, শুধু এই একটি কথা লিখলেই তো কোন গোলমালের ভয় থাকতো না। কিন্তু হেন তেন অনেক আজে-বাজে কথা লেখে।

গগন বসু—আজে-বাজে কথা ?

কুমুদ ডাক্তার—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার, যেন কোন প্রাণের বন্ধুকে খবর জানতে চাইছে, সেইরকমের যত সব কথা। খুব ভাল জায়গা বুমলা। খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর ওদের পোস্ট। মাসে একবার করে হেলিকপটর উড়ে এসে ওদের চাল-ডালের বস্তা ড্রপ করে দিয়ে চলে যায়। রাত্রি-বেলায় পাহারার সময় মাথার লোহার টুপির ওপর এক ইঞ্চি পুরু বরফ জমে যায়। খবর পাওয়া গিয়েছে, চীনারা আমাদের সীমানার লাইনের কাছে ঘুরঘুর করছে।

খবরের কাগজটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গগন বসু বলেন। —হ্যাঁ, আজ দেখছি, কাগজেও একথা বলছে।

কুমুদ ডাক্তার—একদিন পেট্রলে বের হয়ে হঠাৎ একটা কস্তুরী হরিণ দেখতে পেয়েছিল সুজিত। কিন্তু ধরতে পারেনি।

গগন বসু—হ্যাঁ, শুনেছি, তোয়াং-এর কাছে পাইনের জঙ্গলে কস্তুরী হরিণ পাওয়া যায়।

কুমুদ ডাক্তার—এখন বলুন স্যার, এসব জানতে পেলে কি আর কিছু বুঝতে বাকি থাকবে ওর কাকিমা, রুমলা কোথায়? মানুষটা একটু বোকা বটে, কিন্তু খুব বোকা তো নয়।

ফুরফুরে হাওয়াটা এতক্ষণে বেশ একটু উতলা হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের যত শিরীষ মাথা দোলাতে শুরু করেছে। শুক্তির ঘরে ঢুকে আর আয়নার তোয়ালেটাকে হাতে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন কিরণলেখা। কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন।

কিরণলেখা হাসেন।—তোর হাতে ওটা কিসের বই, শুক্তি?

শুক্তি—এটা একটা বই···একটা গল্পের বই···না না, এটা একটা ছবির বই, এভারেস্টের ছবি।

যাই হোক, বইয়ের পাতায় এভারেস্টের ছবি যত সাদা হোক না কেন, শুক্তির মুখটা যে রঙীন হয়ে হাসছে। এগিয়ে এসে শুক্তির বিছানার উপর বসেন কিরণলেখা।—কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় শ্যামলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

শুক্তি—না।

কিরণলেখা—তেজপুর থেকে আসবার আগে অনিমেষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

শুক্তি—না।

কিরণলেখা—কিন্তু তোর তো নিশ্চয় ইচ্ছে হয়েছিল, দু'জনের কেউ একজন এসে দেখা করুক।

শুক্তি—কি বললে?

কিরণলেখা—শ্যামল হোক, কিংবা অনিমেষ হোক, যাকে দেখতে পেলে তোমার বেশি ভাল লাগে···।

শুক্তি—না না, এসব কথা বলো না। আমি তোমার কথার কোন মানে বুঝতে পারছি না, পারবোও না।

কিরণলেখা—তা হয় না শুক্তি।

শুক্তি—কি হয় না?

কিরণলেখা—দু'জন কখনও সমান হয় না। আর, দু'জনাকে কখনও সমান ভাল লাগে না।

শুক্তির মাথাটা ঝুঁকে পড়ে যেন সাদা এভারেস্টের ছবির মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু কিরণলেখা আজ বোধহয় শুক্তির প্রাণেরই হেঁট-মাথা ভঙ্গীটাকে একেবারে মিথ্যে করে দেবার জন্য তৈরী হয়েছেন। কিরণলেখা বলেন—লজ্জা করবার কিছুই নেই, শুক্তি। দু'জনের সঙ্গে চেনাশোনা হয়েছে, দু'জনকে ভাল লেগেছে, ভালই হয়েছে। ওতে কিছু আসে যায় না। ওরকম হয়েই থাকে। কিন্তু···।

শুক্তির আরও কাছে এগিয়ে এসে, শুক্তির মাথায় হাত রেখে কিরণ-লেখা বলেন—শুধু একটু বুঝে নিতে হয়, কাকে বেশি বেশ লাগে। এই যে তোমার বাণীকাকিমা, সে মেয়ে কী করেছিল, শুনবে? দু জায়গা থেকে বাণীর বিয়ের কথা এসেছিল। দু'জনেই ভাল ছেলে। কিন্তু বাণী বলেছিল, প্রণব বসুকে বেশি ভাল বলে মনে হয়। কাজেই তোমার প্রণবকাকার সঙ্গে বাণীর বিয়ে হয়ে গেল।

কিরণলেখার মুখের দিকে দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকে শুক্তি। শুক্তির মাথায় হাত বুলিয়ে কিরণলেখা বলতে থাকেন —তোমার অসুবিধে তোমার বাণীকাকিমার অসুবিধের চেয়ে একটুও কঠিন কিছু নয়। ওই দুই ছেলের কারও সঙ্গে বাণীর চেনা-শোনা ছিল না, আর তোমার সঙ্গে দু'জনের চেনা-শোনা হয়েছে, এই তো তফাৎ। তোমার তো বরং ভেবে নিতে ভুল হবার ভয় আরও কম, কাকে বেশি ভাল লাগে।

শুক্তি—তুমি এবার চুপ কর।

কিরণলেখা—চুপ করছি। কিন্তু বলবি তো? বলিস লক্ষ্মী, আমার কাছে বলতে তো কোন লজ্জা নেই।

শুক্তি—বলবো।

কিরণলেখা—কিন্তু বেশি দেরি করো না যেন। সুমিত্রা আর মণিকে একটু তাড়াতাড়ি চিঠি দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিলেই ভাল ; ওরাও তো ভাবছে।

চলে গেলেন কিরণলেখা। শুক্তির মনের ভিতরে যেন একটা দীপের আলো জ্বেলে দিয়ে চলে গেলেন। তা না হলে শুক্তির চোখে এমন একটা জ্বলজ্বলে হাসি এতক্ষণ ধরে ফুটে থাকতে পারতো না। এই কয়েকটা মাস নিজেকে একটা ভুলের অন্ধকার বলে বিশ্বাস করে যে লজ্জা পেয়েছে শুক্তি, সে লজ্জা যে একটা মিথ্যা ভয়ের অন্ধকার। মা'র কথাগুলি কত স্পষ্ট। কিন্তু এত স্পষ্ট করে বলে দিতে পারলেন বলেই তো শুক্তির মন এমন একটা সান্ত্বনা পেয়ে গেল। চেনা-আকাশে শুধু দুটো তারা ; শুক্তিকে শুধু একবার বলে দিতে হবে, কাকে বেশি লাগে। তা তো বলতেই হবে। অন্তত মা'র কাছে বলে দিতে কোন লজ্জা নেই।

কিন্তু মাঝরাতের ঘুম হঠাৎ ভেঙে যাবার পর আর ঘুম আসে না যখন, ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাওয়া যায় না যখন, তখন ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারে শুক্তি, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ভালবাসার আশাটা কাকে বেশি খোঁজে আর কাকে কম ; হিসেব করতে গেলে সবই এলোমেলো হয়ে যায়। সন্দেহ হয়, সবই মিথ্যে। শুক্তির জীবনের আকাশে ওরা দুজন হয়তো তারাই নয়।

কিন্তু অস্বীকার করবার যে সাধ্যি নেই। নীলপদ্মের গল্প শুনতে কি ভাল লাগেনি ? কৃষ্ণার হাত দিয়ে ফুলের তোড়া পাঠাতে গিয়ে মনটা কি খুশিতে ভরে যায়নি ? শুক্তির ঘুম-ভাঙা চোখের মত শুক্তির চিন্তার সব যুক্তি-বুদ্ধিগুলিও শুধু ছটফট করে ; কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারে না। এখন যদি শেষরাতের ঘুমটা হঠাৎ একটা স্বপ্ন এনে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে, কাকে বেশি ভাল লাগে! কিন্তু স্বপ্নের দোহাই দিয়ে তো জবাব দেবার দায় থেকে রেহাই পাওয়া যাবে

না। বলতেই হবে। ছি ছি, তবে কি লটারি করে ঠিক করতে হবে?

ধড়ফড় করে উঠে বসে শুক্তি। সাহেবকুঠির বারান্দায় যেন অনেকগুলি ছটফটে পায়ের শব্দ ঘোরাঘুরি করছে। টর্চের আলো জ্বলছে আর নিবছে।

শুনতে পাওয়া যায়, কথা বলছে মালী হরদেও, কথা বলছে দারোয়ান কপিলরাম। কথা বলছেন গগন বসু আর কিরণলেখা। শুক্তিও আশ্চর্য হয়ে আর ব্যস্তভাবে ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার এই সন্দেহের জটলার এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।

দারোয়ান কপিলরামের সন্দেহ; অনেকক্ষণ ধরে যে অদ্ভুত একটা ছায়া ঘুরঘুর করছিল পুরনো গ্যারেজের কাছে, সেটা এখন গ্যারেজের ভিতরে ঢুকেছে।

মালী হরদেও বলে—বন্দুকের আওয়াজ করুন, তা হলেই বের হয়ে আসবে।

কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ করতে হয়নি। একজন মানুষ হাসতে হাসতে পুরনো গ্যারেজের খালি ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এল। দারোয়ান কপিলরাম চেঁচিয়ে ওঠে।—মামাবাবু!

সত্যিই দুলাল দত্ত, শুক্তির দুলাল মামা এসেছেন। সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন দুলাল দত্ত।—সঙ্গে আমার একজন বন্ধুও এসেছেন কিনা, তাই তাঁকে পুরনো গ্যারেজের ওই খালি ঘরের ভিতরে রেখে এলাম।

গগন বসু—আপনার বন্ধু?

দুলাল দত্ত—ইয়েস স্যার।

কিরণলেখা উদ্বিগ্ন স্বরে কথা বলেন।—বন্ধুকে ওখানে কেন রেখে এলেন মেজদা? আপনার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না। এত রাত্রে আপনি এলেনই বা কোথা থেকে?

দুলাল দত্ত—নেফা থেকে। আমার আশ্রম থেকে। তা ছাড়া

আবার কোথা থেকে? কিন্তু তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না কিরণ, আমার বন্ধু চা খান না।

কিরণলেখার কাছে এগিয়ে এসে চাপা-স্বরে কথা বলেন গগন বসু। —আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, কিরণ, তোমার মেজদার মেজাজ স্বাভাবিক নয়।

কিরণলেখা—আপনি এখন বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, মেজদা।

দুলাল দত্ত—নিশ্চয়।

কিন্তু বারান্দার একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন দুলাল দত্ত। তার পর খুব জোরে একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকেন।—ব্যাপারটা কি জানেন, গগনদা? আমি একজন অবাঞ্ছিত, একজন আন-ডিজায়ারেবল। নেফা সরকার আমাকে নোটিস দিয়ে সাতদিনের মধ্যে নেফা ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। আমিও কলা দেখিয়ে তিনদিনের মধ্যে নেফা ছেড়ে বের হয়ে এসেছি। আর যাব না; ডেকে ডেকে মরে গেলেও, পায়ে ধরে সাধলেও যাব না।

গগন বসু—হঠাৎ এরকম একটা নোটিস কেন?

দুলাল দত্ত—ওই তো, ওরা ঠিক ধরে ফেলেছে, আমি একটা বাইরের মতলবের লোক; ট্রাইবাল বেচারাদের খাঁটি ধর্ম নোংরা করে দিচ্ছি। ওদের ঘরে ঘরে যত কেষ্ট বিষ্টুর ছবি বিলিয়েছি। বাস, আর কি রক্ষে আছে? ভাগো অবাঞ্ছিত, জলদি ভাগো।

কিরণলেখা মিনতি করে বলেন—মেজদা, আপনি এখন চুপ করে ওঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। যাও হরদেও, মামাবাবুকো বাত্তি দেখা কর লে যাও।

কিন্তু চেয়ার থেকে নড়েন না দুলাল দত্ত। এদিকে ওদিকে তাকান আর বিড়বিড় করেন। কী ভয়ানক শূন্য উদাস আর ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে দুলাল দত্তের দুই চোখ।

—উঠুন মেজদা। কিরণলেখা আবার অনুরোধ করেন।

দুলাল দত্ত—তোমাদের এখানে ভাল গিরগিটি পাওয়া যায়?…নাঃ,

আমি জানি পাওয়া যাবে না। আচ্ছা, গুডনাইট। আমি
কিরণ।

উঠে গিয়ে পুরনো গ্যারেজের সেই খালি ঘরের ভিতরে ঢুকলেন দুলাল দত্ত, যেখানে কিছুক্ষণ আগে তাঁর রহস্যময় এক বন্ধুকে রেখে এসেছেন।

কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে বেশ দেরি করছেন দুলাল দত্ত। গগন বসু এইবার উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন—কপিলরাম, তুমি গিয়ে দেখ একবার, কি করছেন মামাবাবু। আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে।

এগিয়ে যেয়ে, ঘরের ভিতরে টর্চের আলো ফেলেই আতঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কপিলরাম—খুন হুয়া হুজুর !

দুলাল দত্তের রোগা ছিপছিপে চেহারাটা অদ্ভুত কঠোর ও গম্ভীর একটা মূর্তি হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। হাতে একটা দা, কাদামাখা প্যাণ্টালুনে রক্তের দাগ, হাতেও ফোঁটা ফোঁটা রক্তের ছিটে। আর, ঘরের ভিতরে রক্তমাখা একটা বস্তার ভিতর থেকে একটা মস্তবড় চন্দ্রবোড়া সাপের গলাকাটা ধড় অর্ধেক বের হয়ে রয়েছে।

হাতের দা'টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর বেশ শান্ত স্বরে মালী হরদেওয়ের কাছে জল চাইলেন দুলাল দত্ত। হাত ধুয়ে নিয়ে বললেন—ওটা এতদিন আমার কাছে ছিল। যেখানেই যাক না কেন, ফিরে এসে আমার চং-এর নীচে একটা গর্তের ঘাসের ভিতরে শুয়ে থাকতো। ওর চামড়া দিয়ে বেশ ভাল জুতো হবে, জান তো হরদেও ?

আবার কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেন দুলাল দত্ত। তারপর সাহেব-কুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে চললেন। কপিলরাম ডাকে—মামাবাবু, শুনিয়ে !

কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে চলে গেলেন দুলাল দত্ত।

সাহেবকুঠির বারান্দায় আলোটা দপ দপ করে। স্তব্ধ হয়ে বসে

থাকেন গগন বসু আর কিরণলেখা। কথা বলতে গিয়ে শুক্তির গলার স্বর শিউরে ওঠে।—আমার যে খুব ভয় করছে, মা।

কিরণলেখা বলেন—না, ভয় কিসের ?

গগনবাবু বলেন—ভোর হয়ে এল বোধহয়।

[ষোল]

এটা আবার কিসের ভয় ? কি রকমের ভয় ? বুঝতে পারলে হয়তো এই ভয় ভেঙ্গে যেত। মনে হয়, তেজপুরের মণিমাসির বাড়ির কালোর মা'র মনটাও বোধ হয় ঠিক এই রকম ভয় পায়; একটা অলক্ষুণে সংকেত দেখবার ভয়। ভয়টা তখনই মনের ভিতরে ছমছম করে, মাঝরাতে যখন ঝুর-ঝুর বৃষ্টি শুরু হয়, আর ঘুম ভেঙে যায়।

মনে পড়ে, ছাদের উপরে জপের মালা হাতে নিয়ে এক-একদিন নিজের মনে কী সব অদ্ভুত কথা বলতেন কালোর মা।—তুমি অবিচার করবে আমার ওপর ; কিন্তু আমার দুঃখ যে একদিন তোমার বিচার করবে। সেটা ভুলে যাও কেন ?

নতুন পাড়ার মীরা কাকিমার কাছে শুনেছিল শুক্তি, কালোর মা'র স্বামী কলকাতার স্কুলের মাস্টার ছিলেন। কলকাতাতে তাঁর একটা বাড়িও ছিল। মিথ্যে মামলা করে একদিন বিধবা কালোর মাকে স্বামীর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দিল তাঁরই সেই দেবর, যাকে তার ছেলেবেলার জীবনে কোলে বসিয়ে ভাত খাওয়াতেন কালোর মা। সে দেবরের এখন ভিখিরী-দশা ; ঠোঙা বেচে, জুয়া খেলে আর ফুটপাতে শুয়ে থাকে।

হঠাৎ শুক্তিকে দেখতে পেয়ে যেন একটু লজ্জিত হতেন কালোর মা।—তুমি এখন নীচে যাও দিদিমণি। অনেক রাত হয়েছে। আমার আবোল-তাবোল কথা শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।

শুক্তি—কিন্তু আপনি ছাদে উঠে আর এই রাতের বেলাতে এখানে বসে ওসব কথা রোজই বলেন কেন ?

কালোর মা—ভয় হয়, তাই বলি। চুপি চুপি বলি। কাউকে শোনাবার জন্যে তো বলি না।

শুক্তি—সকলেই জানে, আমিও জানি; আপনি আপনার সেই কবেকার কলকাতার ভয়ের কথা মনে করে এসব কথা বলেন। কিন্তু আর বলে লাভ কি?

কালোর মা—শুধু কলকাতার কথা মনে করে নয় দিদিমণি, তোমাদের এই তেজপুরেরও যা-সব দেখছি আর শুনছি, মনে করলে ভয় হয় বইকি। যদি শুনতে চাও, তবে একটা গল্প বলতে পারি।

শুক্তি—বলুন!

কালোর মা—এক রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে চলেছেন। হঠাৎ কোথা থেকে একটা অতিক্ষুদ্র মৃগশাবক এসে রাজার পথের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলে, রাজপুত্র আমার মাকে হত্যা করে মাংস খেয়েছে। আমি এখনও ঘাস খেতে শিখিনি রাজা, মায়ের দুধই আমার বেঁচে থাকার সম্বল ছিল। এখন আমি বাঁচি কি করে? আপনি বিচার করুন। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার বেঁচে থাকবারই দরকার নেই। রাজা তখুনি তরবারির এক কোপে মৃগশিশুর প্রাণসংহার করলেন। কিন্তু শেষে কি হলো শুনবে, দিদিমণি?

—শুনবো।

—শত্রুকে সংহার করবার জন্যে তরবারি তুলতে গিয়েই রাজা বুঝলেন, তরবারিটা যেন সাত-মণ পাথরের মত ভারী। তরবারি তুলতে পারলেন না রাজা, হাতটাই ভেঙে গেল। শত্রুরা হেসে হেসে রাজার মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে গেল।

শুক্তি হেসে ফেলে।—বুঝতে পারছি না, এটা কিসের গল্প বললেন, কালোর মা?

কালোর মা—অবিচারের গল্প। রোজই ঠাকুরের কাছে এই ভয় নিবেদন করি আর বলি, অবিচার দূর কর ঠাকুর।

চুপ করে আবার মালা জপতে থাকেন কালোর মা।

আজ এখন এই কদমবাড়ির মাঝরাতের অবুঝ ভয়টাকে সহ্য করতে গিয়ে কালোর মা'কে মনে পড়ে, কালোর মা'র সব কথা আর সব গল্পও মনে পড়ে। তবু শুক্তির অবুঝ ভয়টা যেন ছায়া-ছায়া অস্বস্তির মত মনের আনাচে-কানাচে ঘুর-ঘুর করে, সরে যেতে চায় না।

সরে যায় তখন, শুক্তির ঘরে ঢুকে যখন আলো জ্বালেন কিরণলেখা।—শুক্তি, শুনছিস ?

—কি মা ?

—আমি জেগেই আছি। তুই ঘুমো।

এটা কিরণলেখার একটা নতুন অভ্যাস। সে-রাতের সেই ভয়ানক বিদ্‌ঘুটে ব্যাপারের পর রোজই একবার মাঝরাতে উঠে এসে শুক্তির ঘরে ঢোকেন আর আলো জ্বালেন কিরণলেখা।

ভাদ্দুরে মেঘের শেষ ঝরানি ফুরিয়ে যেতে কতদিনই বা লাগে ? বেশিদিন লাগেওনি। একদিন মাঝরাতেও যখন ঝুরু-ঝুরু বৃষ্টির কোন শব্দ আর শোনা গেল না, কদমবাড়ির চা-বাগানের উপর সিরসিরে শিহর ছড়িয়ে দিয়ে একটা উত্তুরে হাওয়া উড়ে চলে গেল, তখন শুক্তির বিছানার মাথার কাছের জানালার শার্সি একেবারে খুলে দিয়েই বলে উঠলেন কিরণলেখা—তারায় ছেয়ে আছে আকাশ। নেফার পাহাড়েও মেঘ নেই। শুক্তি ঘুমোচ্ছিস ?

আবার ঝলমলে আশ্বিনের দিন। ঘাসের শিশিরে সকালবেলার রোদ হেসে-হেসে চিক-মিক করে। উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে উড়ে উড়ে নেফার পাহাড়ের উপর দিয়ে নতুন হাঁসের ঝাঁক আসছে ; নামবে গিয়ে জিয়াভরলির জলে।

শুধু কদমবাড়ির আকাশে নয়, বোধহয় আলিপুরে শুক্তির বড়পিসি, আর তেজপুরে শুক্তির মণিমাসির মনেও মেঘের গুমোট ভেঙ্গে গিয়ে নতুন রোদের আলো হেসে উঠেছে ; তা না হলে কিরণলেখার কাছে ওরকম খুশি ভাষার দুটো চিঠি তাঁরা লিখতে পারতেন না।

সুমিত্রা লিখেছেন—আপনি আমার মনের খুব খারাপ একটা ভুল ভেঙে দিয়েছেন, কিরণ বউদি। এখন ভাবতে বেশ লজ্জাও

হচ্ছে! নিজের পছন্দমত কিছু না হলেই আমরা মনে করে বসি যে, সংসারটা বুঝি ভুল করছে। আপনি শুক্তিকে যা বলেছেন, তার চেয়ে ভাল কথা ও সত্য কথা আর কিছু হতে পারে না।

মণিমালা লিখেছেন—তোমার চিঠি আমার মিথ্যে দুশ্চিন্তার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছে। তুমি বুঝিয়ে দিলে বলেই তো বুঝলাম কিরণদি; তা না হলে আমার মূর্খ মন কোনদিনও বোধহয় বুঝতো না যে, ভুল করে মেয়েটাকে কত ভুল কথাই না শুনিয়েছি। শুক্তিকে দেখতে যে খুব ইচ্ছে করছে। খুব অন্যায় করেছি। ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি শুক্তিকে যে-কথা বলেছ, সেটাই তো খাঁটি কথা।

এরই মধ্যে কবে, সারাদিনের ঝলমলে রোদের ছোঁয়া পেয়ে শুক্তির সাজের চেহারা বদলে গিয়ে আবার রঙীন হয়ে গেল, সেটা শুক্তিও ঠিক হিসেব করে বলতে পারে না। গায়ে আবার ফিকে-নীল তাঁতের শাড়ি, কাঁধের উপর আ[illegible] হয়ে পড়ে আছে আর ঝুলছে কচি-সবুজ রঙের একটা হালকা উলের জামা। সাহেবকুঠির শিউলি গাছের ডাল নাড়া দিয়ে ফুল ঝরাতে গিয়ে শুক্তির হাতের উপর ফুলের সঙ্গে গাছের পাতার শিশির-জলও ঝরে পড়ে। শুক্তির চোখের তারাও কেঁপে কেঁপে হাসে। তবে কি এইবার শেষ কথাটা বলে দেবার জন্যে তৈরী হয়ে শুক্তির মন হাসতে শুরু করেছে? তাই তো মনে হয় কিরণলেখার। তাই জিজ্ঞাসা করতেও আর বেশি দেরি করেন না।—আর তো বেশি দেরি করা উচিত নয়, শুক্তি।

শুক্তি—কি?

কিরণলেখা—কি বুঝলে আর কি ঠিক করলে, এবার বলে দাও। লজ্জা করবার তো কিছু নেই।

শুক্তি কিন্তু বেশ লজ্জিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকায়।—পরে বলবো।

কিরণলেখা—তা বলো। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি বলো। কি হলো? হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আবার কি ভাবতে শুরু করলে?

শুক্তি—কিছু না।

কিরণলেখা—মনে হচ্ছে, বলতে খুব দেরি করবে?

শুক্তি—না না, শিগগিরই বলবো। দেরি হবে না।

কিরণলেখা চলে যাবার পর, সেই শিউলির ছায়ার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুক্তি যেন নিজেরই মনের যত এলোমেলো কথার শব্দ শুনতে থাকে। পিসেমশাইয়ের মক্কেলরা যেমন কৈফিয়ত দেবার জন্য সময় চেয়ে দরখাস্ত করে, শুক্তির প্রাণটাও যেন ঠিক সেরকম দরখাস্ত করে করে শুধু সময় চাইছে। এক-একবার মনে হয়, মা'কে এখনই স্পষ্ট করে একটা নাম বলে দিলেই তো হতো, শ্যামলবাবু। চিন্তা করবার সব ঝঞ্ঝাট মিটে যেত। কিন্তু তখুনি লজ্জা পেয়ে চমকে উঠেছে শুক্তির মন, ছি-ছি, বোধহয় একটা মিথ্যে কথাই বলে ফেলা হতো। এরকম করে না বুঝে-সুঝে হঠাৎ অনিমেষের নাম করলে সেটাও যে একটা তাড়াহুড়ো মিথ্যের কথা হবে না, তারই বা ঠিক কি?

বারান্দার সোফার উপর বসে থেকেই ডাক দিলেন গগনবাবু—ওখানে ওটা কিসের ভিড়, শুক্তি? কিছু বুঝতে পারছিস?

সাহেবকুঠি থেকে বেশ একটু দূরে, ম্যানেজার ব্যানার্জীর বাংলোর সামনে একটা চালতে গাছের ছায়া যেখানে ছড়িয়ে আছে, সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গী দেখে মনে হয়, ভিড়টা যেন উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনছে।

শুক্তি আশ্চর্য হয়।—বুঝতে পারছি না বাবা। কিন্তু কপিলরাম কেন দৌড়ে দৌড়ে আসছে?

কপিলরাম এসেই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলে।—নেফা পর হামলা শুরু হুয়া হুজুর। থাগলা'মে চীনালোগ আসাম রাইফেলকা চৌকি ঘির লিয়া।

গগনবাবু—কওন বোলা?

কপিলরাম—রেডিও বোলতা হ্যায়, হুজুর।

সাতদিন হলো কদমবাড়িতে খবরের কাগজ এসে পৌঁছয়নি। চারদুয়ারের কাগজওয়ালা বসন্তলাল, আট-দশদিনের কাগজ একসঙ্গে বাণ্ডিল করে হঠাৎ একদিন আগরওয়ালার ঠিকে-জঙ্গলের গাছ-কাটা

সরকারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়াই তার নিয়ম। তা ছাড়া, সরকারী ডাকঘরের ছাপ নিয়ে যে-কাগজটা আসে, সেটা খুব দ্রুত-গতিতে এলেও পাঁচদিন দেরি না করে আসবে না।

লোখরা থেকে শুধু মেজর পি. বোসের একটি চিঠি এল।—বাণী এখন শান্তিপুরে তার পিত্রালয়ে আছে। আমিও এখন স্ট্যাণ্ড-বাই অবস্থায় আছি, বউদি। নেফার গোলমাল বেড়েছে। আরও ফোর্স পাঠাতে হচ্ছে। খুব ব্যস্ত আছি। তাই শুক্তিকে এখন আর লোখরাতে বেড়াতে আসতে বলবো না।

লোখরার চিঠিটা পড়ে নিয়ে, আর গগনবাবুকেও একবার শুনিয়ে দিয়ে কিরণলেখা যখন শুক্তির ঘরে ঢুকলেন, তখন টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে শুক্তি। শুক্তির মাথার কাছে রেডিওটা তখন শুধু খুব চাপা-স্বরে একটা গান গাইছে। থাগলার খবর অনেকক্ষণ হলো শেষ হয়ে গিয়েছে।

—শুনছিস শুক্তি?

চমকে জেগে ওঠে শুক্তি।—কি মা?

—বাণী এখন লোখরাতে নেই।

—কোথায় তবে?

—শান্তিপুরে।

শুক্তি হাসে।—এবার তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি প্রণব কাকা।

কিন্তু ওরা আবার কারা, নতুন তিনজন আগন্তুক মানুষ, কপিলরাম যাদের পথ দেখিয়ে সাহেবকুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসছে?

একজনের তো গায়ের খাকি পোষাক দেখেই বোঝা যায়, উনি একজন পুলিশ অফিসার। ঢিলে-ঢালা বুশশার্ট আর ঢলঢলে ট্রাউজার, আর-দুজনের একজনের হাতে একটা ফাইল, একজনের হাতে চুরুট। এরাও অফিসার বোধহয়

তিনজনেই সাহেবকুঠির বারান্দায় উঠে গগন বসুর কাছে একে একে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করেন।

—আমি মেহরা, সি আর পি।

—আমি মতিলাল, সি আই বি।

—আমি কলিতা, এস আই বি।

গগন বসু আশ্চর্য হয়ে বলেন—বসুন।

আশ্চর্য হবারই কথা। একজন নেফা-পুলিশ, একজন খাস সেণ্টারের গোয়েন্দা পুলিশ, একজন সাবসিডিয়ারি গোয়েন্দা পুলিশ'; সাহেবকুঠির বারান্দায় একসঙ্গে এহেন তিন অফিসারের আবির্ভাব, একটা অভাবিত বিস্ময় বলেই তো মনে হবে।

নেফা-পুলিশ মেহরা তাঁর খাকি ক্যাপ তুলে মাথা চুলকিয়ে নিলেন। সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের মতিলাল ক্লান্তভাবে হাই তুলে নিলেন। আর এস-আই-বি'র কলিতা তাঁর নিবু-নিবু চুরুটে মুখ দিয়ে বেশ জোরে একটা টান দিলেন।

মতিলাল বলেন—ডক্টর সি. টি. এলগিনের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

গগন বসু—এলগিন? কে সে?

কলিতা—আপনি তাকে চেনেন না?

গগন বসু—না।

মেহরা—কিন্তু আমাদের ইনফরমেশন এই যে, এলগিন আপনার এই বাগানে অনেকদিন ছিল।

কলিতা—সে একজন স্পাই, আমাদের শত্রুর চর।

মতিলাল—নেফাতে ঢুকে সে লোকটা অনেক কিছু জেনে নিয়ে সরে পড়েছে।

গগন বসু ভ্রূকুটি করে তাকান।—বুঝলাম, স্পাই পালিয়ে যাবার পর আপনারা খুব অ্যাকটিভ হয়েছেন। ভাল কথা, কিন্তু এই অদ্ভুত ইনফরমেশন কোথা থেকে পেলেন যে, স্পাইটা আমার এখানে ছিল?

মেহরা—হাই কোয়ার্টার থেকে পাওয়া ইনফরমেশন, অদ্ভুত বললে তো চলবে না।

গগন বসু—আপনার হাই কোয়ার্টার মানে কি? মিনিস্টার?

মেহরা—তা তো বটেই, কিন্তু এক্ষেত্রে মিনিস্টারের একজন বিশেষ ট্রাস্টেড ও রেস্পেক্টেড ব্যক্তি। তিনিই বা অকারণে একটা মিথ্যে ইনফরমেশন দেবেন কেন, বুঝতে পারছি না।

গগন বসুর দুই চোখের তারা হঠাৎ যেন আগুন-রঙের ঝিলিক দিয়ে কেঁপে ওঠে। ভুরু দুটো কুঁচকে যায়। তামাকের পাইপটাকে হাঁটুর উপর একবার ঠুকে নিয়েই গগন বসু বলেন—একবার খোঁজ করে দেখুন, মিনিস্টারের এই ট্রাস্টেড ও রেস্পেক্টেড ব্যক্তিটি একটি স্কাউণ্ড্রেল কিনা?

মেহরা—আপনি বেশ উত্তেজিত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

গগন বসু—খোঁজ করে দেখুন, এই স্কাউণ্ড্রেলের নাম সুশান্ত মজুমদার কিনা?

—ওয়েল ওয়েল! দিল্লির আই বি'র মতিলাল চমকে উঠে নেফা-পুলিশ মেহরার মুখের দিকে তাকান। এস আই বি'র কলিতা তাঁর নিবু নিবু চুরুট শক্ত করে কামড়ে ধরে মতিলালের মুখের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকেন।

হঠাৎ হেসে ওঠেন মতিলাল।—তিন পিয়ালি চা ফরমাইয়ে মিস্টার বাসু।

কলিতা বলেন—আপনি কিছু মনে করবেন না, মিস্টার বাসু।

মেহরা বলেন—আর আপনাকে কিছু বলবার নেই, স্যার।

আবার হাই তুলে নিয়ে মতিলাল বলেন—দেখুন তো, মিছিমিছি কী পরেশানি। আমাদের সবারই সন্দেহ ছিল, মজুমদারের ইনফরমেশন বোধহয় একটা ব্লাফ। সে মহাশয়ের কিছু খবর তো রাখি। কিন্তু···।

গগন বসু—কিসের কিন্তু?

মতিলাল—কিন্তু কি করবো বলুন? মজুমদারের ম্যাজিক স্টিক যে দিল্লি শিলং গৌহাটি আর কলকাতাকেও ছুঁয়ে রয়েছে।

কলিতা—ধরুন, আপনি কাস্টমকে ফাঁকি দিয়ে বিদেশ থেকে দশ

লাখ টাকার ডিউটিয়েবল জিনিস আনছেন ; আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। মজুমদারকে বললেই চমৎকার ব্যবস্থা করে দেবে।

চা আসে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মেহরা বলেন—কোন্ এক বন্ধু-বিদেশের এমব্যাসি থেকে খবর পাওয়া গেল, বোটানিস্ট বলে নিজেকে পরিচিত করে আর ডক্টর এলগিন নাম নিয়ে একটা লোক নেফাতে ঢুকে নেফার যত লজিস্টিক আর মিলিটারী পোস্টের খবর নিয়ে সরে পড়েছে। তখন তো আর···।

গগন বসু হাসেন।—তখন আপনাদের হুঁস হলো।

মেহরা—আমাদের দোষ কোথায় বলুন ? সরকারের অর্ডার ছিল, এলগিনের সব সুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে। আমিই তো মশাই সে বেটাকে রোজ মুর্গী খাইয়ে খাইয়ে তোয়াং থেকে সেলা, সেলা থেকে দিরাং, দিরাং থেকে রূপা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি।

গগন বসু হাসেন।—জানি না, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। সরকারকে না আপনাদের সবাইকে ?

মতিলাল উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।—আচ্ছা! আচ্ছা! আপভি উপনিষদ পড় চুকেঁ ?

গগন বসু—জী হ্যাঁ, বহুত থোড়া।

মতিলাল—তব তো হমভি উপনিষদ বোলেঙ্গে।

গগন বসু—বোলিয়ে।

মতিলাল—অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ। জৈসা সরকার তৈসা অফিসার। জৈসা গাঁও তৈসা ভঁইস। আচ্ছা· ·গুড বাই।

চলে গেলেন তিন অফিসার। গগন বসুও ক্লান্তভাবে আর বেশ বিষণ্ন-উদাস স্বরে ডাক দেন।—শুক্তি, আমাকে একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াবি ?

[সতের]

তেজপুর থেকে মণিমালার তিনটে চিঠি পেয়েছেন কিরণলেখা। সব চিঠিরই সার-কথা, তেজপুরে চলে এস, কিরণদি।

মণিমালার শেষ চিঠিটা বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলছে।—বুঝতে পারছি না, গগনবাবুর শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল কেন? কুমুদ ডাক্তারের চিকিৎসায় কোন সুফল হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া নেফার খবরও ভাল নয়। কাজেই, তোমাদের সবারই এখন তেজপুরে চলে এলে ভাল হয়।

বেশ অসুস্থ হয়েছেন গগন বসু। সব সময় একটা কষ্টকর অবসন্ন ভাব। মাথাটা ভার-ভার, শ্বাস টানতেও একটা হাঁস-ফাঁস ভাব। আর, যখন-তখন পিপাসা। দশ মিনিট পর-পর জিভ শুকিয়ে যায়; ঠাণ্ডা জল খেতে চান গগন বসু।

হঠাৎ অসুস্থতা বটে; কিন্তু বুঝতে তো কোন অসুবিধে নেই, এই অসুস্থতা শুরু হয়েছে ঠিক সেইদিন থেকে, যেদিন পুলিশ আর গোয়েন্দা-পুলিশের তিন অফিসার এসে একটি ইনফরমেশনের রহস্য প্রকাশ করে দিয়ে চলে গেলেন।—মানুষ কত নীচ হতে পারে। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন গগন বসু।—আমার মনে হয়, কিরণ, তোমাদের ভগবানও স্কাউণ্ড্রেল সুশান্তকে ভয় করে।

কিরণলেখা—চুপ কর। শান্ত হও। জল খাও।

শুধু বিকেল পর্যন্ত, তারপর আর সাহেবকুঠির বারান্দার চেয়ারে বসে থাকতে পারেন না গগন বসু। যতক্ষণ রোদ থাকে ততক্ষণ একটু ভাল লাগে। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই যখন অক্টোবরের কুয়াশা নিবিড় হয়ে কদমবাড়িকে ছেয়ে ফেলে, তখন আর কিছু ভাল লাগে না। ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়েন।

শুক্তিও দেখে বেশ আশ্চর্য হয়। সন্ধ্যা হলেও বাগানের কামিনদের ঝুমুরের নাচ-গান আর হই-হল্লার সাড়া শোনা যায় না। মালী হরদেও হঠাৎ এক-একবার ব্যস্ত হয়ে ফটকের বাইরে কোথায় যেন চলে যায়;

আর কি-যেন শুনে মুখ শুকনো করে ফিরে আসে। সন্দেহ হয়, কুয়াশার ভিতরে যেন নানা রকমের জল্পনা আর কল্পনা চুপি-চুপি ফিস-ফাস করে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন সত্যিই যত মেচ আর ভোটিয়া মজুর-কামিন কাউকে কিছু না বলে পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় চাপিয়ে আর বাগান ছেড়ে চলেই গেল।

তার দু'দিন পরে চলে গেল সব দফাদার কামদার আর ডান্টি-চুনাই কামিন দল।

যেদিন সিটি বাজলো না, কলঘরের বয়লার নীরব হয়ে রইলো, সেদিন ম্যানেজার ব্যানার্জি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে গগন বসুর কাছে এসে দাঁড়ালেন।—খুব সন্দেহ হচ্ছে, স্যার।

গগন বসু—কি?

ব্যানার্জি—বাগানে কেউ আর থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।

গগন বসু—কেন? চীনারা কি কদমবাড়ির ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে?

ব্যানার্জি কুণ্ঠিতভাবে হাসেন।—না স্যার; সে-কথা নয়। কিন্তু মজুমদার সাহেবের লোক রোজই এসে বাগানের লোকের কাছে যে-সব খবর পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে তো··· ।

চমকে ওঠেন গগন বসু। গগন বসুর শুকনো চোখ দুটো হঠাৎ যেন রক্তমাখা হয়ে গিয়েছে, লালচে হয়ে কাঁপতে থাকে; গলার স্বরও কাঁপে।—বলুন, থামলেন কেন?

ব্যানার্জি—মনে হচ্ছে, খুব শিগগির কদমবাড়ির উপর চীনা হামলা এসে পড়বে। যারা থাকবে, তারা বিপদে পড়বে।

গগন বসু—আপনিও কি মজুমদারের লোকের কথা বিশ্বাস করেন?

ব্যানার্জি—লোকের কথা নয়, স্যার। মজুমদার সাহেব নিজে বলেছেন।

গগন বসুর চোখে একটা কঠোর ভ্রুকুটি থরথর করে।—কোথায় মজুমদার?

ব্যানার্জি—তিনি কদমবাড়ি রোডের উনিশ মাইলপোস্টে প্রায়ই আসেন। আমাদের কেরাণীবাবুকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। তাঁর মত মানুষের কথা তুচ্ছ করা কি উচিত হবে? ঘটনা খুবই জটিল, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, নয় কি স্যার?

গগন বসু—কিন্তু কী এমন একটা ওলট-পালট কাণ্ড হয়েছে যে, এখনই এত বিচলিত হতে হবে? খবর তো শুধু এই যে, থাগলাতে গোলাগুলী চলেছে।

ব্যানার্জি—সেটা তো জানি! কিন্তু বুঝতে পারছি না স্যার, তিলগাঁও রাজভাটি আর সরুবাড়ি বাগানের সব সাহেব কেন প্লেন চার্টার করে সপরিবারে সরে পড়েছেন।

গগন বসু—তাই নাকি?

ব্যানার্জি—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। আজ সকালে জিতনগর টি এস্টেটের ম্যাকফার্সন আমাদের এই কদমবাড়ি রোড দিয়েই গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেলেন।

গগন বসু—কিন্তু ম্যাকফার্সনের বাগান কি খালি হয়ে গিয়েছে?

ব্যানার্জি—না।

গগন বসু—তাহলে বলুন, শুধু কদমবাড়ি বাগান খালি হতে শুরু হয়েছে।

ব্যানার্জি—হ্যাঁ।

গগন বসু—আপনি কি আমার কাছে কোন পরামর্শ চাইছেন?

ব্যানার্জি—হ্যাঁ, স্যার।

গগন বসু—আমার কিছুই বলবার নেই। আপনি আসুন এখন।

ম্যানেজার ব্যানার্জির চোখ-মুখের চেহারা দেখলে মনে হয়, ভদ্র-লোকের সব যুক্তি-বুদ্ধি যেন জটিল একটা বিপদে পড়ে করুণ হয়ে গিয়েছে। গগন বসুর কথা শুনে তাঁর চোখ-মুখ আরও করুণ হয়ে যায়।—কিন্তু আপনারও তো এখন···।

গগন বসু—না, আমি কোথাও যাব না।

চলে গেলেন ব্যানার্জি। কিন্তু এই চলে-যাওয়া যেন ফিরে এসে গগন বসুকে শেষ কথাটা বলে দেবার জন্য তৈরী হওয়া।

তিনদিনের মধ্যে বাগানের সব লোকজনের মাইনে-কড়ির পেমেণ্ট চুকিয়ে দিয়ে ব্যানার্জি আবার যেদিন গগন বসুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সেদিন কদমবাড়ির সন্ধ্যার কুয়াশা নিরেট হয়ে গেল। অদ্ভুত স্তব্ধতা, তার মধ্যে ম্যানেজার ব্যানার্জি আর কুমুদ ডাক্তারের পায়ের জুতোর সামান্য শব্দও যেন অমানুষিক আগন্তুকের ভয়ানক পায়ের শব্দের মত বাজতে থাকে।

গগন বসুর ঘরে ঢুকে বিছানার কাছে দাঁড়ালেন ম্যানেজার ব্যানার্জি আর কুমুদ ডাক্তার। গগন বসু বলেন—আপনারা বোধহয় এখন রওনা হবেন ?

ব্যানার্জি—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি অনুমতি দিন, স্যার।

কুমুদ ডাক্তার—মিথ্যে কথা বলবো না, সত্যিই থাকতে খুব আতঙ্ক বোধ করছি। আপনি খুশি হয়ে আমাকে যেতে আজ্ঞা করুন স্যার।

গগন বসু হাসেন।—খুশি হয়েই বলছি, আপনারা চলে যান। যেদিন ফিরে আসতে ইচ্ছে হবে, সেদিন চলে আসবেন। ইচ্ছে না হয়, আসবেন না।

ব্যানার্জি—এই ক্যাশ ; সব পেমেণ্টের পর যা ছিল, সেটা এখন তো আপনারই কাছে রাখতে হয়, স্যার।

গগন বসু—রাখুন।

ম্যানেজার ব্যানার্জির আর কুমুদ ডাক্তারের চোখ ছলছল করে।—আপনি এখন···।

গগন বসু—আমি যাব না।

চলে গেলেন ব্যানার্জি আর কুমুদ ডাক্তার।

ঘরের বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক দেন কিরণলেখা—হরদেও, শুনে যাও।

কোন সাড়া শোনা যায় না। কেউ জবাব দেয় না।

কিরণলেখা ডাকেন—কপিলরাম, তুমি কোথায় ?

কেউ জবাব দেয় না। কোন সাড়া শোনা যায় না।

গ্যারেজের পিছনের ঘরে শুধু একটা আলো আর দুটো ছায়া নড়ছে দেখা যায়।

লণ্ঠন হাতে নিয়ে সাহেবকুঠির বারান্দার কাছে এগিয়ে এল উপেন মিস্তিরি আর তার বউ।—কাকে ডাকছেন মা? কেউ আর নেই।

কিরণলেখার গলার স্বর শিউরে ওঠে।—কেউ আর নেই? শুধু তোমরা দুজন আছ?

উপেন—হ্যাঁ, মা। এই আট মাস ভারী মানুষটাকে নিয়ে হঠাৎ এখন যাব কোথায়? যাবই বা কেমন করে?

মাথার কাপড় টেনে দিয়ে উসখুস করে উপেন মিস্তিরির বউ।

কিরণলেখা—আচ্ছা, এস।

উপেন—দরকার হলে ডাক দেবেন, মা।

বিছানার উপর উঠে বসেন গগন বসু।—আমি বলি, কাল সকালে উপেন তোমাদের দুজনকে তেজপুরে পৌঁছে দিয়ে চলে আসুক।

কিরণলেখা—আমি যাব না! শুক্তি যাক।

শুক্তি বলে—আমি যাব না।

রাতের কদমবাড়ি যেন প্রেতকুয়াশার আঁচল দিয়ে ঢাকা একটা সমাধি; তার মধ্যে সাহেবকুঠির ঘর আর বারান্দার আলোগুলি শুধু জীবন্ত প্রাণের চক্ষু। শুক্তির ঘরের টেবিলের উপর শুধু ছোট্ট রেডিও সেট কথা বলে; কী অদ্ভুত হয়ে গুমরে ওঠে রেডিওর খবরের এক-একটা কথা—চীনা দুসমনের হেভি মর্টার ফায়ার তুচ্ছ করে ঢোলা এখন মরিয়া হয়ে লড়ছে। খিঞ্জেমানের তিনটি কোম্পানি পোস্ট দিন-রাত সমানে মেশিনগান চালিয়ে দুসমনের অ্যাডভান্স ঠেকিয়ে রেখেছে। ফায়ারিং লাইনের বাংকার থেকে বের হয়ে, একাই জয়হিন্দ হাঁক দিয়ে আর গ্রেনেড হাতে নিয়ে চার্জ করেছে, দুসমনের মেশিনগানের গর্জন স্তব্ধ করে দিয়েছে আর মরে গিয়েছে এক জমাদার।

দুই চোখ অপলক করে আর একেবারে নিথর নীরব হয়ে রেডিওর কথা শুনছে শুক্তি, দেখতে পেয়ে কিরণলেখা একটু আশ্চর্য না হয়ে

পারেন না। ওসব খবরের মধ্যে এরকম মন-প্রাণ দিয়ে শোনবার কী আছে? খবর তো নয়, এক-একটা সর্বনাশের হুংকার।

বিছানা থেকে নেমে ঘরের ভিতরে পায়চারি করেন গগন বসু। বোধহয় রেডিওর সব খবর শুনতে পেয়েছেন, তাই হঠাৎ এই অস্থিরতা।—আমি আবার বলছি, তোমরা দুজনে তেজপুরে চলে যাও।

কিরণলেখা—তুমিও চল।

গগন বসু—না। এদিকে-ওদিকে কোন চা-বাগানের লোকজন সরে পড়েনি; সবার আগে আমার কদমবাড়ির বাগান খালি হয়ে গেল, এটা শুধু আমাকে জব্দ করবার জন্যে এক শয়তানের কারসাজি ছাড়া আর কী হতে পারে?

কিরণলেখা ভয় পান।—তাহলে তো তোমারই সবার আগে চলে যাওয়া ভাল ছিল।

গগন বসু—না। হাতে হাতে একটা নিষ্পত্তি করে দিয়ে তারপর যাব।

ঝিক করে জ্বলে উঠেছে গগন বসুর চোখ। প্ল্যাণ্টার সাহেব গগন বসু তো কবেই তাঁর সেই ভয়ানক শিকারের শখ ছেড়ে দিয়েছেন। মাচানে বসে নরখাদক বাঘের মাথা তাক করে বন্দুক তুলতে গিয়ে তাঁর চোখ দুটো যে ঠিক এইরকম ঝিক করে জ্বলে উঠত।

কিন্তু মনের জেদ দিয়ে কি শরীরের অসুখটাকে সব সময় জব্দ করা যায়? যায় না। গগন বসুও পারেন না। ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে আর জানালা খুলে সাহেবকুঠির ফটকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা রাত পার করে দিয়েই বুঝলেন গগন বসু, জ্বর হয়েছে। রাত-জাগা ক্লেশ আর জ্বরের ঘোর, বিছানার উপর শুয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া তন্দ্রার মধ্যে শুনতে থাকেন, শুক্তির ঘরের রেডিওটা খবর বলছে—খিঞ্জেমান নেই, ঢোলাও নেই। এগিয়ে এসেছে চীনারা।

শুক্তিরও যেন আর কোন কাজ নেই। শুধু গল্পের বই পড়া, বার বার খোঁপা বাঁধা, আর যখন-তখন রেডিওর সামনে এসে বসে থাকা।

একটি একটি করে পার হয়ে যায়, নীরব নির্জন কদমবাড়ির রোদ-ভরা দিন আর কুয়াশা-ভরা রাত।

সেদিন সকালবেলাতেই রেডিওর খবরটা যেন চেঁচিয়ে উঠলো।—বুমলা।

এগিয়ে যেয়ে রেডিওর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে শুক্তি। বুমলাতে যুদ্ধ চলছে। ফিয়ার্স ফাইটিং। চীনাদের পুরো একটা ডিভিসন বুমলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যাবেলার রেডিও বলে—বুমলার পতন। শুক্তির মাথাটা হঠাৎ অলস হয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে; ঠক করে ঠোকা খায় কপালটা। এক হাতের ছুটো আঙুল দিয়ে কপালটাকে শক্ত করে টিপে ধরে শুক্তি। এই তো সেই বুমলা, যেখানে বরফে ঢাকা পাহাড়ের পাথুরে বুকের উপর দিয়ে দৌড়ে ছুটে পালিয়ে যায় কস্তুরী হরিণ; তাকে আর ধরতে পারা যায় না!

কপালে ছোট্ট একটা কালশিরার কালো দাগ; তার মধ্যে ছোট্ট একটা ব্যথাও চিনচিন করে। আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে আর বই হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দার আলোর কাছে একটা চেয়ারে বসে শুধু কদমবাড়ির রাতের নিরেট কুয়াশার চেহারা দেখতে থাকে শুক্তি।

গগন বসুর জ্বরের শরীরটা সন্ধ্যা থেকে গভীর ঘুমে অসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। গভীর ঘুম হলেই তো ভাল, বাবার জ্বর তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। একবার উঠে গিয়ে আর ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখে আসে শুক্তি, মা'ও ঘুমিয়ে পড়েছেন। মা'র চোখের উপর খবরের কাগজটা পড়ে আছে।

উপেন মিস্তিরির ঘরে এখন আর আলো জ্বলছে না। কদমবাড়ির সব শব্দ মরে গিয়েছে। শুধু এই বারান্দার আলোর কাছে পোকাগুলির ছটফটানির শব্দ শোনা যায়।

কিন্তু ফটকের কাছে মুখলুকানো জানোয়ারের মত দাঁড়িয়ে আছে, কী ওটা? গাড়ি? এত শব্দহীন হয়ে কখন এল গাড়ি? কার গাড়ি?

শুক্তির চোখের কালো তারা দুটো জ্বলে জ্বলে আর ফুলে-ফুলে দেখতে থাকে, এগিয়ে আসছে সুশান্ত মজুমদার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শুক্তি। ততক্ষণে সুশান্ত মজুমদারও বারান্দার সিঁড়ির ধাপের কাছে এসে গিয়েছে। শুক্তি বলে—স্টপ! আর এক-পা এগুবেন না।

সুশান্ত—তোমার সেই বয়ফ্রেণ্ড, কি যেন নাম, হ্যাঁ, সেই সুজিত রায় কোথায়?

শুক্তি—আছে।

সুশান্তর হাতে একটা ফ্লাস্ক টলমল হয়ে দুলছে। এক ধাপ উপরে উঠে এসেই চোখ কুঁচকে হেসে ওঠে সুশান্ত।—কোথায় আছে? ঝুমলাতে? তবে তো গেছে।

শুক্তি—না, আছে।

সুশান্ত দাঁত চিবিয়ে হাসে।—তবুও আছে? কোথায়? হৃদয়ে নাকি?

শুক্তি—দেখবেন, আছে কিনা? আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি।

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে রাইফেলটাকে আঁকড়ে ধরে শুক্তি। টেবিলের দেরাজ থেকে দুটো বুলেট নিয়ে লোড করতে করতেই আবার ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। কিন্তু সুশান্ত মজুমদারও ততক্ষণে সরে গিয়েছে। গাড়িটাকেও কে-যেন স্টার্ট করে ফেলেছে।

কিন্তু শুক্তির রাইফেলের বুলেট সেই মুহূর্তে চোরাগাড়ির হুডের উপর গিয়ে আছড়ে পড়ে। তখনি আবার, আবার একটা আওয়াজ। যেন কদমবাড়ির রাতের নিরেট কুয়াশার বুকটার সব আক্রোশ ফেটে পড়েছে। একটা বুলেটের চোট খেয়ে চুরমার হয়ে ঝরে পড়ে যায় চোরাগাড়ির কাঁচ। আর-একটা বুলেটের আঘাত খেয়ে চোরাগাড়ির বুকের ভিতরে যেন একটা কালো কুণ্ডলী মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ঝুপঝাপ করে জখম ভালুকের মত দৌড়ে চলে গেল গাড়িটা।

উপেন মিস্তিরির ঘুম-ভাঙা আর ভয়-পাওয়া ঘরে আলো জ্বলে

ওঠে। কিরণলেখা এসে শুক্তির হাত চেপে ধরে কাঁপতে থাকেন। গগন বসু এসে শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

শুক্তি বলে—সুশান্ত মজুমদার।

গগন বসু—ভাল হলো। আরও ভাল হয়, যদি শুনতে পাই যে, ওটা মর্গে গিয়েছে। আমি তো তিনশো দুইয়ের আসামী হবার জন্য তৈরী হয়েই আছি।

কিরণলেখা বলেন—আর কি আমাদের এখানে থাকা উচিত?

গগন বসু বলেন—না; এবার আমারও যেতে আপত্তি নেই।

•

[আঠার]

তেজপুর শহর যেন দম-বন্ধ করে রাত সাড়ে আটটার আকাশবাণীর খবর শুনছে। ঘরে ঘরে রেডিওর সামনে বসে আছে উৎকণ্ঠ আর উৎকর্ণ বাপ-মা-ছেলেমেয়ের জটলা। নাতিকে কোলে নিয়ে ঠাকুরমাও শুনছেন। মুখ শুকনো, চোখ করুণ, এক-একটা স্তব্ধতা; কিন্তু সে স্তব্ধতার ভিতরের প্রাণটা ছটফট করছে।

বাজারের যেখানে যেখানে যে-দোকানে রেডিও বাজে, সেখানে সেখানে সে-দোকানের সামনে মানুষের বিপুল ভিড়। সাইকেল থামিয়ে ব্যস্ত মানুষ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর শুনছে। থমকে আছে রিক্সা, শুনছে রিক্সাওয়ালা আর রিক্সার আরোহী। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছে পথের মুটে-মজুর আর ফেরিওয়ালা।

আকাশবাণীর খবর হঠাৎ বলতে শুরু করে।—দুঃখের বিষয়…।

সব ভিড়ের সব প্রাণ চমকে ওঠে। সব শ্রোতার চেহারা শক্ত হয়ে ভয়ানক এক খবরের আঘাত সহ্য করবার জন্য তৈরী হয়।

আকাশবাণীর খবর কাটা-কাটা স্বরে গরগর করে।—তোয়াং নেই; দুসমননে কব্জা কর লিয়া! আমাদের ফৌজ পিছনে হটে এসে নতুন পজিশন নিয়েছে, লড়বার জন্যে তৈরী হয়েছে।

গুমরে ওঠে ভিড়ের বিচলিত বোবা স্তব্ধতা। এ কি হলো! ঘরের রেডিওর দিকে তাকিয়ে ঠাকুরমা ডুকরে ওঠেন—হায় ভগবান!

রবার বাগানের বাড়ি ভারতীর দোতলার একটি ঘরে রেডিওর দিকে তাকিয়ে শুক্তি বসুর চোখের তারা দুটোও কেঁপে ওঠে।

কে জানে কেমন দেখতে এই তোয়াং। কল্পনা করে দেখতে চেষ্টা করলে শুধু ছোট্ট একটা নীল আলোর বাল্‌ব্‌ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

পাশের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছেন গগন বসু। বিছানার কাছে দুই চেয়ারে বসে গল্প করছেন কিরণলেখা আর মণিমালা। কিন্তু মহিম দস্তিদার কোথায়?

কালোর মা দোতলার বারান্দায় এসে ডাক দেন—মা, আপনি কোথায়? একবার নীচের তলায় যান।

মণিমালা—কেন?

কালোর মা—একবার দেখুন গিয়ে; বাবা কেমন-যেন ছটফট করছেন। আমার কথার জবাব দিলেন না।

দেখেছেন কালোর মা, মহিমবাবুর গায়ের মুগার চাদরটা পড়-পড় হয়ে গায়ের সঙ্গে ঝুলছে। এক-পায়ে জুতো নেই, অস্থির হয়ে ঘরের এদিকে-ওদিকে হাঁটাহাঁটি করে ঘুরছেন।

ব্যস্ত হয়ে আর বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উপরতলা থেকে নেমে এলেন সবাই; প্রথমে মণিমালা আর কিরণলেখা। তারপর গগন বসু আর শুক্তি।

—কি হলো? এরকম করছো কেন? কিসের অস্থিরতা? মণিমালা জিজ্ঞেস করেন।

মহিম দস্তিদার হাসেন।—এমন কিছু ব্যাপার হয়নি। তোয়াং গিয়েছে, তাতে আমাদের এত বিচলিত হবার কি আছে? কিন্তু···।

গগন বসুর দিকে তাকিয়ে কথা বলেন মহিম দস্তিদার।—কিন্তু কথাটা কি জানেন? এই গবমেণ্ট কি আমাদের বাঁচাতে পারবে? আশা করবার মত যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

গগন বসুও হাসেন।—আমার কাছ থেকে এসব প্রশ্নের জবাব

পাবেন না। আমি জবাব জানি না। তবে আমি বিচলিত নই; আমার কোন আশা-টাশা নেই; যেটুকু ছিল সেটুকুও অনেকদিন আগে চুকেবুকে গিয়েছে।

মণিমালা—কিন্তু কে যে কোথায় আর কখন বিচলিত হলো, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

মহিমবাবু—তুমি বুঝতে পারবে না।

মণিমালা—এই তো, রাজবাহাদুরের কাছে এখনই শুনলাম, কাল বিকালে নেহরু-ময়দানে মস্ত বড় সভা হবে। লড়বার জন্যে জান কবুল করবে সবাই; চীনাদের শয়তানি কেউ সহ্য করবে না। তাছাড়া, তুইও তো দেখতে পেয়েছিস শুক্তি, কিছুক্ষণ আগে কত বড় দুটো মিছিল জয় হিন্দ করে চলে গেল।

মহিমবাবু হাসেন।—ওদের কথা ছেড়ে দাও। যাদের কিছু নেই, তাদের কোন ক্ষতির ভয়ও নেই, বিচলিত হবার প্রশ্নও নেই। যাক সে-সব কথা।···আপনি আজ একটু ভাল বোধ করছেন তো, গগনবাবু?

গগন বসু—হ্যাঁ, অনেকটা ভাল।

মহিম দস্তিদার মানুষটি যে হেঁয়ালির ভাষাতে কথা বলেন, সেটা শুক্তিরও কিছু-কিছু জানা আছে। আজ কিন্তু মনে হয়, মেসোমশাই নিজেও একটা হেঁয়ালি। আজই সকালে এই ভারতীর দোতলার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছিল শুক্তি, নীচের তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির বাচ্চা ছেলেটা, যার নাম হীরক, তার সঙ্গে কথা বলছেন মেসোমশাই; রাজপুত বীরবালকের নাম করে হীরককে উপদেশ দিচ্ছেন: সময় এসে গেছে হীরক, দেশের মাটির মান রাখবার জন্যে এবার তোমাকেও তরোয়াল ধরতে হবে। মরবো তবু নড়বো না, এই হবে তোমার আমার সবারই প্রতিজ্ঞা।

একটু পরেই শুক্তিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন মহিমবাবু।—তুই কি ঠিক বলতে পারবি, গগনবাবু তাঁর চা-বাগান বিক্রী করবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন কিনা?

শুক্তি—না।

মহিমবাবু—করে ফেললেই ভাল করতেন। আমিও তো দেখছি, এখন আর আমার এই বাড়িটাকে উচিত দাম দিয়ে কেনবার গরজ কারও নেই।

শুক্তি হাসে।—আপনি এসব কী বলছেন, মেসোমশাই ? মণিমাসি শুনলে খুব রাগ করবেন।

মহিমবাবু—তাঁর কথা ছেড়ে দাও। তাঁর অসীম ধৈর্য ; তিনি মনে করেন ধৈর্য ধরা একটা মস্ত গুণ। কিন্তু ধৈর্য ধরতে গিয়ে এই তো দেখা গেল যে, আমার এই বাড়ি কিনে নেবার মত খদ্দের আর নেই।

মহিম দস্তিদার যতই আরও জটিল হেঁয়ালি হয়ে উঠুন না কেন, তেজপুর শহরের জীবনে কোন হেঁয়ালি নেই। পরের দিন বিকালে যখন নেহরু-ময়দানে বিপুল জনতার সভায় জান-কবুল প্রতিজ্ঞা গুমরে ওঠে, ঠিক তার কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যার আকাশবাণীও জানিয়ে দেয় রাষ্ট্রপতির ঘোষণা ; এমার্জেন্সি !

গগনবাবুর কাছে এসে বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মহিমবাবু। তারপর বলেন—এমার্জেন্সি কথাটার সরল অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, সরকার এখন যা-খুশি-তাই করবেন। ভদ্রলোকদের বাড়ি-টাড়ি কেড়ে নিয়ে সৈন্য-সামন্ত রাখবেন। আপনি কী মনে করেন, গগনবাবু ?

গগনবাবু—আমি কিছুই মনে করি না।

চলে গেলেন মহিমবাবু। ফিরে গিয়ে আর বারন্দাতে নয়, ঘরের ভিতরে তাঁর প্রিয় সেই সবুজ রঙের রেক্সিনের আরাম-কেদারাটিতে আধ-শোয়া হয়ে বসে থাকেন। এই ভারতীর বারান্দায় পায়চারী করে বেড়াতে আর ভাল লাগে না। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে একটা উঁকি দিতেও ইচ্ছে করে না। পাশের বাড়ির হীরক চিৎকার করে গান গাইছে—বল বল বল সবে···। উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেন মহিমবাবু। শুনতে ভাল লাগে না।

কিন্তু তেজপুরের ঘরে ঘরে তখন হীরকেরই মত গলা ছেড়ে এই গান গাইছে যত রেডিও।

সকাল হলে আরও স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, বদলে গিয়েছে তেজপুর। সেই অদ্ভুত আর ভয়ানক উপকথার তেজপুর যেন হঠাৎ একটা নতুন রকমের প্রাণ পেয়েছে আর চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

খবরের কাগজের হকারের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর কাগজ কিনছে পথের লোক। উড়ছে হেলিকপটর; আকাশে অদ্ভুত শব্দের হর্ষ ছড়িয়ে দিয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে। মুখ তুলে হেলিকপটরের দিকে তাকিয়ে পথের লোকের অনেক আশার চোখগুলি চিকচিক করে; হাত তুলে আর রুমাল উড়িয়ে হই-হই করে ওঠে শুভযাত্রার কামনা।

শিলিগুড়ি থেকে একটানা ছুটে এসে তেজপুর স্টেশনে পৌঁছে যায় মিলিটারীর তিনটে স্পেশাল ট্রেন। এসেছে শিখ ব্যাটালিয়ন, জাঠ কোম্পানি আর গোর্খা ব্রিগেড। স্টেশনে লোকের ভিড় জয় হাঁক দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। স্কুলের একদল ছেলে জওয়ানদের মাথার উপর ফুল ছুঁড়তে থাকে। একটা ফুল হাতে লুফে নিয়ে পকেটে রাখে আর হাসতে থাকে একজন অল্পবয়সী শিখ ক্যাপ্টেন।

যো বোলো সো নিহাল, সৎশ্রী অকাল! হাঁক দিয়ে আর মার্চ করে চলে গেল শিখ ব্যাটালিয়ন।

দিনে রাতে সব সময় এয়ারপোর্টের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, নামছে, থামছে; আবার ফিরে চলে যাচ্ছে এয়ারফোর্সের ট্রান্সপোর্ট প্লেন। মিলিটারীর সম্ভার নিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার ভাইকাউণ্টও আসছে আর চলে যাচ্ছে। ঘুমোবার মত একঘণ্টারও সময় পান না প্লেনের কম্যাণ্ডার; লাল হয়ে ফুলে আছে চোখ, কিন্তু মুখে শান্ত হাসি।

তেজপুর থেকে মিসামারি, মিসামারি থেকে ফুটহিল; ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে ছুটে চলে যায় মিলিটারীর জীপ। যাচ্ছে আর্মি মেডিক্যালের সম্ভার। যাচ্ছে ফিল্ড সিগন্যালের ইউনিট আর আর্টিলারির জওয়ানদের সেকশন।

আর দেখা যায়, কোলিবাড়িতে শিশির হাজরিকার বাড়ির নারকেল-গাছের গায়ে ছোট একটি কাঠের বোর্ড, তার উপর সাদা

হরফে ইংরেজীতে লেখা ছোট একটি কথা—ইয়েস ; ইয়ুথ এমার্জেন্সি সার্ভিস।

টাকা-পয়সার সম্বল নেই, জননেতার [illegible] নেই, সরকারী কর্তার পেট্রনী শুভেচ্ছার বাণী নেই ; ইয়েস যেন [illegible]পুরের সামান্য-সাধারণ প্রাণের একটা ব্যস্ততা। শিশির হিতেন [illegible] ও জগদীশ, আর, আরও ওইরকম কয়েকজনের ব্যস্ততা। ওরা ছুটে ছুটে কাজ করতে চায়। কাজের জন্যে তৈরী হতে চায়। ওরা ট্রেঞ্চ কাটে, ফার্স্ট-এড আর ফায়ার ফাইটিং-এর ট্রেনিং নেয়।

দেখতে অদ্ভুত লাগে, সেই শিশির হাজরিকা আজ ইয়েস ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে রাঙ্গাপাড়াতে গিয়ে আর সড়কের পাশে একটা ক্যান্টিন করে জওয়ানদের হাতে গরম চায়ের পেয়ালা তুলে দিচ্ছে।

কম্বল দাও, লেপ দাও, গরম কাপড় দাও। নেফার পাহাড়ের দুরন্ত বরফ আর শীতের কামড় সহ্য করছে লড়াইয়ের জওয়ান, তাদের জন্য মমতার উপহার চাই। আবেদন জানিয়ে তেজপুরের সড়কে সবার আগে মিছিল করে ঘুরে গেল যারা, তারা ওই ইয়েস ছেলের দল।

মিছিলটা রুবার বাগানের ভারতীর সামনে এসে দাঁড়াতেই বাইরের ঘর ছেড়ে ভিতরের ঘরে চলে যান মহিমবাবু। সবার আগে কালোর মা বের হয়ে এসে মিছিলের হাতে তার নিজের গায়ের কম্বলটাকে তুলে দিয়ে চলে যান। বের হয়ে আসে শুক্তি, হাতে দুটো গরম আলোয়ানের একটা প্যাকেট। একটু আশ্চর্য হয়ে হেসে ওঠে শুক্তি।
—আপনি ? মালতীর খবর কি ?

শিশির হাসে।—ভাল আছে।

শুক্তি—প্রমীলা ?

শিশির—ভালই আছে।

মিছিলটা অনেক দূরে চলে গিয়েছে। মিছিলের গানের স্বর কানে এলেও গানের ভাষার কোন কথা আর স্পষ্ট করে শোনা যায় না। শুক্তির মনটা কিন্তু বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারে, কিছুই ভাল লাগছে না। ভাবতে গেলে মনের সব চেষ্টা মিথ্যে করে দিয়ে আর

নাগাল-ছাড়া হয়ে শুক্তির প্রাণটা হঠাৎ এক-একবার যেন দুরন্ত ছেলে-মানুষের মত একটা দৌড় দিয়ে ওই কদমবাড়িতে ফিরে যেতে চায়। কেউ নেই কদমবাড়িতে, তবু যেন অনেক কিছু আছে। বাগানের নালার জলে হাঁস সাঁতার দেয়, ছায়া-শিরীষের গায়ে কাকলাস বসে থাকে, কুঞ্জলতার পাতার ঝোপে কিচির-মিচির করে চড়ুই লাফিয়ে বেড়ায়। তেজপুরের যত মিছিল মুখরতা আর চঞ্চলতার কাছে এসে যেন আরও একলা হয়ে গিয়েছে শুক্তি।

উপরতলার ঘরে মা'র কাছে বসে এখন কত কথাই না বলছেন মণিমাসি! কিন্তু কোন নতুন কথা নয়। সোম'লজে এখন কেউ আর নেই। ওরা এখন দার্জিলিং-এ আছে। অনিমেষ কয়েকবার এসেছিল। আশা করেছিল অনিমেষ, শুক্তি নিশ্চয় কদমবাড়ি থেকে তেজপুরে শিগগির চলে আসবে। অনিমেষের মা কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, কবে আসবে শুক্তি?

কিরণলেখা বলছেন—সুমিত্রার চিঠি পেয়েছি। শ্যামল বলেছে, নেফাতে যখন একটা গোলমাল বেধেছে, তখন ওদিকে এখন আর না-থাকাই ভাল; শুক্তির এখন কলকাতায় চলে আসাই তো উচিত।

এসব কথা আর এরকমের কথা অনেক শোনা হয়েছে। আরও শুনতে হবে, যতদিন না শুক্তির নিজের মুখের একটা কথা ওসব জল্পনার ব্যস্ততা শান্ত করে দেয়। কিন্তু তার আগে কি একটা ভাল খবরের কথা শুনতে পাওয়া যাবে না? কি আশ্চর্য, এত খবর শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে-খবরটা যেন নিরেট বোবা একটা পাথর হয়ে নেফার পাহাড়ে কোথায় কোন্ জঙ্গলে না বরফ-ঢাকা বাংকারের ভিতরে পড়ে আছে!

পার্লামেন্টে প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন, চীনাদের আমরা থামিয়ে দিয়েছি, উই হ্যাভ হল্টেড দেম। ভালই তো। এবার তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দিলে আরও ভাল হয়।

রেডিওতে দিল্লির সরকারী বক্তৃতা শুনে শুনে ঝিমিয়ে পড়া, তারপর একটা বই হাতে নিয়ে, হয় চেয়ারে বসে নয় বিছানায় শুয়ে বই-এর

একটা পাতাও না পড়া, তেজপুরের জীবনের দিনগুলি কেটে যাচ্ছে বেশ; বেশ চমৎকার একটা কুয়াশার ফাঁকি। কিছুই দেখতে বুঝতে আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যিই হেসে ফেলতে আর সব ভুলে যেতে ইচ্ছে করে।

বিকাল হয়েছে; এখন এভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকলে মা আবার ডাকাডাকি করবেন, মণিমাসি এসে হাত ধরে টানাটানি করবেন।

উঠে পড়ে শুক্তি। বার বার মিছামিছি খোঁপা বেঁধেই বা কতটুকু সময় কাটিয়ে দিতে পারা যায়? তার চেয়ে ভাল, বাগানের রোদ গায়ে লাগিয়ে···।

চমকে ওঠে শুক্তির চোখ। জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেয়েছে শুক্তি, মালতী আর একজন অচেনা মহিলা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রাজবাহাদুরকে কি-যেন বলছে। হাত তুলিয়ে ডাক দেয় শুক্তি।—মালতী, এস। ওপরে উঠে এস।

কি আশ্চর্য, মালতীও যেন একটা ব্যস্ততা। খুব ব্যস্তভাবে কথা বলে মালতী।—দাদার কাছে শুনেছি, তুমি এখানে আছ। তাই মনে হলো, তোমাকে ছেড়ে দেব কেন? তোমাকেও কাজ করতে হবে।

শুক্তি—কাজ?

অচেনা মহিলা বলেন—আমাদের সমিতি···।

মালতী—ইনি কমলা দত্তবড়ুয়া। প্লীডার শরৎবাবুর স্ত্রী।

কমলা—আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি, আর্মির জওয়ানদের জন্য উলের মোজা সোয়েটার কিংবা মাফলার, যা-হোক কিছু, যেটা আপনার সুবিধে হয়, বুনে দিন। খাকি রঙের উল হলেই ভাল। সোয়েটার হলে ফুল স্লীভ হবে।

শুক্তি—তাই বলুন! এই কাজ! আচ্ছা, বেশি না পারি অন্তত একটা সোয়েটার বুনে দেব।

কমলা—আপনাকে কিন্তু আমরা উল এনে দেব না। আপনি নিজেই কিনে নেবেন।

মালতী—ওকথা আর শুক্তিকে বলবার দরকার হয় না। এখন চলুন, নতুনপাড়ার দিকে একবার যাই।

শুক্তি হাসে।—উঃ, মালতীর যেন একটু হাঁপ ছাড়বারও সময় নেই মনে হচ্ছে।

মালতী হাসে।—রাগ করো না, আবার দেখা হবে।

নানা রঙের উলের গোছা দিয়ে ঠাসা-ভরতি ঝোলাটাকে হাতে তুলে নিয়ে চলতে থাকে মালতী। বিদায় নিলেন কমলা দত্তবড়ুয়া, তাঁরও হাতে একটা ঝোলা।

মালতীর সঙ্গে দেখা হলো, ভালই হলো। মনের কাছে না হোক, অন্তত হাতের কাছে একট কাজের ছুতো ধরিয়ে দিয়ে গেল মালতী। দিনের কিছু সময় একটা কাজের নামে ফুরিয়ে দিতে পারা যাবে। মা আর মণিমাসি অবশ্য মনে করবেন যে, শুক্তি খুব ব্যস্ত হয়ে একটা চ্যারিটির কাজ করছে।

উল কেনার জন্যে টাকা দিয়ে রাজবাহাদুরকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়েই সন্দেহ হয় শুক্তির, রাজবাহাদুর কি উল পছন্দ করতে ভুল করে ফেলবে না? কিন্তু বেশ ভাল করেই তো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। রঙ খাকি হবে বটে, কিন্তু যেন খসখসে না হয়। পাকা ধানের রঙ হলেই ভাল। একেবারে চকচকে রেশমী ভাব না হোক, একটু নরম মোলায়েম ভাব যেন থাকে। কিন্তু টু-প্লাই হলে চলবে না। যা শীত, ফোর-প্লাই চাই।

ভুল সন্দেহ করেনি শুক্তি। শক্ত দড়ি-দড়ি চেহারার উল নিয়ে এল রাজবাহাদুর; সে উল দিয়ে সোয়েটার বুনতে শুক্তির হাতে রুচি নেই, রুচি হবেও না। আরও দু'বার বাজারে গিয়ে অনেক বাছাই করে যে উল কিনে নিয়ে এল রাজবাহাদুর, সেটা অবশ্য অপছন্দ করবার মত কিছু নয়।

কাজটা মন্দ নয়। ভালই তো লাগে। তিনদিনের মধ্যে শুধু দুপুরবেলার সময়টুকু বিছানায় গা গড়িয়ে, সোফার কোণ ঘেঁষে বসে এই সোয়েটারের যেটুকু বুনতে পারে শুক্তি, তাতেই পিঠের সবটা

আর বুকের অর্ধেকটা হয়ে যায়। শুক্তির হাতে একটা কাজ ধরিয়ে দিতে গিয়ে মালতী যে সত্যিই শুক্তির মনেও একটা ব্যস্ততার ছোঁয়াচ ধরিয়ে দিয়েছে।

মিছিমিছি খোঁপাটাকে এক টানে খুলে দিয়ে মিররের সামনে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা, আর, আবার নতুন করে খোঁপা বাঁধা; শুক্তি বসুর এই নতুন বাতিক কিন্তু এখনও বন্ধ হয়নি। উলের কাঁটা থামিয়ে রেখে, কোলের উপর থেকে উলের গোছা আর সোয়েটারের আধখানা বুক নামিয়ে রেখে হঠাৎ এক-একবার ব্যস্তভাবে সোফা থেকে উঠে পড়ে শুক্তি। মিররের সামনে এসে দাঁড়ায় আর খোঁপা খুলে ফেলে। আর, দেখতেও থাকে, কপালের মাঝখানে সেই ফিকে কালশিরার আবছা কালো দাগটা এখনও আছে, একেবারে মুছে যায়নি।

মা বোধহয় এর মধ্যে একটি দিনও শুক্তির মুখের দিকে ভাল করে তাকাননি। তাই কপালের এই আবছা কালো-দাগটাকে দেখতে পাননি। দেখতে পেলে নিশ্চয় চোখ বড় করে আর গলা কাঁপিয়ে বলেই ফেলতেন, কোথায় মাথা ঠুকেছিস, বল? গাড়ি থেকে নামতে, না অন্ধকারে আলোর সুইচ হাতড়াতে গিয়ে ঘরের দেয়ালে? মনে করে দেখ!

হেসে ফেলে শুক্তি।

আর তো কোন কাজ নেই। আর যা আছে, সেটা যেন তিনটে তিনরকম জগতের ভাষা চুপ করে শোনা, আর শুনে নিয়েই সরে যাওয়া।

তেজপুরের এই নভেম্বরী শীতের বিকালের নরম রোদের আলো গায়ে মেখে বাগানের কামিনী গাছের মাথায় একটা একলা টুনটুনি যখন চুপ করে বসে থাকে, তখন ড্রাইভার রাজবাহাদুরও গ্যারেজের সামনের চাতালের এক পাশে ঘাসের উপর বসে ওর মাথার নেপালী টুপির ছেঁড়াগুলিকে সেলাই করে হাসতে থাকে।

রাজবাহাদুর বলে—বোহোৎ মজা হুয়া, দিদি।

শুক্তি—কি বললে?

রাজবাহাদুর—লড়াইকে লিয়ে হামি চান্দা দিয়েছে সাত রূপিয়া। হাসপাতালকা জমাদারিনলোগ দিয়েছে বিশ রূপিয়া। নতুনপাড়াকা শীতল কাকাবাবু দিয়েছে দু'শো রূপিয়া। লেকিন…।

কি-যেন বলতে গিয়ে থেমে যায় রাজবাহাদুর, আর মাথা চুলকোতে থাকে। শুক্তি বলে—লেকিন কেয়া? বলেই ফেল না।

রাজবাহাদুর—লেকিন বাবা কুছ নেহি দিয়া।

শুক্তি—কে? মেসোমশাই?

রাজবাহাদুর—হাঁ, দিদি। বাবা এক পয়সা নেহি দিয়া। শই-কিয়া সাহেব আওর চৌধুরী সাহেবভি নেহি।

সন্ধ্যাবেলার রেডিওতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বলে—আমাদের জয় হবেই। রেডিওর গানগুলিও বলে, হবে জয়।

কালোর মা বলেন—হবে বিচার।

রাত হয়েছে। স্তব্ধ নীরব প্রহর। তারায় ভরে আছে আকাশ। কালোর মা'র গায়ে কম্বল নেই; ছাদের উপর একটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন। আর পুরু রেজার ফ্লানেলের গ্রেট-কোট গায়ে জড়িয়ে ছাদের এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ায় শুক্তি।

কালোর মা'র কথা শুনে থমকে দাঁড়ায় শুক্তি।—কি বললেন?

কালোর মা—বলছি, আরও কত অবিচার হলো।

একগাদা অবিচারের গল্প বলেন কালোর মা।—তোমাদের ড্রাইভার কৈলাসের জেল হয়েছে রতনের চাকরি গিয়েছে। শীতলবাবুর দোকান গিয়েছে। শিশিরের বাড়ি গিয়েছে।

হঠাৎ গল্প থামিয়ে আর জপের মালা হাতে তুলে নিয়ে চোখ বন্ধ করেন কালোর মা।

চোখে পড়ে শুক্তির, অনেক দূরের একটা গাছের মাথার অন্ধকারে মিটমিট করছে জোনাকির কুচি-কুচি আলো। আর নেফা-পাহাড়ের শক্ত নিরেট ধড় যেন কুয়াশা হয়ে গলে গিয়েছে।

শুক্তির চোখের উপরেও যেন একটা কুয়াশা গলে পড়তে চাইছে।

সরে যায় শুক্তি। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে সিঁড়ি ধরে নেমে চলে যায়।

কিন্তু থামতে বোধহয় ইচ্ছে করে না। ঘরে ঢুকে আর বিছানাটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই আবার বের হয়ে যায় শুক্তি। যেন শুক্তির বুকের ভিতরে একটা অবিচারের গল্প আজ হঠাৎ উতলা হয়ে উঠেছে। বাঃ, এ তো বেশ অদ্ভুত ভুলো মন, একবার খোঁজ নিতে চেষ্টাও করে না, মানুষটার কি হলো বা না হলো?

লোখরার প্রণব কাকা নিশ্চয় একটা কিছু খবর দিতে পারেন। এতক্ষণে কি ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রণব কাকা? রাত এগারটা তো এখনও হয়নি।

নীচের তলার একটি ঘরের কাছে এসে দেয়ালের গায়ের আলোর সুইচ টিপে দেয় শুক্তি। দরজা ঠেলে দিয়ে ভিতরে ঢোকে।

টেবিলের উপর থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে আর অনেক ডাকাডাকি করেও কিন্তু কোন ফল হয় না। এক্সচেঞ্জ শুধু বার বার ওই একই কথা বলে।—প্লীজ ছেড়ে দিন। নো পার্সোনাল কল।

শুক্তি—কেন?

—সিকিওরিটি!

রিসিভার নামিয়ে রেখে দিয়ে শুধু একটা করুণ স্তব্ধতার মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম; চোখের তারা নড়ে না।

চমকে ওঠে শুক্তি। মণিমাসির গলার স্বর ঘরের দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে। ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে কথা বলেন মণিমালা—এত রাতে এখানে এসে তুই কার সঙ্গে হ্যালো হ্যালো করছিস?

শুক্তি—লাইন পেলাম না। লোখরাতে প্রণব কাকার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

মণিমালার পিছন থেকে কিরণলেখার গলার স্বর আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে—কেন?

শুক্তি হাসে।—যুদ্ধের একটা খবর জানতে ইচ্ছে হয়েছিল।

কিরণলেখা—যুদ্ধের খবর? রেডিও তো সব সময় যুদ্ধের খবর বলছে।

শুক্তি—রেডিওতে সুজিতবাবুর কোন খবর তো থাকে না।

হেসে ফেলেন কিরণলেখা।—সুজিত কি একটা জেনারেল যে, ওর খবর বলবে রেডিও? সবারই কথা বলতে গেলে রেডিওতে কুলোয় না।

শুক্তি—কিন্তু বলবে তো, বুমলার যুদ্ধের পর রাইফেলের লোকগুলোর কি দশা হলো? রইলো, না গেল? আছে, কি নেই?

কিরণলেখা—সে-সব খবর একদিন পাওয়াই যাবে। খবরের কাগজ আছে কি করতে? কিন্তু সেজন্যে কি এত রাতে রিং করে প্রণবের ঘুম ভাঙাতে হবে? খেয়ালের যে কোন মাত্রা নেই! তা ছাড়া আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবি তো?

শুক্তি আশ্চর্য হয়।—তোমাকে আবার কি জিজ্ঞেস করবো?

কিরণলেখা—আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো বলে দিতাম, প্রণব এখন লোখরাতে নেই, জোড়হাটে আছে।

মণিমালা হাসেন।—যা, এবার শুয়ে পড় গিয়ে, যদি আবার রোগা হবার বাতিকে না পেয়ে থাকে।

কী আশ্চর্য! ঘুমটাও একটা দুঃসহ লজ্জার ঘুম। বিশ্রী স্বপ্ন তাড়াতে গিয়ে ঘুমটা বার বার ভেঙ্গে যায়। ডান পায়ের গোড়ালিতে কোন ফুস্কুরির ব্যথা টনটন করছে না, তবু একজনের কোলের উপর পা তুলে দেওয়া! স্বপ্নটার একটুও লজ্জা হলো না। কোন বিপদ-আপদ নেই, বাঘে-ভালুকে তাড়াও করেনি, তবু ছুটে গিয়ে একজনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরা! ঘুম ভেঙে যাবার এতক্ষণ পরেও স্বপ্নটার ছোঁয়া যেন গায়ে লেগে রয়েছে। নিঃশ্বাসের সব বাতাস অলস হয়ে গিয়েছে। বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে। জীবনের কোন মুহূর্তেও এমন লজ্জা পায়নি শুক্তি।

ঘুম আর হবে না। এমন ঘুম আর না হলেই ভাল। রাত আর কতটুকুই বা আছে? আর না ঘুমোলেও চলবে। বাকি রাতটুকু জেগে বসে কাটিয়ে দিলে ক্ষতি কি? চোখের চেহারা দেখে মণিমাসি শুধু একটু সন্দেহ করে বলবেন, আজ তোকে এত রোগা-রোগা দেখাচ্ছে কেন রে, শুক্তি?

বিছানা থেকে নেমে পড়ে শুক্তি। আলো জ্বালে আর জানালাটাকেও খুলে দেয়।

না, এটা রাত নয়। ভোর হয়েছে। হিমেল বাতাসের কনকনে ঠাণ্ডায় গাছপালার মাথা শিউরে শিউরে কাঁপছে। দূরের শঙ্খের শব্দের মত একটা ফিকে গম্ভীর শব্দ ভেসে আসছে। ভোমরাগুড়ি ঘাট থেকে ভোরের ফেরির স্টিমার ছাড়লো বোধহয়। স্টিমারের বিদায়ধ্বনির স্বরও শীতে কাঁপছে।

[উনিশ]

তেজপুরের এদিকে-ওদিকে সবদিকেই ধুলো উড়ছে। পথের লোক একটু বেশি তাড়াতাড়ি করে হাঁটে; রিক্সা একটু বেশি বেগ নিয়ে দৌড়ে যায়। আর গাড়ির হর্নের শব্দগুলি যেন ছুটে চলে যাবার জন্য একটা হঠাৎ-ব্যাকুলতার চিৎকার।

তোয়াং-এর গোমফার বুদ্ধমূর্তির কাছে দীপ জ্বেলে দিতে সেখানে কেউ আর আছে কিনা, ঠিক বুঝতে পারা যায় না। বরং সন্দেহ হয়, কেউ বোধহয় নেই।

চলে এসেছে, চলে আসছে, আরও চলে আসবে নিশ্চয়, ঘর-ছাড়া যত মোনপা ভোটিয়া আর শাবদুকপেন।

আসছে, এসে পড়েছে, আশ্রয় ক্যাম্পের দিকে চলে যাচ্ছে ঘর-ছাড়াদের এক-একটা দল। অনেক রিনচিন আর অনেক খ্রিং, লেই, দোরজি, সাংগে, সাংজা আর কেজাং; ওরা বড় গম্ভীর।

মাথাতে মোটা মোটা বেণী দুলছে যাদের, রিলিম, সোনাম, পেম,

আর পুতি ; ডোয়েমা হোক বা লামু হোক, ওরা সবাই মিটিমিটি হাসে।

ছোয়াং, মেদি, ডাবু আর নোরবু : বুড়ো আচি সেতু আর ছোকরা মুখরো সেতু ; ওরা বেশ বিরক্ত হয়ে তাকায় আর হাঁপায়।

ওদের কাঁধে পিঠে আর মাথায় বোঝা, ওদের টাট্টু খচ্চর আর বুড়ো ঘোড়ার পিঠে বোঝার ভার। ধুলোমাখা হয়ে, হেসে কেশে রেগে হাঁপিয়ে আর ফুঁপিয়ে, অসহায় ক্লান্তির মিছিলের মত ওরা তেজপুরের গা-ঘেঁষা সড়ক ধরে চলে যাচ্ছে। বাচ্চা-কাচ্চা, বুড়ো-বুড়ি আর ছোঁড়াছুঁড়ি ; কে না আছে ?

কিন্তু কোন দফলা-গাঁয়ের একটিও মানুষ আসেনি। রতন যতই ছুটোছুটি করুক, কঠিন আশার মূর্তি হয়ে সড়কের মাইল-স্টোনের উপর বসে আর চোখ তুলে আগন্তুকের মিছিলের মধ্যে চেনামুখ খুঁজতে যতই চেষ্টা করুক, শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে যায় রতন।

ক্লাস ওয়ান টু থি আর ফোর ; নেফার সরকারী কাজের উত্তমাধম সবাই চলে আসছেন। উত্তমেরা অনেকে একটু আগে এসে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার কোথায় যেন চলে গিয়েছেন। নর্থ ব্যাঙ্কের এদিকে কোথাও নয়, হেথা নয়, আরও দূরে ; অন্য কোনখানে।

চলে গিয়েছেন দশটি বাড়ির মালিক লাহিড়ী মশাই, তাই হীরকের গলার স্বদেশী গানের কাকলি আর শোনা যায় না। চলে গিয়েছেন একুশটি বাড়ির মালিক শৈলেশ্বর শইকিয়া। চলে যাবার জন্যে ছটফট করছেন ইনকাম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী ; সিক লীভ চেয়ে দরখাস্ত করেছেন, তার উপর গৌহাটিতে তিনবার টেলিগ্রাম করে রিমাইণ্ডারও দিয়েছেন। চার্টার প্লেন উড়ে উড়ে এসেছে, আর এদিক-ওদিকের যত চা-বাগানের বিদেশী সাহেবকে সপরিবারে তেজপুরের মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে।

মণিমালার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে, আজকের দিনটা যে স্মরণ করে খুশি হবার একটা দিন। অনেক আনন্দের স্মৃতি দিয়ে চিহ্নিত

একটি দিন, যেদিন এই ভারতীর ফটকের দু'পাশে দুটি মঙ্গলঘট রেখে তিনি গৃহপ্রবেশ করেছিলেন। মুগার চাদরটি গায়ে জড়িয়ে আগে-আগে চলেছেন মহিমবাবু, পিছনে মণিমালা। তাঁর হাতের থালার উপর কর্পূরের বাতি জ্বলছে। সেদিনটি ছিল আজকেরই মত একটি আঠারই নভেম্বর।

কোন বছরে এই দিনটিতে গগনবাবু কিরণদি আর শুক্তিকে কাছে পাননি মণিমালা। তাই তাঁর ইচ্ছে হয়েছে, খুব একটা হই-চই উৎসব নয়, একটু হাসিখুশির কলরব নিয়ে গৃহপ্রবেশের বার্ষিকীর দিনটা সুখী হোক। কিংবা বোধহয় ছানার পোলাও, রুইয়ের পেটি দিয়ে কোর্মা আর সরভাজা তৈরী করবার মত একটা দিন খুঁজছিলেন মণিমালা। আজ সেইরকম একটি দিন পেয়েছেন।

নিজে খাটলেন, কালোর মা তো খাটছেনই; তার উপর শুক্তিকেও একটু না খাটিয়ে থাকতে পারলেন না মণিমালা। শুক্তিকে দিয়ে সব ভাজিয়ে নিলেন।

দিনটাও না হেসে থাকতে পারবে কেন? ভাজতে গিয়ে প্রথমেই সরের তিনটে পীস কড়া জ্বালে পুড়িয়ে লাল করে দিয়ে শুক্তি যখন আতঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, সর্বনাশ হলো, সব গেল মণিমাসি, তখন শুক্তির হাত থেকে ঝাঁঝরাটাকে কেড়ে নিয়ে হেসে ওঠেন মণিমালা।

কিন্তু শুধু একবার, আর ভুল হয়নি শুক্তির।

দুপুরবেলায় খাবার টেবিলের উপর দিয়েও মাঝে মাঝে যেন হাসির শব্দ গড়িয়ে যায়। গগন বসু বলেন—প্রণবের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে শান্তিপুরে গিয়ে যে সরভাজা খেয়েছিলাম, তার স্বাদ মনে আছে। কিন্তু আজকের সরভাজা খেয়ে মনে হচ্ছে, আরও পাকা কোন কারিগরের হাতের সরভাজা; অদ্ভুত স্বাদ।

মহিমবাবু—হ্যাঁ; আমাদের তেজপুরের লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হরগোবিন্দ খুবই ওস্তাদ কারিগর।

গগন বসু—ভুল নাম বললেন, মহিমবাবু!

মণিমালার মুখের দিকে তাকিয়ে মহিমবাবু হাসেন।—বোধ হয় গোলকবিহারীর দোকানের সরভাজা? তাই না?

গগন বসু—না, কারিগরের নাম হলো শুক্তি বসু।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মহিমবাবু কুণ্ঠিতভাবে হাসেন।—তুই? কলকাতার কলেজে সরভাজাও শেখায় নাকি?

শুক্তি—না। তেজপুরের ভারতী কলেজে শেখায়।

মহিমবাবু—ভারতী কলেজ?

শুক্তি—জানেন না?

মহিমবাবু—না। কখনও তো শুনিনি।

শুক্তি—প্রিন্সিপালের নামটাও শোনেননি?

মহিমবাবু—না।

শুক্তি—তা হলে শুনবেন? বলবো?

মহিমবাবু—বলবি বইকি।

শুক্তি—নাম, শ্রীযুক্তা মণিমালা দস্তিদার।

হাসতে গিয়ে গগনবাবুর হাতের চামচ পড়ে যায়। কিরণলেখা হাসি চাপতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শুক্তিকে ধমক দিতে গিয়ে হেসেই ফেলেন।—মুখ-কাটা মেয়ে। এরকম একজন গম্ভীর গুরুজন মেসোর সঙ্গে কি-রকম ঠাট্টা তামাসা শুরু করেছে।

মহিমবাবু এইবার কিরণলেখার মুখের দিকে তাকান।—মনে হচ্ছে, আপনিই শুক্তিকে এই ঠাট্টাটা শিখিয়ে দিয়েছেন।

মণিমালা, ব্যাপার দেখে সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন যিনি, তিনি তাঁর হাসির ভার সামলাতে গিয়ে কোন কথাই বলতে পারেন না।

বিকাল হতেই গানের মিষ্টি সুরের ছোঁয়া লেগে ভারতীর ঘরের বাতাসও মিষ্টি হয়ে গেল। শুক্তিকে বেশি বলতে হয়নি, শুধু একবারই বলেছিলেন মণিমালা—কতদিন তোর গান শুনিনি শুক্তি।

শুক্তির গান শেষ হবার পর মণিমাসি আরও খুশি হয়ে বলেন—শুক্তির গলার এত মিষ্টি গান আমি আগে কখনও শুনিনি।

কি যেন ভেবেছেন কিরণলেখা; শুক্তির ঘরের দরজার কাছে

এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোখে যেন আর-একটা উৎসবের আশার ছবি আজ খুব ব্যস্ত হয়ে হাসছে।

যদি এখন মালতী হঠাৎ উপস্থিত না হতো, তবে বোধ হয় এখনই শুক্তির ঘরে ঢুকে আর শুক্তিরই চোখের সামনে বসে গল্প করতেন কিরণলেখা।

—এস মালতী। ডাক দিলেন কিরণলেখা।

চমকে ওঠে শুক্তি। মালতীকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়েও শুক্তি যেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে হাসে।—এখনও ফিনিশ করতে পারিনি মালতী।

মালতী—এতদিনের মধ্যে একটা সোয়েটার বুনে দিতে পারলে না? একটু তাড়াতাড়ি কর, শুক্তি।

চলে গেল ব্যস্ত মালতী। শুক্তির ঘরে ঢুকে কিরণলেখা হাসেন।—আজ নিশ্চয় স্পষ্ট করে বলতে পারবি। তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম।

বুঝতে অসুবিধে নেই শুক্তির, মা এখন কিসের জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। তেজপুরের বাতাসের ধুলো লালচে গোধূলির মত রঙীন হয়ে উঠতে চাইছে।

কিরণলেখা—আর তো দেরি করা উচিত নয়। ভেবে দেখতে এত দেরিই বা হবে কেন? তুমি বড় হয়েছ, তোমার তো বুঝে নিতে কোন অসুবিধে নেই।

শুক্তির নীরব মুখটার উপরেও যেন রঙীন গোধূলির একটা আভা লুটিয়ে পড়েছে। কিরণলেখা বলেন—তুমি কৃষ্ণার মত একটা খুকু মেয়ে হলে, কিংবা ষোল বছর বয়সের একটা বোকা-অবুঝ মেয়ে হলে তোমাকে কিছু জিজ্ঞেসা করতাম না। যা করতাম আমরাই করতাম। তা ছাড়া, তোমার বাবার ইচ্ছের কথাটাও তো জান; তুমি যা বলবে, তাই হবে।

শুক্তি বলে—বলবো। আর দেরি হবে না।

কিরণলেখা—কবে বলবি?

শুক্তি—আজই।

কিরণলেখার মুখের শান্ত হাসিটা যেন নিবিড় তৃপ্তি নিয়ে থমথম করে। চলে যান কিরণলেখা।

টেবিলের উপর পড়ে আছে উলের গোছা, কাঁটা দুটো আর পরিপাটি করে গোটানো সোয়েটার। ঠাসা বুনোট পেয়ে উলের পাকা ধানের রঙ আরও ঘন আর চকচকে হয়েছে। বুকের সবটাই হয়েছে, পুরো একটা হাতও হয়ে গিয়েছে। আর একটা হাতের অর্ধেক হয়েছে। এত কুঁড়েমি না করলে বাকি অর্ধেক হাতটাও কবেই হয়ে যেত।

না, আজ আর ইচ্ছে করে না। শুধু হাত দুটো নয়, মনটাও আর ওই উলের কাঁটা ধরবার জন্য ব্যস্ত হতে চায় না। বরং চুপ করে খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে।

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। নেফার পাহাড়ের মাথায় রোদের ছোঁয়া সিরসির করে কাঁপছে। আর ক্লান্ত স্বরে গুরগুর শব্দ করে উড়ে আসছে দুটো হেলিকপটর; পাখাতে রোদের আভার সোনা-রং জ্বলছে। দুটো সোনালী পাখি বলে মনে হয়।

কিন্তু রাজবাহাদুর যেন কেমন অদ্ভুত একটা ভঙ্গীতে ঘাড় কাত করে, আর ছোট ছোট চোখ দুটোকে কুঁচকে আরও ছোট করে দিয়ে, আর্ত মানুষের মত একটা বিষাদের মুখ নিয়ে হেলিকপটর দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে।

—ওরকম করে কী দেখছো রাজবাহাদুর? জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হেসে ফেলে শুক্তি।

রাজবাহাদুরের গলার স্বর ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে।—জওয়ানকা লাস আতা হ্যায়, দিদি।

—কি বললে? প্রশ্নটা যেন শুক্তির বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে দিয়ে আর স্তব্ধ নিঃশ্বাসটার ভিতর থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসে।

রাজবাহাদুর বলে—জখম লোগভি আতা হ্যায়।

শুক্তি—কিন্তু কোথায় আতা হ্যায়?

রাজবাহাদুর বলে—এয়ারপোর্টকা ময়দানমে ; কিন্তু আমি ঠিক জানি না দিদি।

সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। কত তাড়াতাড়ি কালো হয়ে গেল আর কনকনে ঠাণ্ডায় ভরে গেল তেজপুরের শীতের এই অদ্ভুত সন্ধ্যা।

শুক্তির ঘরের ভিতরে কিন্তু দপ করে আলো জ্বলে ওঠে। কে যেন ঘরে ঢুকেছে। আর সুইচ টিপেছে। মুখ ফিরিয়ে না তাকিয়েও বুঝতে অসুবিধা নেই শুক্তির, কে এসেছে।

কিরণলেখা বলেন—শুক্তি, চা খাবি চল।

কিন্তু কিরণলেখার এই স্নিগ্ধ আহ্বানের শান্ত হাসিটাকে চমকে দিয়ে ধুলো-ধুলো করে দেয় শুক্তির মুখের একটা কথা, শুকনো পাতার ঝড়ের মত একটা কথা।—আমি কিন্তু আজ কিছুই বলতে পারবো না, মা।

কিরণলেখা—কেন ?

শুক্তি—সুজিতবাবুর একটা খবর না পেয়ে আমি কিছুই বলতে পারবো না।

কিরণলেখা—কেন ?

শুক্তি—আমার কথায় চাকরি নিয়ে একটা মানুষ খুশি হয়ে যুদ্ধ করতে বুমলাতে চলে গেল। আজ পর্যন্ত তার কোন খবরই পাওয়া গেল না। ভাবতে আমার খুব খারাপ লাগছে ; লজ্জা হচ্ছে, স্বস্তিও পাচ্ছি না।

কিরণলেখা—কথাটা ঠিক। আমারও তো কয়েকবার মনে হয়েছে, কি হলো ছেলেটার ? কিন্তু সে-কথা ভেবে এদিকের সব কিছু তো অন্ধকার করে রাখা চলে না। সেটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

শুক্তি—কিন্তু এরকম বিশ্রী একটা অস্বস্তির মন নিয়ে আমিও যে কিছু বলতে পারছি না। বলতে ইচ্ছেই করছে না, বলতে ভালও লাগছে না।

কিরণলেখা—অদ্ভুত তোমার মন। বড় গোলমেলে মন।

শুক্তি হাসে।—তুমি আমাকে মিথ্যে নিন্দে করছো, মা।

কিরণলেখাও হাসতে চেষ্টা করেন।—বড় নরম মন তোমার। যাই হোক, এখন তাহলে জোড়হাটে তোমার প্রণব কাকার কাছে একটা চিঠি দিয়ে দেখ, সুজিতের কোন খবর পাওয়া যায় কিনা।

ও কি? রাস্তা দিয়ে একটা হল্লা ছুটে গেল কেন? এগিয়ে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিরণলেখা। ফটকের কাছে আবছা আলো-আঁধারের ভিতর থেকে রাজবাহাদুরের গলার স্বর চেঁচিয়ে ওঠে।—সেলা খতম।

—দুঃখের বিষয়…। ওদিকের ঘরে কড়কড় করে বেজে উঠেছে রেডিও।—আমাদের সেলা ঘাটির পতন হয়েছে। শত্রুর হামলা আরও এগিয়ে এসেছে; আমাদের জওয়ানেরা পিছিয়ে এসে বমডিলার ঘাটিতে দাঁড়িয়েছে। দিনরাত যুদ্ধ চলছে।

টলমল করে তেজপুর। খবরের চকিত আঘাতে আহত আর উদ্বিগ্ন তেজপুর। সিনেমা হাউসের কাউন্টারে টিকিট-কেনার ভিড়ও বিচলিত হয়ে সরে যায়। রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সীট বুকিং-এর তাড়াহুড়া ব্যস্ততার ভিড়ে ভরে যায়। বড়-বড় আর ভাল-ভাল অনেক মোটরকারের ধকধকে জ্বলন্ত হেডলাইট এয়ারপোর্টের সড়ক ধরে ছুটে চলে যেতে থাকে।

নীচের তলা থেকে একটা উতলা কণ্ঠস্বরও যেন টলমল করে আর সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে।—মা, আপনি কোথায়? একবার দেখুন এসে, বাবা কার সঙ্গে কী সব অদ্ভুত কথা বলছেন।

কালোর মা এসে যে কথা বলেন, সে কথা ভারতী নামে এই বাড়িটারই অদৃষ্টের একটা ভয়ানক খবর।—বাড়ি বিক্রী করতে চাইছেন বাবা।

কালোর মা'র কথা শুনে মণিমালার চোখেও একটা নির্বোধ বিস্ময় টলমল করে। নীচে চলে যান মণিমালা। গগন বসু আর কিরণলেখাও নামেন, পিছনে শুক্তি।

মহিমবাবুর হাতে বাড়ি-বিক্রীর একটা ডীডের খসড়া। টেলিফোনে

কথা বলছেন মহিমবাবু।—আপনি আজ এখনই চলে আসুন মিস্টার দোরজি। আমার সবই রেডি।…ও ইয়েস, আজই তেজপুর ছেড়ে চলে যাব।…না, কোন আক্ষেপ নেই। টাকা হাতে থাকলে সবই আমার দেশ।

টেলিফোনের আলাপ বন্ধ হবার পর গগন বসুর দিকে তাকিয়ে আর মৃদুভাবে হেসে কথা বলেন মহিমবাবু।—এবার চীনারা এসে গৃহপ্রবেশ করুক; আমার কোন আপত্তি নেই; আমার আর কোন আক্ষেপও নেই, গগনবাবু।

গগন বসু—আপনার কথা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

মহিমবাবু—বাড়ি বিক্রীর ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কালিম্পং-এর মার্চেন্ট মিস্টার দোরজি এই বাড়ি কিনতে রাজি হয়েছেন।

—শুনলে তো কিরণদি! কী সুন্দর ব্যবস্থা। আমার গৃহপ্রবেশের স্মরণদিন কী চমৎকার স্মরণীয় হয়ে উঠলো! মণিমালার দু'চোখ থেকে বড়-বড় জলের ফোঁটা ঝরতে থাকে।

মহিমবাবু—আমি আজই রাত্রে তেজপুর ছেড়ে চলে যাব। আপনি কী করবেন, গগনবাবু?

গগন বসু—যা বলেন। থাকতে বলেন, থাকবো; যেতে বলেন, যাব। আর, এরা কেউ যদি আমাকে বাধা না দেয়, আমি তবে কদমবাড়িতে চলে যাব। আমার তো কোন অসুবিধে নেই।

কিরণলেখা—আমরা তাহলে কলকাতা চলে যাই।

কাঙ্গোর মা বলেন—আমি আর কোথায় যাব? শিববাড়ির মন্দিরে গিয়ে পড়ে থাকবো।

এতক্ষণ মণিমালার হাত ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল শুক্তি। এইবার আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে মহিমবাবুর চোখের সামনে দাঁড়ায় আর হাসতে থাকে।—মেসোমশাই!

শুক্তির মুখের হাসিটাও অদ্ভুত; যেন দুরন্ত-করুণ একটা আবেদন। মহিমবাবু বলেন—তুই আবার কী বলতে চাইছিস?

শুক্তি—রাগ করে বাড়িটা বিক্রী করবেন না মেসোমশাই।

মহিমবাবু—কিন্তু…।

শুক্তি—না না, আপনি আর কোন কিন্তু-টিন্তু বলবেন না। বলতে বলতে মহিমবাবুর হাতের উপর লুটিয়ে পড়ে বাড়ি-বিক্রীর ডীডের খসড়াটাকে ধরে টানাটানি করতে থাকে শুক্তি।

মহিমবাবু—ওরকম করতে নেই শুক্তি। তুমি সংসারের নিয়ম-কানুন বোঝ না।

শুক্তি—হ্যাঁ, আমি কিছুই বুঝি না, বুঝবোও না। কিন্তু আপনি এটাকে এখন আমার কাছে রেখে দিন।

মহিমবাবু—কিন্তু গবমেণ্ট তো আমার সম্পত্তি বাঁচাতে পারবে না।

শুক্তি—দেখুন না, কি হয়? আরও ক'টা দিন ধৈর্য ধরতে দোষ কি?

মহিমবাবু—আর ধৈর্য!

মুখ ফিরিয়ে নিলেন মহিমবাবু; শুক্তির হাতে খসড়াটাকে ফেলে দিলেন।

কিরণলেখার চোখে তবু একটা প্রশ্নের ছায়া লেগে থাকে।—আজই যদি চলে যেতে হয় তবে…।

মণিমালা চেঁচিয়ে ওঠেন।—না, কখনো না, কারও যাওয়া হবে না। এত যাব-যাব করবার মত কিছু হয়নি।

[কুড়ি]

আবার একটা খবর। এ খবর যেন তেজপুরের শেষ আশার উপর একটা কঠোর ঠাট্টার বিস্ফোরণ, শেষ ধৈর্যের উপর একটা রূঢ় ধিক্কার আর শেষ বিশ্বাসের উপর একটা তিরস্কারের ঘোষণা। সন্ধ্যার রেডিও বলে দিল—বমডিলা শেষ!

রাতের রেডিওতে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা জানিয়ে দিল—আসামের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রইলো।

রাতের আকাশে একটি হেলিকপটর তীব্র আলোর ছটা ছড়িয়ে

ঘুরিয়ে নীচের তেজপুরের চেহারা দেখতে থাকে, কেমন করে ছটফট করছে তেজপুর।

পথের জনতার মুখে আতঙ্কের রব—চীনা প্লেন! বোমা ফেলবে চীনারা!

শিশির অমল আর আরও কয়েকটি ইয়েস ছেলে সারা শহর ছুটোছুটি করে বলে বেড়ায়—চীনা প্লেন নয়; আমাদের হেলিকপটর।

তেজপুরের ঘরে ঘরে রাত-জাগা মানুষের প্রাণ ছটফট করে। পাড়ায় পাড়ায় বাড়ির দরজার কাছে ঘরের মানুষের জটলা আর অনিশ্চয় অদৃষ্টের গুঞ্জন—যাব কি যাব না? থাকতে পারা যাবে কি যাবে না? আর থাকা উচিত হবে কি?

গোটা পাঁচেক আতঙ্কিত সাইকেল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে যায়।—চীনা আহিল! চীনা আহি গইছে। চীনালোগ আ গিয়া! এসে পড়েছে চীনারা!

—কোথায়? কোথায়? কত দূরে? একসঙ্গে শত লোকের শত মুখের করুণ প্রশ্ন হল্লা করে বেজে ওঠে।

—এই তো বালিপাড়ার কাছে এসে পড়েছে। আতঙ্কিত সাইকেলের ছুটন্ত ছায়া পাড়ার রাস্তা ছাড়িয়ে উধাও হয়ে যায়।

জগদীশ হিতেন আর আরও কয়েকটি ছেলে সাইকেল নিয়ে ছুটে ছুটে ভুল আতঙ্কের ঝড় শান্ত করতে চেষ্টা করে।—না না, সব মিথ্যে কথা। বাজে কথা, ওসব গুজবে একটুও বিশ্বাস করবেন না।

—কিন্তু মশাই, এটাও কি একটা বাজে গুজব যে, টাস্কারের দল দুমদাম করে সব সরঞ্জাম আছড়ে ভেঙ্গে পুড়িয়ে আর গুঁড়ো করে দিয়ে সরে পড়ছে?

জগদীশ বলে—শুনেছি, ওরা নানারকম কাণ্ড করে পালিয়ে যাচ্ছে।

—টাস্কার অফিসার-মেস তো একেবারে শূন্য। নয় কি? ওরা বোধহয় কালকেই যঃ পলায়তি স জীবতি করেছে!

হিতেন হাসে।—তাই তো মনে হয়।

পাড়ায় পাড়ায় মিলিটারীর অফিসারদের ভাড়া-করা এক-একটি বাড়ির ভিতরে নিঃশব্দ চুপি-চুপি ব্যস্ততা। লটবহর বাঁধাছাঁদা করে তৈরী হয়ে গিয়েছে অফিসারের দারা-সুত-পরিবার। হুস হুস করে মিলিটারীর জীপ আসছে, আলো মৃদু করে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে। অফিসারের প্রিয়-পরিজনে বোঝাই হয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে মিলিটারী জীপ।

—ও শিশিরবাবু, মিলিটারীর সব ফ্যামিলি যে চমৎকার সরে পড়ছে।

শিশির বিব্রতভাবে বলে—তা, কি আর করা যাবে বলুন।

—কিন্তু মুর্গীর খাঁচা আর মদের বোতলের বাক্সে বোঝাই হয়ে মিলিটারীর ট্রাকও যে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে শুরু করেছে।

অমল—হ্যাঁ, দেখেছি।

—একবার খোঁজ নিলেই তো পারেন, আমাদের মেজর কর্নেল আর ক্যাপ্টেন মশাইরা আর্মি কোয়ার্টারে এখনও আছেন, না কেটে পড়েছেন ?

শিশির—মনে হচ্ছে, এখন ওরা বোধহয়…।

—চম্পট দেবার তালে আছেন বোধহয়।

শিশির—তাই তো মনে হয়।

—জওয়ান মশাইরাও কি বোঁচকাবুঁচকি কাঁধে তুলে ফেলেছেন ?

অমল—তাঁবু গুটিয়ে ফেলছে।

—এরাও কি বমডিলার টাইগারদের মত জঙ্গলে ঢুকে পড়বে ?

অমল—সেটা আমি কি করে বলি ? তবে শুনেছি, ওরা শিলিগুড়ির দিকে সরে পড়তে চায়।

—লজ্জার কথা ! এই সব চম্পটপটু বীরদের জন্যেই না শীতের রাতে বাচ্চা ছেলেটার গা'র উপর থেকে লেপ তুলে নিয়েছি আর দান করেছি। ছিঃ।

যাব কি যাব না ? রাত-জাগা শহরের স্বস্তিহীন প্রাণের আক্ষেপ আর প্রশ্ন ভোরের আলো দেখতে পেয়েও কোন ভরসার সঙ্কেত দেখতে

পায় না। বরং দেখা যায়, একরাতের মধ্যেই শহরের এখান-ওখান থেকে কেউ যেন এক-একটা খাবলা দিয়ে মানুষের সাড়া তুলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। নীরব হয়ে গিয়েছে বড়-বড় বাড়ি। গ্যারেজ খালি। এয়ারপোর্টের এপাশে-ওপাশে সব ডাঙ্গা জুড়ে প্রভুবিহীন মোটরকার ছড়িয়ে পড়ে আছে।

দোকানে বেচা-কেনার সাড়া জাগে না, যদিও সকালবেলার রোদ তেতে উঠে বেলা বাড়িয়ে দিতে থাকে। সড়কের পাশে অলস হয়ে পড়ে আছে রিক্সার সারি। পানওয়ালার দোকানের ঝাঁপ অর্ধেক খোলা। কোর্ট কাছারী নিঝুম।

চক-বাজারের পথের জনতা হঠাৎ চমকে ওঠে, ও কি? কি বলছে মাইক?

—আপনা লোকে যেনে পারে টাউন এরি নিরাপদ ঠাঁই লৈ যাওক। আপনা লোকে যেনেকৈ পারে···। উচ্চকিত মাইকের স্বরে উপদেশ প্রচার করে করে চলে যাচ্ছে সরকারী পাবলিসিটির মোটর ভ্যান।

টলমল তেজপুর ভেঙে পড়ে। ধর বাস, ধর ট্রাক, ধর ট্রেন, চল ভোমড়াগুড়ি ঘাট।

নেবাও উনানের আগুন, হাঁড়ি নামিয়ে রাখ, চল, বেরিয়ে পড়।

গরুর গলার দড়ি খুলে দাও, থাক সাইকেলটা বারান্দাতেই পড়ে থাক। শুধু নগদ টাকা-পয়সা আর গয়না-টয়না যা আছে একটা ছোট ঝোলাতে ভরে নাও। আর যদি পার তো সের দুয়েক চাল, কয়েকটা আলু আর নুন।

আরে, রেখে দাও এখন তোমার নিত্যসেবার দেবী এই পিতলের জগদ্ধাত্রীটাকে; শিববাড়ির মন্দিরের দরজার কাছে রেখে দিয়ে চলে এস। ট্রাক না পাই হেঁটেই রওনা হব।

আঃ, মানুষ বসতে জায়গা পাচ্ছে না, আপনি আবার আপনার টিয়ে পাখিটাকে খাঁচাসুদ্ধ ট্রাকে তুলছেন। উড়িয়ে দিন ওটাকে আর খাঁচাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিন।

না মশাই, চলুন আমরা বরং ভোমরাগুড়ি হয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে চলে যাই। সড়ক ধরে যেতে হলে ধানসিরি ব্রিজের কাছে আটক হয়ে পড়ে থাকতে হবে। কেন জানেন তো? শোনেননি কিছু? আগে মিলিটারী পালাবে, তারপর আমরা সিভিলেরা। শীতলবাবুর ট্রাক বোকা হয়ে ফিরে এসেছে।

না, ভোমরাগুড়ি ঘাটে খুব বেশি অসুবিধে হবে না। ওখানে ইয়েস ছেলেরা আছে। ওরা খুব যত্ন করে স্টীমারে তুলে দেয়।

পুলিশ কোথায়? সরকারী কেস্টবিস্টুরা কোথায়? সবাই বুঝি ভাগোরথী হবার চেষ্টায় আছে। শুধু এই কয়েকটা ইয়েস ছোকরা আর কত ছুটোছুটি করে খাটবে?

একজন নিওমোনিয়া রোগী, তিনটি পোয়াতি মানুষ, আর একজন অন্ধ; আমাদের পাড়ার এই মানুষগুলোর কি গতি হবে, ও শিশিরবাবু? এরা যাবে কি করে?

শিশির—চিন্তা করবেন না। একটু অপেক্ষা করুন। আমরা ঠিক সময় মত এসে এদের ট্রাকে তুলে নিয়ে ভোমরাগুড়ির ঘাটে পৌঁছে দেব।

যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে চলে যেতে থাকে শহরের অসহায় প্রাণটার যত দুঃখ আক্ষেপ আর আতঙ্কের কলরব। ব্যাগ ঝোলা ও পোঁটলা হাতে নিয়ে বাড়ির মানুষ পথের উপর ছোট ছোট ভিড় হয়ে আর ট্রাকের আশায় উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকেল ফুরিয়ে যায়, সন্ধ্যা ফুরিয়ে যায়, রাত হয়; তবু ওরা নড়ে না। সাড়া জাগে তখন, যখন এক-দুজন ইয়েস ছেলে ট্রাক নিয়ে এসে ডাক দেয়—চলে আসুন।

তেজপুরের এই রাত; কী অদ্ভুত একটা চটুল-নিলাজ কালো রাত। কত তাড়াতাড়ি খালি হয়ে গেল, নীরব নির্জন আর স্তব্ধ হয়ে গেল শহরটা!

সার্কিট হাউসে আলো নেই। থানাতে পুলিশ নেই। হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, মেথর কেউ নেই। একলা রোগী বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। জেলে কয়েদী নেই, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাগলা ফটক খুলে দেওয়া হয়েছে।

পদ্মপুকুরের কিনারায় মাঠের ঘাসের উপর দাউ-দাউ করে নতুন নোটের স্তূপ জ্বলেছে আর পুড়ছে। ছায়া-ছায়া চেহারা, কারা যেন আবার ওদিকের এক অন্ধকারে ভয়ানক এক গোপন অন্ত্যেষ্টির মত সরকারী অফিসের যত টাকার হিসাবের খাতা আর ফাইল পুড়িয়ে ফেলেছে। শেয়াল ডাকছে ব্রহ্মপুত্রের চরে।

আর, বড়লোকের বাড়ি হয়েও, গ্যারেজে দুটো গাড়ি থাকতেও, ভারতীর নীচের তলার বড় ঘরে রাত-জাগা আলো জ্বলছে। এবাড়ির মানুষগুলি এখনও যায়নি।

সামনের সড়কের অন্ধকারের মধ্যে একটা জ্বলন্ত টর্চের আলো দুলছে। থেমে আছে হিতেনের সাইকেল। ভারতীর গেটের কাছে এগিয়ে এসে ডাক দেয় হিতেন।—এবাড়ির কেউ এখনও আছেন নাকি?

রাজবাহাদুর জবাব দেয়।—আছে। কেন?

হিতেন—এখন তো চলে যাওয়াই ভাল।

আবার টর্চ দুলিয়ে আর সাইকেল ছুটিয়ে চলে যায় হিতেন।

কিরণলেখা বলেন—শুনলি তো শুক্তি। এখন চলে যাওয়াই ভাল।

শুক্তি—হ্যাঁ…কিন্তু আর একটুখানি থেকে যাই, মা।

যাবার জন্য তৈরী হয়েই আছে এবাড়ির সব মানুষ। যা-কিছু সঙ্গে নেবার ছিল, তার সবই দুই গাড়িতে তোলা হয়ে গিয়েছে। তবু যে রওনা হতে এত দেরি হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ আর কিছু নয়, শুধু ওই শুক্তি।

মণিমালা তো অনেকক্ষণ হলো চোখ মুছে শান্ত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু শুক্তি হঠাৎ আনমনা হয়ে গিয়েছে। যেন চলে যেতে বাধছে। যেন বিপদের সঙ্গে প্রাণটাকে জড়িয়ে নিয়ে বসে থাকাও একটা মায়ার খেলা। তাই বার বার অনেকবার শুধু ওই একটি কথা বলে এই চলে যাওয়ার ব্যস্ততাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে শুক্তি।—যাচ্ছিই তো, কিন্তু একটু দেরি কর মণিমাসি।

মণিমালা—কিন্তু আর দেরি করা কি উচিত হবে? শহরে তো আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।

সত্যিই কি তেজপুরের কোন ঘরে কেউ আর নেই?

আছে। নতুনপাড়ার শীতল বিশ্বাস আছেন; এই মাঝরাতে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে নড়বড়ে একটা পুরনো ট্রাকের চাকায় জল ঢালছেন। আর, রতন যেন একটা নতুন আশার কালো-ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়; মাঝে মাঝে ডাকবাংলোর কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার শিশিরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। শিশির বলে—জ্বর গায়ে নিয়ে তুমি আবার এত রাতে মিছিমিছি ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? বাড়ি যাও রতন।

আছে; শীতল বিশ্বাসের মত আরও দু'চারজন এখনও আছে, যারা বুঝে নিয়েছে যে, রামেও মারবেন রাবণেও মারবেন, পালিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই।

আর আছেন তাঁরা, যাঁরা মুখ লুকিয়ে সরে পড়বার জন্য মাঝরাতের গভীর অন্ধকারটার অপেক্ষায় এতক্ষণ আড়ালে অদৃশ্য হয়েছিলেন।

হেসে ফেলে শিশির।—ওই দেখ অমল, দণ্ডমুণ্ডের একজন মহাপ্রভু কেমন চুপি-চুপি সরে পড়ছেন।

ঠিকই, অগ্নিগড়ের উঁচু টিলার মাথাতে একটি সরকারী অফিসার-ভবনের জানালার আলো হঠাৎ নিভে গেল, আর সড়ক ধরে একটা গাড়ি আস্তে আস্তে গড়িয়ে এসে তারপর জোরে স্পীড নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

—কিন্তু ওখানে একটা গাড়ি যে পিছু-বাতি নিবিয়ে দিয়ে একেবারে চুপটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। চলতে চলতে কথা বলে অমল। গাড়িটার কাছে এসে টর্চ ফ্ল্যাশ করে শিশির।

চমকে ওঠে অমল।—অ্যাঁ? মাফলার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে একটা বুদ্ধুর মত গাড়ির ভিতরে বসে আছে, কে ওটা?

শিশির বলে—তাই তো! এ যে দেখছি বিখ্যাত নেফা-অফিসার

মিস্টার মনোহর লাল, নেফা যার জমিদারী। কথা বলতে গিয়ে শিশিরের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে।

গাড়ির বাম্পারের উপর একটা পা তু[illegible]য়ে অমল চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনার তো পালিয়ে গেলে চলবে [illegible]র। আপনি চলে গেলে ইনার লাইন যে কেঁদে মরে যাবে।

কোন কথা বলেন না মনোহর লাল। একেবা[illegible]ীর স্থির শান্ত বোবা একটি মাটির পুতুলের মত নিরীহ হয়ে গাড়ির সীটের কোণে বসে থাকেন। তারপর চমকে-চমকে আর কেঁপে কেঁপে এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন, যেন একটা ভুতুড়ে হাত তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

হেসে ফেলে শিশির।—যেতে দাও, অমল। চল, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

সরে আসে অমল। সঙ্গে সঙ্গে মনোহর লালের গাড়িটাও স্টার্ট নিয়ে নড়ে ওঠে। অমল বলে—তবে যান মিস্টার আই এফ এ এস! পদ্মশ্রী পেলে কিন্তু আমাদের একবার স্মরণ করবেন।

ভাগ্যিস পাওয়ার হাউসের কয়েকটি কাজের মানুষ পালিয়ে যায়নি; তাই এই মাঝরাতের তেজপুরের নিরেট অন্ধকারে ভরা সড়কের এখানে-ওখানে লাইটপোস্টের মাথায় কিছু আলো জেগে আছে। কিন্তু ওখানে, একটু দূরে, গাছতলার বিদঘুটে অন্ধকারটাকেই [illegible]ছে নিয়ে কয়েকটা অপ্রাকৃত প্রাণী যেন ধস্তাধস্তি করছে। একটা গোঙানির শব্দও শোনা যায়; কেউ যেন কারও গলা টিপে ধরেছে। দৌড়ে এগিয়ে যায় শিশির আর অমল।

পাওয়ার হাউসের বুড়ো চাপরাশি বেচারাকে জাপটে ধরেছে একটা লোক। আর, একটা লোক এক হাতে বুড়োর মুখ চেপে ধরে বুড়োর জামা-কাপড় আর টাকা-পয়সা কাড়ছে। খাটো জাঙ্গিয়া আর ছোট কোর্তা পরা রূঢ় চেহারার দুটো জেল-ছাড়া কয়েদী।

অমলের হাতের স্টিকের বাড়ি খেয়ে সরে যায় কয়েদী দুটো।

তারপর দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায়। বুড়োর হাত ধরে শিশির।—ভয় নেই। কিন্তু এত রাত্রে বের না হলে কি চলতো না?

বুড়োকে বাজারের কাছাকাছি রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার ঘুরে যায় শিশির আর অমল।

এদিকের অন্ধকারে নয়, শহরের ওদিকে আমলাপটির রাস্তার একটা আলোর কাছে একটা লোক যেন শক্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সামনেই একটা বাড়ির দরজার কাছে একটা জীপগাড়ি, জিনিসপত্রে বোঝাই। বাড়ির দরজা মাঝে মাঝে একটু ফাঁক হয়, তারপরেই যেন শিউরে উঠে বন্ধ হয়ে যায়।

শূন্য তেজপুরের এই ভয়ানক কালো মাঝরাত কি নিদারুণ এক কৌতুকের সুখে বিচার-অবিচারের হিসাব-নিকাশ করবার একটা খেলা দেখাতে চায়? তা না হলে এরকম এক-একটা ঘটনা এখানে-ওখানে চমক-ছবির মত দেখা দেয় কেন?

শক্ত পাথরের মত দেখতে ওই লোকটা হলো জেল-ছাড়া কয়েদী, কৈলাস। আর ওই যে জীপ জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওটা পুলিশ লাইনের একটা জীপ। আর, মাঝে মাঝে বন্ধ জানালা ফাঁক করে কৈলাসকে দেখতে পেয়েই কাঁপা হাতে জানালা বন্ধ করে দিচ্ছেন যিনি, তিনি সেই উন্নতিময় পুলিশ অফিসার পরেশ ভট্টাচার্য, সরে পড়বার জন্য তৈরী হয়েও সরে পড়তে পারছেন না।

কিন্তু আর কতক্ষণ? বাড়ির বন্ধ দরজার কপাট খুলে বাইরে বের হয়ে এলেন পরেশ ভট্টাচার্য, পিছু পিছু পরেশ ভট্টাচার্যের স্ত্রী, যিনি উসকো-খুসকো মাথা আর শুকনো মুখ-চোখ নিয়ে, আর, একটা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছেন।

কৈলাসের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরেশ ভট্টাচার্যের গলার স্বর ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।—আমার স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ। সাত দিনেরও বেশি হলো জ্বরে ভুগছে।

কৈলাসের চোখ, ইস্পাতের গুলির মত চকচকে শক্ত চোখ হঠাৎ

যেন চুপসে নরম হয়ে যায়। কৈলাসের পাথুরে মাথাটাও দুলে ওঠে। মুখে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির ছটফটে হাসি।

খাটো জাঙ্গিয়া, গায়ে ছোট কোর্তা, কাঁধে বিড়ির আগুনে পোড়া ফুটো-ফুটো একটা কম্বল, কৈলাস যেন একজন যোগী পরমহংসের মত ভঙ্গী ধরে চলে গেল। পরেশ ভট্টাচার্যের মুখের দিকে আর একবারও তাকালো না ; একটি কথাও বললো না।

এদিকে ডাকবাংলোর গেটের কাছে হঠাৎ ছুটে গিয়ে রতনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে নিল শিশির। আর, একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে অমলের পিছনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন পলিটিকাল খোসলা সাহেব।

সরে পড়ছিলেন খোসলা সাহেব। গাড়ির ভিতরে সব জিনিসপত্র তুলেও ফেলেছিলেন। আর, স্ল্যাক-পরা ও ঘাড়ছাঁটা অদ্ভুত চেহারার এক ফিরিঙ্গী তরুণী-নারীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠতেও যাচ্ছিলেন। কিন্তু উঠতে পারেননি। কোথা থেকে ছুটে এসে খোসলা সাহেবের ঘাড়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে রতন—ক্যারেক্টার! পিয়নকা ক্যারেক্টার তো বহুত খারাপ হোতা হ্যায়, লেকিন বড়া সাহেবকা ইয়ে কওনসা ক্যারেক্টার ?

রতনকে ঠেলে ঠেলে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় শিশির।—ওর ক্যারেক্টার নিয়ে ওকে সরে পড়তে দাও, তুমি বাড়ি যাও।

রাগে ফুলে ফুলে গজগজ করে রতন।—আমার চরিত্র খারাপ বলে ইনি আমার চাকরি খেয়েছেন। এখন এঁর চাকরি খায় কে ?

অমল হাসে।—ওর চাকরি কেউ খাবে না। সেটা গ্রেট ডেমোক্রেসির নিয়ম নয়। কিন্তু তুমি চল এখন।

কে জানে জগদীশ আর হিতেন এখন কোন্ দিকে ঘুরছে। হাসপাতালে রোগী দুটোর কাছে এখন কে আছে ? বিলাস আর বিভূতি বোধহয়। কিন্তু লুটপাট করতে পারে, এমন কুমতলবের কিছু প্রাণী এদিকে-সেদিকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। টাউনটাকে একবার চক্কর দিয়ে ঘুরে দেখলে কেমন হয় ?

নতুনপাড়াতে এসে শীতল বিশ্বাসের তোবড়া লক্কড় ট্রাকটাকে নিয়ে ঘুরতে থাকে শিশির আর অমল। স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে হিতেন আর জগদীশকে দেখতে পেয়ে ট্রাকে তুলে নেয়। চেঁচিয়ে হাসতে থাকে জগদীশ।—আমার যে কেমন একটা রাজা-রাজা ভাব হচ্ছে হিতেন। তোমার হচ্ছে না বোধহয়।

হিতেন—না। আমার এখন এক পেয়ালা গরম চায়ের জন্য প্রাণটা ভিক্ষুক-ভিক্ষুক হয়ে রয়েছে।

মাধববাবুর শূন্য বাড়ির সামনের ঘরের দরজাটা খোলা; টর্চের আলো ফেলতেই দেখা যায়, চা চিনি দুধ কেটলি টি-পট আর পেয়ালা, সবই এক জায়গায় জড়ো হয়ে পড়ে আছে। কোন অসুবিধে নেই, শুধু জল গরম করে নিলেই পেয়ালা ভরে চা খেয়ে নিতে পারা যায়। শিশির হেসে হেসে ধমক দেয়।—না হিতেন, এখানে থামবে না। চল।

এস আই বি'র অফিসবাড়ি উত্তরায়ণ; গোয়েন্দাকুলচন্দ্র বিনা এ বৃন্দাবনও অন্ধকার। উত্তরায়ণের বারান্দাতে একটা বাছুর দাঁড়িয়ে আছে। সড়কের একটা লেটারবক্সের উপর একটা সাদা বিড়াল।

রবার বাগানের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ট্রাক থামিয়ে কি যেন দেখতে থাকে শিশির। নীরব নির্জন সড়ক ধরে এক বুড়ো ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন কোথায়?

ট্রাক থেকে নামে শিশির।—শুনছেন? কোথায় যাবেন আপনি?

—মহিম দস্তিদারের বাড়ি খুঁজছি।

শিশির—এই তো, এই যে সামনেই মহিমবাবুর বাড়ির ফটক।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি!

বুড়ো ভদ্রলোক ভারতীর ফটকের ভিতরে ঢুকতেই আবার ট্রাক ছুটিয়ে চলে গেল শিশির আর ইয়েস ছেলের দল।

ভারতীর বারান্দায় উঠে ডাক দেন বুড়ো ভদ্রলোক।—কেউ আছেন নাকি?

রাজবাহাদুর এসে চেঁচিয়ে ওঠে।—মামাবাবু!

বড় ঘরের দরজা খুলে কিরণলেখা আর মণিমালা বাইরে এসে চমকে ওঠেন।—মেজদা।

শুক্তি এসে হেসে ওঠে।—কি আশ্চর্য, ত্বলাল মামা এসেছেন? দেখলে তো মণিমাসি, আমি দেরি করিয়ে দিলাম বলেই না ত্বলাল মামাকে ফিরে পাওয়া গেল?

সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে ত্বলাল দত্ত হাসেন।—পাগলা ফটক খুলে দিয়েছে, তাই বের হয়ে এলাম; না এসে উপায় কি?···আচ্ছা, আমি এখন একটু জিরিয়ে নিই, কি বল কিরণ?

শুক্তির মুখের হাসিটা এইবার যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে।—এখন আর জিরোতে পারবেন না, ত্বলাল মামা।

—কেন?

—এখন তেজপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমরা সবাই যাব।

—কেন? তোমরাও সবাই অবাঞ্ছিত হয়ে গেলে নাকি?

—একরকম তাই।

—শুনলাম, নেফা থেকেও নাকি অবাঞ্ছিত হয়ে দলে দলে সবাই চলে আসছেন।

—আমিও শুনেছি। আপনি কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে যাবেন।

—তা মন্দ হয় না।

বাইরে আসেন গগন বসু।—আমিই স্টিয়ারিং-এ বসি। শুক্তি আমার পাশে বসুক।

শুক্তি—আমি ড্রাইভ করি, বাবা।

গগন বসু—না, আমিই পারবো। আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও তোর চেয়ে কিছু কম নয়।

কালোর মা বলেন—আমি তাহলে শিববাড়ির মন্দিরে···।

মণিমালা আর কিরণলেখা এক সঙ্গে ধমক দেন।—বাজে কথা বলো না, কালোর মা। চুপ করে গাড়িতে উঠে পড়।

রাজবাহাত্বর ডাকে—বাবা আসুন।

মহিমবাবু তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটেন, এগিয়ে যান, গাড়িতে উঠেই চোখ বন্ধ করেন।

ভারতীর ফটক খোলা রেখে দিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল দুই গাড়ি। এখান থেকে বের হয়ে, তারপর নর্থ ট্রাঙ্ক রোড ধরে এগিয়ে···তারপর দেখা যাক, কোথায় কতদূরে গিয়ে থামা যায়। মঙ্গলদই পৌঁছতে পারলে নরেশ কাঞ্জিলালের বাড়িতে কিছুক্ষণ রেস্ট নিতে পারা যাবে। —নরেশ কাঞ্জিলালকে চিনলি তো শুক্তি?

শুনতে পায় না শুক্তি। শুক্তির শূন্য মনটা যেন মানুষের পরিত্যক্ত ওই তেজপুরের ভয়ানক কালো মাঝরাতের অন্ধকারের মধ্যেই পড়ে আছে।

গগন বসু ডাকেন—শুক্তি!

যেন ধড়ফড় করে জেগে উঠে জবাব দেয় শুক্তি—কি বলছো, বাবা?

গগন বসু বলেন—আমাদের বাগানের মেশিনারী সাপ্লাই করে কলকাতার যে কাঞ্জিলাল অ্যাণ্ড সন্স, তারই মালিক নরেশ কাঞ্জিলাল।

[একুশ]

ফিরে চল ঘরের টানে! একদিন, দু'দিন, তিনদিন; তারপর পাল্টে গেল নাটকের সীন। সরে যাবার স্রোত এইবার যেন ফিরে আসার স্রোত হয়ে শূন্য দহ ভরে ফেলতে শুরু করেছে। ফিরে আসছে তেজপুরের লোক।

তেজপুরের ভাগ্যটাও বোধহয় সেই সার্কাসের মেয়েটার মত একটা মেয়ে, তারের উপর নাচছে। একবার ওদিকের ক্লাউনের হাতছানিতে ওদিকে চলে যায়, আবার এদিকের ক্লাউনের হাতছানিতে এদিকে ফিরে আসে।

ট্রেন ভরতি হয়ে, স্টীমার ভরতি হয়ে, আর চারদিকের যত সড়ক ধরে ছুটন্ত জীপ-ট্রাক-বাস আর মোটরকারে ভরতি হয়ে চলে আসছে তেজপুরে শহরের পলাতক প্রাণের কল্লোল।

চীনারা যুদ্ধ-ক্ষান্তি ঘোষণা করেছে। বলেছে, ওরা আর এগুবে না। কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে যেতে শুরু করবে। কিন্তু সর্ত এই যে…।

প্লেন-ভরতি হয়ে উড়ে উড়ে আসছেন যত পলাতক সম্পত্তিময় প্রাণ। এয়ারপোর্টের কাছে অনাথ হয়ে পড়েছিল যত মোটরকার, তারা আবার সনাথ হয়ে আর খুশি-হর্নের হর্ষ তুলে বড়-বড় বাড়ির গ্যারেজে ফিরে এসেছে আর আসছে।

দোকান-পাট খুলছে। ঘরে ঘরে উনানের ধোঁয়া। ছাড়া গরুর গলায় আবার দড়ি পড়েছে। আর, পাব্লিকের মরেল বুস্ট করবার জন্য নেতা, ভি-আই-পি আর মন্ত্রীও আসতে শুরু করেছেন। সার্কিট হাউসের খানসামার হাতে ট্রে-ভরতি পেয়ালা, আবার গরম চা টলমল করে।

শিলিগুড়ি থেকে মিলিটারীর ট্রেন এসে পড়েছে। কোর হেডকোয়ার্টারে অফিসারের ব্যস্ততা উঁকি-ঝুঁকি দেয়। ময়দানে সকাল-বেলার রোদে জওয়ানের প্যারেড মচমচ করে।

কি আশ্চর্য! হাসপাতালে ডাক্তার, পুলিশ লাইনে পুলিশ, আর আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট! তেজপুরের মানুষের চোখে দৃশ্যটা যেন ডি এল রায়ের কবিতার কথার মত একটা বল-কি-হে বিস্ময়!

মঙ্গলদই-এর কাঞ্জিলাল মশাই একটা জেদ করে ভালই করেছিলেন, গগন বসুকে আর তাঁর সঙ্গের সবাইকে শুধু ক'ঘণ্টার রেস্ট নিয়েই চলে যেতে দেননি। পুরো তিনটে দিন সবাইকে খুব যত্ন-সমাদর দিয়ে প্রায় বন্দী করে রেখেছিলেন।—এখান থেকে আবার এত তাড়াতাড়ি সরে যাবার কি দরকার, গগনবাবু? কিছুদিন থেকেই যান না কেন? সরে যাবার হলে আমাদেরও তো সরে পড়তে হবে।

কিন্তু রেডিও, খবরের কাগজ আর মঙ্গলদই-এর রাস্তার হল্লা একটা নতুন খবর ছড়িয়ে দিতেই হেসে উঠেছিলেন কাঞ্জিলাল মশাই।—এখন আপনাদের তাহলে তেজপুরেই ফিরে যাওয়া ভাল, গগনবাবু।

হ্যাঁ, তাই আর দেরি করেননি, ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হলেন

কদমবাড়ির গগন বসু, কিরণলেখা আর শুক্তি। তেজপুরের মহিমবাবু, মণিমালা, কালোর মা আর রাজবাহাদুর। আর একজন মানুষ, নেফার এক আকা গাঁয়ের পাশে আর বনসুমের জঙ্গলের ছায়ার কোলে যাঁর নিঃস্ব জীবনের একমাত্র শখের বাসাঘর, বাঁশ-বাঁখারির একটা চং এখনও নড়বড় করছে কিনা কে জানে, সেই দুলাল দত্ত তাঁর সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে বলেন—আবার তেজপুর!

ফিরে যাবার টানে আবার দুটি মোটর গাড়ি সকালবেলার রোদে ছুটে ছুটে আর ধুলোমাখা হয়ে তেজপুরে ফিরে আসে, আর রবার বাগানের ভারতীর খোলা ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকেই যেন রেস্ট ফিরে পাওয়ার সুখে অলস হয়ে থেমে যায়।

দোতলাতে শুক্তির ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যেয়েই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে শুক্তি।—আশ্চর্য মণিমাসি, আমার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। নিবিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম নাকি?

মণিমালার সারা মুখ জুড়ে আর-একরকমের খুশির হাসি থমথম করে।—ওঘরের ঘড়িটা এখনও কেমন টিক-টিক করে বেজে চলেছে, শুনছিস শুক্তি?

শুক্তির ঘরের টেবিলে দোয়াতের কালিও শুকিয়ে যায়নি, কলমটাও ঠিক সেখানেই পড়ে আছে, আর চিঠি লেখার কাগজের প্যাডও আছে।

এখন একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপাটাকে খুলে ফেলতে, তারপর একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে কোচের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার আগে জোড়হাটে প্রণব কাকার কাছে চিঠিটা লিখে ফেলাই ভাল।

কালোর মা যখন চা খাওয়ার জন্যে শুক্তিকে ডাকতে আসেন, তার আগেই শুক্তির চিঠি-লেখা শেষ হয়ে যায়। খুব বেশি কথা লেখবার তো কিছু নেই।—আপনি শুধু খোঁজ নিয়ে জানাবেন কাকা, আপনাদের নতুন প্লেটুনের হাবিলদার সুজিত রায়, বুমলাতে পোস্টিং হয়েছিল যার, সে এখন কোথায়? ফিরে এসেছে কি?—প্রণতা শুক্তি।

রবার বাগানের ভারতীর দোতলার একটি ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আর উঁকি দিয়ে তেজপুরের জীবনের কতটুকুই বা দেখতে চিনতে আর শুনতে পারা যায়, আবার কি-রকমের মুখর উপকথায় ভরে গিয়েছে তেজপুর? আর নেফার পাহাড়ের শুধু ওই মেঘলা রঙের চেহারাটাকে দেখেই বা কি আর কতটুকু বুঝতে পারা যাবে, ওখানে ঝুমের আগুনে পোড়া ক্ষেতের মাটির শক্ত ঢেলা ভাঙ্গতে গিয়ে দফলা মেয়ে রেনকি এখনও রতনকাকার জন্যে কেঁদে উঠছে কিনা? নেফার পাহাড়, জড়সড় হয়ে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা জড়তার পাহাড়। একটা নিরেট বোবা পাথরের পাহাড়।

খবরের কাগজে বিবৃতি হয়ে ছাপা হবার জন্যে কী ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এক-একটি ত্যাগ সাহস আর কর্তব্যনিষ্ঠার গল্প। টেলিফোনে ডেকে ডেকে আর গাড়ি পাঠিয়ে হোটেলে-হোটেলে প্রেসের মানুষ খুঁজছেন ওঁরা, বিবৃতি দেবার জন্য উন্মুখ যত সিভিল মিলিটারী আর পলিটিকাল। খবরের কাগজে ছাপার হরপের গল্প পড়ে তেজপুরের মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়, অফিসার মনোহর লাল সারারাত জেগে একাই হাসপাতাল পাহারা দিয়েছেন; মাঝে মাঝে রোগীদের মুখে জল দিয়েছেন। আর সিন্‌হা সাহেব একা বন্দুক হাতে নিয়ে সারারাত টেলিগ্রাফ অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুলিশের ভট্টাচার্য তাঁর অফিসের টেবিলের উপরেই সারারাত শুয়ে ছিলেন, এক পা'ও নড়েননি।

কিন্তু ওরা কোথায়, যারা শূন্যনগর তেজপুরের দুটো ভয়ানক কালো রাতে রাজা-রাজা হয়ে ঘুরে বেড়ালো? ওরাও আছে বইকি। কিন্তু থেকেও নেই। ওরা আবার সেই সামান্য সাধারণ পুরনো ছায়া হয়ে গিয়েছে। প্রাইমারী স্কুলের হাজিরা খাতার দিকে তাকিয়ে হিসেব করে শিশির, আর কতজন ছাত্রের ফিরে আসতে বাকি আছে। সামনের টেস্ট পরীক্ষার ভয় ভুলতে গিয়ে সিনেমার টিকেট কিনে নিয়ে হাউসের বারান্দায় ঘুর-ঘুর করে হিতেন। অমল আর জগদীশ বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে পান খায় আর গল্প করে।—আজ

আবার ডোগরা রেজিমেণ্টের কিছু লোক বের হয়ে চারদুয়ারে পৌঁছেছে।

—তুমি আজ চারদুয়ার গিয়েছিলে নাকি?

—হ্যাঁ। বমডিলা থেকে ওরা জঙ্গলে-জঙ্গলে দিনরাত হেঁটেছে, এক মুঠো ছোলাও খেতে পায়নি, মাঝে মাঝে শুধু বুনো কলা পুড়িয়ে খেয়েছে; দারুণ শীতে মুখের চামড়া ফেটে গিয়েছে, পায়ের ফোস্কা ঘা হয়ে গিয়েছে। ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতো, কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ছে, দেখলে মন ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়।

লোখরা থেকে প্রণবকাকার চিঠি আসতে খুব বেশি দেরি হলো না। শুক্তিকে শুধু সাতটা দিনের অপেক্ষা সহ্য করতে হয়েছে।

ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়ে শুক্তি। হাতটা চমকে চমকে কাঁপতে থাকে। তারপর শুক্তির দুই চোখ যেন অন্ধের দুটো নকল চোখের মত চকচকে পাথর হয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

লিখেছেন প্রণবকাকা।—কোন খবর নেই, শুক্তি। তবে বুমলাতে আমাদের আসাম রাইফেলের পোস্টের কী দশা হয়েছে, সেটা অনুমান করতে অসুবিধে নেই। হয় সবাই মরেছে, নয় কিছু মরেছে কিছু বেঁচেছে। যদি কিছু লোক বেঁচে থাকে, তবে তারাও হয় চীনাদের হাতে সবাই বন্দী হয়েছে, নয় কিছু বন্দী হয়েছে, কিছু পিছনে সরে আসতে পেরেছে। যদি কিছু লোক পিছনে সরে আসতে পেরে থাকে, তবে তারাও শেষে নিশ্চয় স্ট্র্যাগ্‌ল্ আউট করেছে।

শুক্তির দুই ঠোঁটও যেন শক্ত পাথর হয়ে গিয়েছে, কোন করুণ আক্ষেপও তাই বিড়বিড় করে উঠতে পারে না। শুধু মাথাটা যেন রাগ করে করে জ্বলছে আর বলছে—সবাই মরেছে, বাঃ, তার মানে সুজিতও মরেছে। মরলেই হলো! এত সহজে মরে গেলেই হলো? চালাকী? অসম্ভব। একটুও বিশ্বাস করা উচিত নয়।

চিঠিটাকে শক্ত মুঠোর চাপে দুমড়ে-মুচড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় শুক্তি।

চীনাদের হাতে বন্দী হয়েছে ? হোক না। মন্দ কি ? একদিন তো ফিরে আসবে। ফিরে এসে না হয় আবার লড়তে যাবে।

স্ট্র্যাগ্‌ল্ আউট করেছে ? তাহলে তো ভালই করেছে। না করে উপায়ই বা কি ? জঙ্গলে জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে আর দিশেহারা পথে ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্ট পাবে। তবু তো একদিন ঘরে পৌঁছে যাবে। হাত-পা না ভাঙলেই হলো।

তবে কি সুজিত সত্যিই ফিরে আসছে ? নিশ্চয় আসছে।

কিন্তু ফিরে আসতে আর কত দেরি করবে সুজিত ? আর কাউকে ভাল করে না চিনুক সুজিত, অন্তত ওর কাকিমাকে তো ভাল করে চেনে। ভেবে ভেবে কত ছটফট করছেন ওর কাকিমা বেচারা, সেটা সুজিতের মত মানুষের পক্ষে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। সুজিতের মনও সে-রকম নয়। তবে আর দেরি না করে চলে এলেই তো পারে। কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ নেই ; নিশ্চয় ইচ্ছে করে দেরি করছে না। যা বিশ্রী পাথর জঙ্গল আর পোকা-মাকড়ে ভরা ওই নেফা।

কিরণলেখা এসে বেশ একটু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করেন—জোড়হাট থেকে তোর প্রণবকাকার চিঠি এসেছে মনে হলো ?

শুক্তি—হ্যাঁ।

কিরণলেখা—কি লিখেছে ? সুজিতের খবর কি ?

শুক্তি—হয়তো মরেছে ; কিংবা··· ।

কিরণলেখা শিউরে ওঠেন।—ছি, ওরকম ভয়ানক বাজে কথা হয়তো করেও বলতে নেই।

শুক্তি—প্রণবকাকা যা লিখেছেন, আমি তাই বলছি। হয়তো বেঁচে আছে। বেঁচে থাকলে চীনাদের হাতে বন্দী হয়েছে কিংবা লুকিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে হাঁটা দিয়ে চলে আসছে।

কিরণলেখা—তাই বল ! তাই যেন সত্যি হয়। তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক ছেলেটা।

চলে গেলেন কিরণলেখা। বললে একটু খারাপ শোনায়, তাই শুক্তিকে একটা কথা বলতে পারলেন না। তাই পাশের ঘরে গগন

বস্থর কাছে গিয়ে কথাটাকে বলেই ফেলেন কিরণলেখা।—এটা তো একরকম খবর পাওয়াই হলো।

মরে-টরে যাওয়া, চীনাদের হাতে বন্দী হওয়া, আর জঙ্গলে-জঙ্গলে লুকিয়ে চলে আসা; সবই তো এক-একটা খবর। সুজিত ছেলেটার ভাগ্য নিশ্চয় এই তিন খবরের কোন একটা খবর হয়ে গিয়েছে।

গগন বস্থ—কিন্তু কোন্ খবরটা ঠিক?

তবে তো এই দাঁড়ায় যে, সুজিতের ভাগ্যের একটা ঠিক খবর যেদিন মুখর হয়ে উঠবে সেদিন শুক্তির মনের ইচ্ছাটাও মুখ খুলবে। তার আগে নয়। এটাই বা কেমনতর কথা। ওরকম একটা খবরের অপেক্ষা করে করে শুক্তির ভাগ্যটাও কি দিনের পর দিন অচল হয়ে পড়ে থাকবে?

শুক্তি কিন্তু ভাবতে ভুল করে না। না, এরকম করে শুধু একটা আওনকি আওয়াজ শোনবার জন্যে কান পেতে আর চুপ করে বসে থাকবার কোন মানে হয় না। শুক্তির প্রাণটা কি রাতের রেলগাড়ি যে, কেউ একজন এসে সবুজ বাতি দুলিয়ে দেবে, তবে চলতে শুরু করবে?

শুক্তির চোখে আনমনা ভাবনার ছায়া, কিন্তু দুই ঠোঁটে যেন শক্ত করে চেপে ধরা একটা অদ্ভুত হাসি। দেখতে পেয়ে একদিন মণিমালা জিজ্ঞাসা করেন—তুই তো এখনও কিরণদিকে ঠিক করে কিছু বললি না, শুক্তি। আমরা সবাই যে আশা করে তৈরী হয়ে রয়েছি।

শুক্তি—কি বললে?

মণিমালা—মাঘ হলে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়; না হয় ফাল্গুনেই হলো। কিন্তু তুই বলবি তো?

শুক্তি—বলবো।

মণিমালা—কিন্তু তুই নাকি বলেছিস যে, সুজিত নামে সেই হাবিলদার ছেলেটার একটা খবর না পেয়ে…।

শুক্তি হাসে।—হ্যাঁ বলেছি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমি

একটা খবরের সঙ্গে চুক্তি করে বসে আছি। খবর পেলে পাওয়া যাবে, না পেলে পাওয়া যাবে না।

মণিমালা—তাহলে…।

শুক্তি—প্রণবকাকাকে আর-একটা চিঠি দিয়েছি। সে চিঠির জবাব আসুক। তারপর…।

মণিমালা—তারপর কি?

মণিমালার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে হাসতে থাকে শুক্তি। —তারপর যা বলবার বলেই দেব। তুমি এখন যাও তো মণিমাসি।

কিন্তু জোড়হাট থেকে প্রণবকাকার চিঠির আশায় চুপ করে বসে থাকতেও যে ভাল লাগে না। বার বার শুধু মনে হয়, এতদিনে নিশ্চয় এসে পড়েছে সুজিত। শুধু ওর খবর জানবার জন্যে কেউ ব্যস্ত নয় বলেই সুজিত একটা অচেনা বস্তুর মত কোথাও পড়ে আছে। কে জানে কুমুদ ডাক্তার এখন কোথায় আছেন? সুজিতের কাকিমাই বা কোথায়? ওঁরা কিছু জানতে পেলেন কি না পেলেন, সেটাও তো জানবার কোন উপায় নেই।

ও দৃশ্য দেখলে চোখ জ্বলে যায়! নেফার পাহাড়ের উপর দিয়ে কত হেলিকপটর রোজই আসছে। রাজবাহাদুরও রোজ সেই একই কথা বলছে; আওরভি আয়া, অওরভি জখম জওয়ান লোগ আ রহা।

কিন্তু নাম-ধাম জানবার তো কোন উপায় নেই। অদ্ভুত এক সিকিওরিটি ওদের কম্বলে জড়িয়ে আর আড়ালে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

শুক্তির ইচ্ছের জেদ সহ্য করতে গিয়ে রাজবাহাদুরকে একদিন লোখরা ঘুরে আসতে হলো।

না, লোখরাতে এখনও কোন ফিরতি জওয়ান পৌঁছয়নি। হাবিলদার সুজিত রায়ের খবরও কেউ বলতে পারেনি। রাজবাহাদুরের পুরনো বন্ধু জমাদার ধনরাজ লিমবু খুব জোরে মাথা কাঁপিয়ে আক্ষেপ করেছে, না, আর ভাবনা করবার কিছু নেই। গঙ্গাপানি পি লিয়া হাবিলদার সুজিত।

—কি বললে রাজবাহাদুর? শুক্তির গলার স্বর শিউরে ওঠে।

রাজবাহাদুর—জমাদার লিমবু বোলতা হ্যায়, বুমলাওয়ালা জওয়ান লোগ সব খতম হো গিয়া।

—যত সব মিথ্যে কথা। মাথামুণ্ডু নেই, বাজে কথা।

সরে যায় শুক্তি। রাজবাহাদুর যা বলছে, সেটা তো একটা নিরেট অজ্ঞতার মন-গড়া যত জল্পনার রক্তমাখা উল্লাস। জঘন্য। শুনলে কান দুটোও যেন ঘিনঘিন করে।

সরে গিয়েও কোথাও কিন্তু শান্ত হয়ে বা শ্রান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না শুক্তি। ঠিক খবর যে পেতেই হবে। চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না।

নীচের তলায় নেমে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডাকাডাকি করে শুক্তি।—হ্যালো···পি টি আই···আপনি পি টি আই? মিস্টার গাঙ্গুলী?

—হ্যাঁ।

—আপনি নিশ্চয় বলতে পারবেন, স্ট্র্যাগলার যারা চলে আসতে পেরেছে, তাদের নাম কেমন করে জানা যায়?

—এখন জানবার উপায় নেই। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি যেদিন জানাবেন, সেদিন জানতে পারা যাবে, তার আগে নয়।

—যারা আসছে, কিন্তু এখনও পৌছতে পারেনি, তাদের নামও কি জানতে পারা যায় না?

—এটা কি-রকমের কথা বললেন? হেসে ফেলেন গাঙ্গুলী।

—আমি বলছি, যারা চলে আসতে পেরেছে, তারা তো বলতে পারে, আর কে কে আসছে, কোথাও তাদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়ে থাকতেও তো পারে।

—তা হয়তো হয়েছে। তাহলে আপনি একটা কাজ করুন। কাউকে চারদুয়ারে পাঠিয়ে খোঁজ নিতে চেষ্টা করুন। শুনছি, সেখানে রাজপুত রেজিমেন্টের কিছু লোক এসেছে।

—আমি আসাম রাইফেলের একজনের খবর চাইছি।

—তাহলে বরং আপনি আজই কাউকে রাঙ্গাপাড়া পাঠিয়ে দিন। আসাম রাইফেলের একজন ডাক্তার, ডাক্তার চক্রবর্তী সেখানে আজ তিন-চারদিন হলো এসেছেন। শুনেছি তিনি স্ট্র্যাগল করে প্রায় একুশদিন পরে খুব কাহিল অবস্থায় রাঙ্গাপাড়াতে পৌঁছেছেন।

—রাজবাহাদুর! তুমি কোথায়? ডাকতে থাকে শুক্তি।

—জী হাঁ, দিদি; বলুন।

শুক্তি—তোমাকে এখনই একবার রাঙাপাড়া যেতে হবে।

—বোহোৎ আচ্ছা!

শুক্তির সব উপদেশ আর নির্দেশ মন দিয়ে শুনে নিয়ে রাঙাপাড়া রওনা হয়ে যায় রাজবাহাদুর।

সবই দেখতে আর শুনতে পান কিরণলেখা। শুক্তি যেন মরিয়া হয়ে একটা ব্যাকুল ব্যস্ততার খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে। আর ছুটে ছুটে হয়রান হচ্ছে বেচারা রাজবাহাদুর।

এই ব্যস্ততাকে যেন একটা নিয়ম করে ফেলেছে শুক্তি। সারাদিনের মধ্যে অন্তত একবার টেলিফোন করে পি টি আই-এর গাঙ্গুলীকে বিরক্ত করা আর জেনে নেওয়া, নেফার জংলী বাধা ভেদ করে কে কোথায় ফিরে এল। তারপর রাজবাহাদুরকে একবার তাড়া দিয়ে দৌড় করানো।—যাও, রাজবাহাদুর। শুনে এস, কী বলে ওরা, কোন খবর দিতে পারে কি না?

যাও রাজবাহাদুর, আজ একবার কুটহিলের ক্যাম্পে গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে এস। আজ একবার চারদুয়ারে যেতে হবে রাজবাহাদুর। আজ একবার এল বি রোডে সামন্তবাবুর বাড়িতে যাও। একজন ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন রায় এখন সে বাড়িতে আছেন। নেফার ভেতর থেকে এই তিন দিন হলো বের হয়ে এসেছেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করে এস তো, কোন খবর দিতে পারেন কিনা।

আরও দুদিন দু'বার দু' জায়গাতে গিয়ে আর খোঁজ নিয়ে ফিরে এসেছে রাজবাহাদুর। শুধু শ্রান্ত আর ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে

রাজবাহাদুর। যার খবরই নেই, তার খবর দেবে কে? কী আশ্চর্য; কেন যে ঝুটমুট এত তকলিফ করছেন দিদি, কিছু বোঝা যায় না।

অনেক গল্প এনে দিয়েছে রাজবাহাদুর। আর কত আনবে? ডাক্তার চক্রবর্তীর গা বিছুটির ঘষা খেয়ে খেয়ে ঘা হয়ে গিয়েছে। একটা পাথরের খাড়াই টপকাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন, বাঁ পায়ের দুটো আঙুল ভেঙে গিয়েছে।...কিন্তু সুজিত হাবিলদার নামে কারও খবর তো আমি জানি না। তবে সেলা থেকে সরে আসবার আগে শুনেছিলাম, আমাদের বুমলা পোস্টের কয়েকজন জওয়ান রিট্রিট করতে পেরেছিল।

ক্যাপ্টেন রায় বলেছেন—আমাদের খুব বেশি অনাহার সহ্য করতে হয়নি। বুঝলাম না, দাগানিয়া বস্তির আকারা আমাদের কেন এত সাহায্য করলো? বুঝলাম না, ওদের ঘরে ঘরে কেষ্টবিষ্টুর এত ছবিই বা এল কি করে? মজার ব্যাপার; পাকা চুলে ভরা সাদামাথার এক সুবেদারকে ওরা সব চেয়ে বেশি যত্ন-আদর করেছে। মকাই চাল মাংস, যা যোগাড় করতে পেরেছে তাই এনে ওরা আমাদের খাইয়েছে। আমাদের অনেক লোককে ওরা ওদের জামা-কাপড় পরিয়ে ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। চীনারা দেখেও কিছু বুঝতে পারেনি।...হ্যাঁ, বেশ কষ্ট হয়েছিল পিঙ্গোলি রোডহেড পর্যন্ত পৌছতে। সারা রাত ধরে বেতের জঙ্গল কেটে কেটে রাস্তা করা, আর আগুন জ্বেলে হাতি খেদানো!...কিন্তু আসাম রাইফেলের কারও সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি। শুনেছি, বুমলার কেউই সরে আসতে পারেনি।

চারদুয়ার ক্যাম্পের রাজপুত রেজিমেন্টের নায়েক কুন্দন সিং বলেছে, হ্যাঁ শুনেছি, বুমলাতে আসাম রাইফেলের একজন হাবিলদার একা দাঁড়িয়ে আর এল এম জি নিয়ে কভারিং ফায়ার রেখেছিল; কিন্তু সে কি আর আছে?

ফুটহিলের এক ক্যাম্পের কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে আর অনেক চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারেনি রাজবাহাদুর। ক্যাম্পের

বাইরে একজন সুবেদারকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বড় বড় চোখ করে চমকে উঠেছেন।—বুমলা? আসাম রাইফেলকা [illegible]? বাস্, আওর কুছ পুছিয়ে নেহি। নমস্তে!

বাস্, তবে আর কি? এইবার একটা উড়ন্ত হেলিকপটরের দিকে তাকিয়ে, আর হাত তুলে একটা নমস্তে জানিয়ে দিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেই তো হলো। ডেড বডি কোলে নিয়ে আর উড়ে-উড়ে খবরহীন জগতের মেঘের ভিতরে চিরকালের মত মিলিয়ে যাক হেলিকপটর। শুক্তির প্রাণটাও এই অদ্ভুত মিথ্যে ব্যস্ততার সব ধুলো ধুয়ে মুছে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিন্তু সকালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতেই শুক্তির মনে যেন একটা পাগল-পাগল শখের লোভ ছটফট করে হাসতে থাকে। একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না কেন? মা বলবেন, তোর মাথা খারাপ হয়েছে। বাবা বলবেন, ওখানে সিকিওরিটির নিষেধ আছে, কাছে যেতে পারবি না, জেনে শুনে মিথ্যে হয়রান হবার দরকার কি? মণিমাসি বলবেন, এতদিন পরে তোর আজ আবার হঠাৎ ছুটোছুটি করবার ইচ্ছে হলো কেন?

শুক্তি—রাজবাহাদুরকে একবার বলে দাও, মণিমাসি।

মণিমালা—কি বলবো?

শুক্তি—আমি একবার বের হব।

কিরণলেখা—কোথায় বের হবি?

শুক্তি হাসে।—একবার এয়ারপোর্ট ঘুরে আসি।

মণিমালা—এয়ারপোর্ট কি বেড়াবার জায়গা?

শুক্তি—বেড়াতে তো যাচ্ছি না, শুধু একটু দেখতে যাচ্ছি।

কিরণলেখা—কি দেখবার আছে সেখানে?

শুক্তি—রাজবাহাদুর বললে, ফুটহিলের ক্যাম্প থেকে ট্রাকে করে জখম জওয়ানদের এয়ারপোর্টে আনছে আর প্লেনে তুলে দিচ্ছে।

কিরণলেখা—ওটা কি দেখবার মত একটা চমৎকার দৃশ্য?

শুক্তি—আমি ভাবছি, হঠাৎ যদি সুজিত বাবুকে দেখতে পাওয়া যায়।

কিরণলেখার কথাগুলি বেশ রুক্ষস্বরে বেজে ওঠে।—কী অদ্ভুত তোমার শখ। দেখে এসো তাহলে।

অদ্ভুত শখ নয়; জাগা চোখে স্বপ্ন দেখবার অদ্ভুত বাতিক। মিথ্যে বলে বুঝতে পেরেও দেখতে ইচ্ছে করে।

এয়ারপোর্টে গিয়েও কিছু দেখতে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। একটা ট্রাকের ভিতর থেকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা তুলে সুজিত উঁকি দিয়ে তাকাবে, এটাও একটা মিথ্যে আশা। কেউ কাউকে দেখতে পাবে না, তবু এয়ারপোর্টের বাতাসে প্রতিধ্বনির মত একটা শব্দ বেজে উঠবে, আমি এসেছি; এমন চমৎকার একটা ম্যাজিক ব্যাপারও সম্ভব নয়। তবু সত্যিই যে একবার ঘুরে আসতে ইচ্ছে করে। কত খোঁজই তো মিথ্যে হয়ে গেল, না হয় এই শেষ খোঁজও মিথ্যে হয়ে যাবে।

শুক্তি বলে—আমি শুধু একটা চান্স নিচ্ছি, মা। জানি কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না, তবু যদি হঠাৎ···।

হেসে ফেলেন কিরণলেখা।—যাও, কিন্তু ফিরতে দেরি করো না।

[বাইশ]

শুক্তি বলে—একটু আস্তে চল রাজবাহাদুর।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পীড মৃদু করে দেয় রাজবাহাদুর। শুক্তি যদি না বলতো, তবে রাজবাহাদুর বোধহয় সামনের ওই দুই মিলিটারী ট্রাকের পাশ কাটিয়ে সবেগে এগিয়ে চলে যেত।

তাঁবুর মত করে ছাউনি দিয়ে ঢাকা দুটো ট্রাক আস্তে আস্তে এয়ারপোর্টের দিকে চলে যাচ্ছে। পিছনে শুক্তির গাড়ি। দেখতে অসুবিধে নেই, বুঝতেও অসুবিধে নেই, কয়েকজন জখম সৈনিককে বয়ে নিয়ে চলেছে এই দুই ট্রাক। ট্রাকের ভিতরে আর্মি মেডিক্যালের

একজন অফিসার একটা কাঠের বাক্সের উপর চুপ করে বসে আছেন। দুটো স্ট্রেচারকে তো বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কম্বলে ঢাকা হয়ে এই স্ট্রেচারে শুয়ে আছে যে-দুজন আহত, তাদের মুখের সামান্য একটু আবছা-চেহারা শুধু দেখা যায়।

নিঃস্পন্দ মূর্তি, নিষ্পলক চোখ, শুক্তির বুকটাও যেন সব নিঃশ্বাসকে নীরব করে দিয়ে ধরে রেখেছে।

সামনের ট্রাকের চাকা বড় বেশি ধুলো ওড়াতে শুরু করেছে। শুক্তির নিষ্পলক চোখ দুটো চমকে ওঠে।—একটু রোকো রাজবাহাদুর।

গাড়ি থামে। ট্রাক দুটো বেশ দূরে চলে যায়। দেখতে পাওয়া যায়, ওদিক থেকে উড়ন্ত ধুলোর ভিতর দিয়ে একটা সাইকেল-রিক্সা সড়কের গর্ত মাড়িয়ে আর ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে এগিয়ে আসছে।

বড় ভুল হতো শুক্তির, যদি এই সময় ধুলোর ভয়ে রুমাল তুলে চোখ-মুখ ঢাকা দিত। দেখতেই পেত না যে, রিক্সার উপরে এমন একটি মানুষ বসে আছে, যার কথা আজও শুক্তির একবার মনে পড়েছে।

রিক্সাতে বসে আছেন আর হাসছেন সুজিতের কাকিমা। তাঁর পাশে খুব রোগা দেখতে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক একটা লালসুতির চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে অছেন।

এটা তো আর জাগা-চোখে দেখা একটা স্বপ্ন নয়। এটা কল্পলোকের একটা জায়গাও নয়। গর্তে ভরা একটা সত্যিকারের সড়কের উপর দিয়ে তেজপুরের সাইকেল-রিক্সা লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। কিন্তু শুক্তির চোখ দুটো যেন কল্পলোকেরই একটা বিস্ময় দেখে ছটফট করতে থাকে। আর বুঝতেও দেরি হয় না, সুজিতের কাকিমা কেন এত হাসছেন।

—এই রিক্সা থাম।···শুনছেন? চিনতে পারছেন? শুক্তির ডাক শুনে রিক্সার ভিতর থেকে একটা খুশি-উতলা মূর্তি ধরে নেমে আসেন সুজিতের কাকিমা, প্রিয়বালা।—ওমা? এ কি? সাহেবের মেয়ে নাকি?

গাড়ি থেকে নামে শুক্তি।—হ্যাঁ, আমি শুক্তি। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—গিয়েছিলাম ওখানে, এয়ারপোর্টে। রোজই তো যেতাম। তিনদিন হলো তেজপুরে এসেছি।

—আপনি ওখানে কেন যেতেন?

—যাব না? না যেয়ে পারি? কেউ যখন আমার সুজিতের কোন খবর দিলে না, তখন বলাই বললে, চল মামী, এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি, শুনেছি ওখানে রাইফেলের লোকজন আসছে আর চলে যাচ্ছে।

—বলাই কে?

—এই তো বলাই।

লাল সুতির চাদর গায়ে জড়ানো, রোগা ভদ্রলোক রিক্সা থেকে নেমে এসে বলেন—আমি রিফিউজি মানুষ। একটা রিক্সা খাটাই, এ ছাড়া আর কোন রোজগার নেই। পঙ্গু স্ত্রী, বুড়ো মা, আর···।

প্রিয়বালা—তেজপুরে বলাইয়ের বাড়িতেই আছি। আপনাদের ডাক্তারবাবু এখন আছেন রঙ্গিয়াতে। খুব অসুস্থ। আমিও রঙ্গিয়া থেকেই এখানে এসেছি। এইবার ফিরে যাব।

—সুজিতবাবুর খোঁজ পেয়েছেন নিশ্চয়?

—পেয়েছি, পেয়েছি। এই তো আজ এইমাত্র পেলাম। তাই তো ফিরে যাচ্ছি।

—কে দিল খবর?

বলাইবাবু বলেন—আজ এয়ারপোর্টে লোখরার একজন জমাদারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তার কাছেই শুনলাম, সুজিত ফিরেছে, ভাল আছে, শুধু তিনটে দিন হাসপাতালে ছিল।

প্রিয়বালা মাথা নাড়তে থাকেন।—বাবা রে বাবা, কী মিথ্যুক ছেলে এই সুজিত। ওর কাকাও কী ভয়ানক মিথ্যুক। আমাকে হেনতেন কত কী না বুঝিয়ে দিলে, বুমলা নাকি চারদুয়ারের কাছে খুব ভাল একটা জায়গা। ও ছেলে যে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে সেই নেফা পাহাড়ে সরে পড়বে, যে নেফার পাথর ওর বাপকে মেরেছে, এ তো

আমি স্বপ্নেও সন্দেহ করিনি। কেঁদে কেঁদে আমার চোখে ঘা হয়ে গিয়েছে। এই দেখুন আপনি, একবার নিজের চোখে দেখে নিন।

শুক্তি—যাক, যা হবার হয়ে গেছে; এবার নিশ্চিন্ত হয়ে রঙ্গিয়া ফিরে যান।

প্রিয়বালা—হ্যাঁ, খুব নিশ্চিন্ত। দুঃস্বপ্ন গেল।…হ্যাঁ, আপনাদের খবর একটু বলুন। সাহেব কোথায় আছেন? আপনার মা কোথায়?

শুক্তি—আমরা সবাই এখন তেজপুরে আছি।

প্রিয়বালা—কদমবাড়ি যাবেন কবে?

শুক্তি—ঠিক জানি না।

প্রিয়বালা—আমাদের আর কদমবাড়ি যাওয়া হবে না। ভাবলে বড় দুঃখ হয়।

শুক্তি—কদমবাড়ি আর যাবেন না কেন?

প্রিয়বালা—ওর ভাঙা শরীরে আর চাকরি পোষাবে না। ভাগ্যি ভাল যে, এককালে রঙ্গিয়াতে একটা কুঁড়েঘর তুলে রেখেছিল, এখন তাই একটা ঠাঁই হলো।

শুক্তি—আচ্ছা, আপনি আসুন এখন।

প্রিয়বালা—আপনারা কোন্ পাড়াতে আছেন?

শুক্তি—রবার বাগানে; বাড়ির নাম ভারতী।

বলাইবাবু বলেন—হ্যাঁ, মহিমবাবুর বাড়ি; সে-বাড়ি কে না চেনে?

প্রিয়বালা—যাই বলুন, রঙ্গিয়া বলুন আর তেজপুর বলুন, কদমবাড়ির মত সুন্দর কেউ নয়। কদমবাড়ির গাছের দুটো নাগকেশরে পুজোর থালা ভরে যায়। এক জ্বালের দুধে এই মোটা সর পড়ে। জল-বাতাসও কত মিষ্টি!

শুক্তি হাসে।—তবু তো কদমবাড়িকে ছেড়ে দিলেন।

প্রিয়বালা—ভাগ্য যদি ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে আর কি করবার আছে বলুন? আচ্ছা, চলি।

চলে গেল রিক্সা।

এইবার রাজবাহাদুরকে গাড়ি ফেরাতে বললেই তো হয়। কত খুশি হয়ে হাসছে রাজবাহাদুর। সুজিতের কাকিমার সব কথার সবই তো শুনতে পেয়েছে।

অনেকক্ষণ তো হলো, তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শুক্তি। পথের লোক দেখলে সন্দেহ করবে, গাড়িটা বুঝি অচল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজবাহাদুর ঠিক সন্দেহ করবে, অচল হয়ে গিয়েছে দিদি।

রাজবাহাদুর এখন যদি সত্যিই হঠাৎ একটা কবিত্ব করে বলে দেয়—আওন কি আওয়াজ তো মিল গিয়া, দিদি, এখন ফিরে চলুন; তবে? শুক্তি কি তবে না হেসে আর খুব গম্ভীর হয়ে বলতে পারবে, হ্যাঁ চল।

কি আশ্চর্য, রাজবাহাদুর সত্যিই যে গাড়িটাকে ফেরাতে শুরু করেছে। গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলে শুক্তি।—হ্যাঁ, ঠিক করেছো, বেশ করেছো, চল।

ভারতীর একটি ঘরের ভিতরে বসে কিরণলেখাও হাসছেন। শুক্তি এসে পৌঁছতে আরও খুশি হয়ে হেসে উঠলেন কিরণলেখা।—জোড়হাট থেকে তোর প্রণবকাকার চিঠি এসেছে, শুক্তি।

শুক্তি—বলতে পারি, কি লিখেছেন প্রণবকাকা। সুজিতবাবু ফিরে এসেছেন।

কিরণলেখা—কি করে বুঝলি?

শুক্তি—তোমার মুখের হাসি দেখেই বুঝেছি। তা ছাড়া পথেও একজনের মুখে হাসি দেখলাম।

কিরণলেখা—কে?

শুক্তি—ডাক্তারবাবুর স্ত্রী; সুজিতের কাকিমা।

কিরণলেখা—তাই নাকি? যাক, খুব ভাল হলো, ডাক্তার-গিন্নী এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবে।

শুক্তি হাসে।—আমাদের রাজবাহাদুরও এইবার হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হবে।

কিরণলেখা—হবেই তো। সামান্য একটা খবর জানবার জন্যে ছুটোছুটি করে লোকটা এতদিন কী হয়রানই না হয়েছে।

হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে কিরণলেখারও মন। তা না হলে এখন শুক্তির মুখের দিকে ওরকম শান্ত আর স্নিগ্ধ দুটো মায়ার চোখ তুলে তিনি তাকিয়ে থাকতে আর হাসতে পারতেন না।

আর শুক্তি? কিরণলেখার চোখের সামনের কোচের উপর একটা ক্লান্ত শরীরের সব ভার অলস করে লুটিয়ে দিয়ে বসে আছে যে শুক্তি, সে শুক্তি সত্যিই একটা হাঁপ ছাড়ে। তারপর উঠে দাঁড়ায়; আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়। আজ শুক্তি নিজেই যে সব চেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত একটা শ্রান্তি।

কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে আর মিররের সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলতে গিয়েই চমকে ওঠে শুক্তি; আর কথা বলে ফেলে।—এ কি হলো?

ছি ছি, চোখ দুটো জলে ভরে গেল কেন? বুকটা এমন করে ফুঁপিয়ে উঠলো কেন? শুধু একটা কথাই বার বার মনে পড়ছে কেন?

খোঁপা বাঁধে শুক্তি। চোখ মুছতে হবে, তাই তোয়ালেটাকে হাতে তুলে নেয়। কিন্তু ভাবতে অদ্ভুত লাগে, কি আশ্চর্য, একথা তো কোনদিনও মনে হয়নি। কোনদিন তো বুঝতেও পারা যায়নি।

তবে আর কি? কিছুই না। কিন্তু মা যেন সেই অদ্ভুত কথাটা আর জিজ্ঞেসা না করেন যে, কাকে ভাল লাগে? ও কথার জবাব দেবে না, দিতে পারবে না শুক্তি। মা যেন শুধু জিজ্ঞেস করেন, কাকে ভাল মনে হয়।

তেজপুরের শীতের বিকেলের শেষ আলোতে দূরের ধুলোর চেহারা রঙীন গোধূলির মত হয়ে উঠলো কিনা, সেটা আজ আর দেখতে চেষ্টা করে না শুক্তি। হাতে-ধরা বইটার উপর যেন ঘুম-ঘুম চোখের একটা ক্লান্ত দৃষ্টি গড়িয়ে দিয়ে সোফার উপর চুপ করে বসে থাকে। হঠাৎ এক-একবার মনে পড়ে যায়, আর মনে পড়তেই হেসে ফেলে, দিবুদা মাঝে-মাঝে যে কবিতার বইটা খুব সুর করে পড়তেন, সে কবিতার শেষে একটা চমৎকার কথা ছিল—তমাম শোধ।

এই বিকালের ডাকে আরও কয়েকটা চিঠি এসেছে, সেগুলিও যেন এক-একটা নিশ্চিন্ততার চিঠি। কদমবাড়ি থেকে ম্যানেজার ব্যানার্জির অনেক চিঠি নিয়ে একজন লোক এসেছে। সেসব চিঠি এখনও পড়ে শেষ করতে পারেননি গগন বসু।

শৈলেশ্বরবাবুর চিঠি পেয়েছেন মহিমবাবু। সাতদিনের মধ্যেই তেজপুরে ফিরে আসছেন শৈলেশ্বরবাবু, কারণ তিনমাসের বাড়িভাড়া বাকি ফেলেছে কয়েকজন ভাড়াটিয়া। বাড়িভাড়া আদায়ের জন্য তিনি মামলা করতে চান।

ইনকাম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরীর চিঠিও পেয়েছেন মহিমবাবু। তিনিও আসছেন। কারণ তাঁর কাছে বিশেষ কয়েকজন অ্যাসেসির জন্য বিশেষ দরকারের কথা বলতে সুশান্ত মজুমদার খুব শিগগির তেজপুরে এসে পড়বেন।

কলকাতা থেকে সুমিত্রা সরকারের চিঠি পেয়েছেন কিরণলেখা।—এবার স্পষ্ট করে একটা খবর দিন, কিরণ বউদি। আর দেরি করা কি ভাল দেখায়?

আরও যে দুটো চিঠি এসেছে, সে দুটো চিঠি দু'বার পড়ে নিয়ে হাসাহাসি করেছেন কিরণলেখা আর মণিমালা। নাসিক থেকে মীরার একটি চিঠি এসেছে। শান্তিপুর থেকে বাণীর একটি চিঠি।

কিরণলেখা—বাণী দেখছি এখনও শান্তিপুরেই আছে।

মণিমালা—মীরা যে গোলমালের সময় তেজপুর ছেড়ে একেবারে অতদূরে নাসিকে চলে গিয়েছে, এ-খবর তো আমাকে কেউ দেয়নি।

কিরণলেখা হাসেন।—যাই হোক, বাণীর আর মীরার এসব কথার এখন তো আর কোন মানে হয় না।

মণিমালা—না। শুক্তিকে তবে এখানেই ডাকি।

এখানে মানে ভারতীর বাইরের বারান্দার এইদিকে, যেখানে এরই মধ্যে একটি আলো জ্বলতে শুরু করেছে, কয়েকটি চেয়ার পড়ে আছে, আর দুই চেয়ারে বসে এতক্ষণ কথা বলছিলেন কিরণলেখা আর মণিমালা। এদিকেরই বাইরের ঘরের ভিতরে একটি টেবিলের কাছে

বসে চেক লিখছেন গগন বসু। ম্যানেজার ব্যানার্জি জানিয়েছেন, বাগান চালু করতে হলে এখন বেশ কিছু টাকার দরকার হবে।

মণিমালার ডাক শুনতে পেয়েই চলে আসে শুক্তি।—বাঃ, সন্ধ্যে ভাল করে না হতেই আলো জ্বেলে বসে আছ, মণিমাসি।

মণিমাসি—না রে মেয়ে; সে জন্যে নয়। অনেক চিঠি পড়তে হলো। আলো না থাকলে চিঠির লেখা কি এই বয়সের চোখে আর পড়া যায়?

কিরণলেখা বলেন—কলকাতা থেকে তোর বড় পিসির চিঠি এসেছে শুক্তি। জানবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুমিত্রা, তুই কী বলতে চাস?

তড়বড় করে হেঁটে বেড়ায় না, ছটফটও করে না; বেশ শান্ত হয়ে এক-ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি। কিন্তু জবাব দিতে গিয়ে হেসে ফেলে।—আমি কিছু বলতে পারবো না।

কিরণলেখা—একথার মানে?

শুক্তি—তোমরা ভেবে ঠিক করে নাও, কাকে বেশি ভাল মনে হয়।

কিরণলেখা—আমরা যদি বলি, শ্যামল?

শুক্তি—হ্যাঁ, তবে তাই।

মণিমাসি—আমি তো মনে করি, অনিমেষ ভাল।

শুক্তি হাসে—হ্যাঁ, তবে তাই ভাল।

কিরণলেখার চশমার দুই কাচ আশ্চর্য হয়ে চিকচিক করে:—তোমার নিজের কোন পছন্দ-অপছন্দ থাকবে না, এটা কেমন কথা?

শুক্তি—এ কথা তুলে আর কোন লাভ নেই, মা।

কিরণলেখা—তুমি সত্যি কথা বলছো?

শুক্তি—একটুও মিথ্যে বলছি না।

কিরণলেখা—তাহলে তোমার বাবাকে এই কথা বলি?

শুক্তি—বল। কিন্তু বলে লাভ কি? বাবা তো বলেই রেখেছেন যে···।

কিরণলেখা—কি বলে রেখেছেন ?

শুক্তি—বাবার মানুষ চিনতে খুব ভুল হয়। অনেক দেখেও মানুষ চিনতে পারেন না।

হঠাৎ মাথাটাকে ঝুঁকিয়ে হেঁট করে দিয়ে মুখ লুকোতে চেষ্টা করে শুক্তি। কারণ, বাইরের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন গগন বসু, আর বারান্দার শুক্তির মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছেন। গগন বসুর হাতের পাইপে ধোঁয়া নেই; তাঁর কপালের সেই গভীর তিনটে রেখা হঠাৎ যেন আরও গভীর হয়ে গিয়েছে। আবার ঘরের ভিতরে চলে গেলেন গগন বসু।

কিরণলেখা বলেন—শান্তিপুর থেকে বাণীও যে একটা অদ্ভুত চিঠি লিখেছে। পাইলট অফিসার পরিতোষের সঙ্গে তোমার তো কয়েকবার দেখা আর আলাপও হয়েছে।

শুক্তি—হ্যাঁ।

কিরণলেখা—তবে কি বলবো যে, পরিতোষও ভাল ?

শুক্তি—ভাল বইকি। খারাপ কেন হবে ?

কিরণলেখা—তোমার আপত্তি নেই ?

শুক্তি—না।

কিরণলেখার মনের এতক্ষণের দুঃসহ বিস্ময় এইবার যেন আর্তনাদ হয়ে বেজে উঠবে।—মীরার মামার ছেলে রাজীবের কথাও তো মীরার কাছে তুমি শুনেছো।

শুক্তি—শুনেছি।

কিরণলেখা—রাজীবও নিশ্চয় খুব ভাল ছেলে।

শুক্তি—হ্যাঁ। শুনে তাই তো মনে হয়।

কিরণলেখা—তবে কি রাজীবের মা'র কাছে চিঠি দেব ?

শুক্তি—দাও।

কিরণলেখা—আপত্তি নেই তোমার ?

শুক্তি—না।

কিরণলেখা—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

শুক্তি—রাগ করো না, মা। কেউ চে... ...উ শোনা, এই মাত্র। তার বেশি তো কিছু নয়। কা'কে কার চেয়ে ছোট মনে করবো বল? এরা সবাই সমান।

কিরণলেখা আর কোন কথা বলেন না। কথা বলেন মণিমালা।—আমি বলি কিরণদি, শুনছেন কিরণদি?

কিরণলেখা—বল।

মণিমালা—শুক্তিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। বরং আমরাই ভেবে দেখি···।

কিরণলেখা—হ্যাঁ, অগত্যা তাই। আচ্ছা, শুক্তি, তুমি এবার যাও।

চলেই যাচ্ছিল শুক্তি। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। চোখে পড়েছে শুক্তির, গেটের দিক থেকে হেঁটে আসছে রাজবাহাদুর, তার পিছনে আরও দু'জন। গেটের বাইরে রাস্তার উপর একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে।

সে-দু'জন সোজা এগিয়ে এসে একবারে বারান্দার উপরে উঠে দাঁড়ায়। হেসে কথা বলেন কিরণলেখা।—এ কি? ডাক্তারগিন্নী যে। এখন কোথায় আছেন আপনি?

প্রিয়বালা—আছি রঙ্গিয়াতে।

কিরণলেখা—এই মেয়েটি কে?

প্রিয়বালা—আমার দূর সম্পর্কের ভাগ্নে হয় বলাই; তারই বাড়িতে এই মেয়ে এইতো মাত্র মাস দুই হলো এসেছে। বলাইয়ের এক জ্ঞাতিখুড়োর মেয়ে। এ মেয়ের বাপও নেই, মাও নেই।

কিরণলেখা—বসুন আপনি, তুমিও বসো।

প্রিয়বালা—সাহেব ভাল আছেন?

কিরণলেখা—হ্যাঁ।

প্রিয়বালা—কিন্তু আর বসবো না। যাচ্ছি ইস্টিশানে। সন্ধ্যের ট্রেনেই রঙ্গিয়া ফিরে যাব।

এগিয়ে আসে শুক্তি।—ট্রেন ছাড়বে কখন?

প্রিয়বালা—এই তো, এই সন্ধ্যে ছ'টায়।

শুক্তি—তবে তো এখনও সময় আছে।

প্রিয়বালা—তা···সময় একটু তো আছে···কিন্তু নেই বললেই চলে।

শুক্তি—আপনি আর মাত্র পাঁচটি মিনিট বসুন।

প্রিয়বালা হাসেন।—কেন? আপনার ইচ্ছেটা কি?

শুক্তি হাসে।—না, আপনাকে কেক-বিস্কুট খাওয়াবো না; শুধু একটা জিনিস দেব।

প্রিয়বালা—জিনিস?

প্রিয়বালার কথার কোন জবাব না দিয়ে চলে যায় শুক্তি। ফিরে এসে একটা চেয়ারের উপর শক্ত হয়ে বসে, হাসে, আর কাগজে মোড়া একটা সোয়েটারকে কোলের উপর রাখে; উলের কাঁটা হাতে তুলে নেয়।—আপনি একটু দেরি করুন। এমন কিছু সময় লাগবে না। হাতটা পুরো হয়েই গিয়েছে। শুধু কাঁধের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, বাস্।···শুনছেন, সুজিতবাবুকে দেবেন এই সোয়েটার। ভুলে যাবেন না যেন।

প্রিয়বালা হাসেন।—সোয়েটার?

শুক্তি—হ্যাঁ। মালতী এসে যদি কখনও জিজ্ঞেস করে, তবে বলে দিতে পারবো, সোয়েটার বোনা ফিনিশ করেছি, একজন যুদ্ধের মানুষকেই ওটা দিয়ে দিয়েছি; ফাঁকি দিইনি।

খুব ব্যস্ত শুক্তি। শুক্তির হাতে উলের কাটা যেন সময় জয় করবার জন্য ছটফটিয়ে কাজ করছে। পাকা ধানের রঙ, নরম ফোরপ্লাই উলের সোয়েটার শুক্তির কোল থেকে হঠাৎ এক-একবার পড়-পড় হয়ে ঝুলে পড়ে। তখুনি ব্যস্ত হাতে আবার কোলের উপরে টেনে তুলে নেয় শুক্তি।

কিরণলেখা আর মণিমালা, দুজনে শুধু নীরব হয়ে বসে আছেন আর দেখছেন। সুজিতের কাকিমা প্রিয়বালাও তাই একেবারে নীরব। তিনি শুধু সাহেবকে একবার দেখতে পেলেন, ঘরের ভিতরে সাহেব যেন ছটফট করে ঘুরছেন। মাথার কাপড়টাকে টেনে আরও বড় করে নামিয়ে দেন প্রিয়বালা।

—এই নিন, হয়ে-গেছে। সোয়েটারটাকে প্রিয়বালার হাতে তুলে দেয় শুক্তি। বেশ জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে। তারপর, যাকে চোখে দেখতে পেয়েও এতক্ষণের এই ব্যস্ততার জন্য যার সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারেনি শুক্তি, তারই সঙ্গে কথা বলে—তুমি কে? তোমার নামটাও তো শুনতে পেলাম না।

মেয়েটি বলে—পূরবী।

বেশ দেখতে পূরবী। একটু রোগা রোগা বটে, কিন্তু বেশ নরম দুটো ঠোঁট। চোখেও বেশ জ্বলজ্বলে একটা হাসি। বয়স কত হবে? শুক্তির সমান না হোক, বড় জোর দু-তিন বছর ছোট। ঢাকাই তাঁতের শাড়িতে ছোট-ছোট রঙীন বুটি। গায়ে জড়ানো ধূপছায়া ছাপের একটা স্কার্ফ। খোঁপাটাও ঢিলে ছাঁদে বাঁধা হয়ে ঘাড়ের একদিকে তোলা।

প্রিয়বালা এইবার অদ্ভুত একটা তৃপ্তিভরা হাসি মুখে নিয়ে কথা বলেন—আপনাদের কাছে পূরবীকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাব বলেই তো এলাম। এ মেয়ে এখন আমার কাছে থাকবে। বুঝলেন তো, সুজিতের জন্যে এই মেয়েকে রঙ্গিয়া নিয়ে চললাম। ওখানেই বিয়ে হবে।

শুক্তি—তাই বলুন। এমন চমৎকার খবরটা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন কেন? আর তুমিই বা কেমন? ধরা পড়ে যাবার ভয়ে বুঝি চুপটি করে বসে আছ, কোন কথা বলছো না?

কি যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারে না পূরবী। চোখ নামিয়ে আর মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শুক্তির মুখের হাসিটা এইবার যেন খুশি ঝর্ণার শব্দের মত উথলে ওঠে।—দেখছেন তো, আপনার পূরবী সত্যিই যে বিয়ে হবার আগেই ধরা পড়ে গেল।

—দেখেছি। খুব খুশি হয়ে হেসে ফেললেন প্রিয়বালা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন।—এবার আমরা আসি।

প্রিয়বালা আর পূরবী দুজনেই কিরণলেখা আর মণিমালার দিকে হাত তুলে নমস্কার জানায়। আর, শুক্তির দিকে হাত তুলে নমস্কার

জানাতে গিয়ে পূরবীর মুখটা হঠাৎ লাজুক হয়ে হাসি লুকোতে চেষ্টা করে।

পূরবীর কাছে এগিয়ে আসে শুক্তি; গলার স্বর একটু চেপে দিয়ে, দুই চোখ বড় করে, হেসে হেসে আর ফিসফিস করে কথা বলে—খুব ভাল হলো। ছুটির সময় দু'জনে মিলে একবার বেড়াতে বের হয়ে জিয়াভরলি নদীটা দেখে এসো। কী চমৎকার সেই জিয়াভরলি। দেখলে প্রাণ ভরে যাবে।

—